বেশ কিছুদিন ধরে ভাবছিলাম, আমার ত্রিশ বছরব্যাপী সুদীর্ঘ ক্রিকেট জীবনে দেশের ও বিদেশের যে সব ক্রিকেটরসিক প্রীতির অজস্রধারায় আমাকে অভিষিক্ত করে রেখেছেন, সামান্যতম প্রতিদান আমি তাঁদের দিতে পারি কিনা।

আমার কৃতজ্ঞতার সশ্রদ্ধ নিদর্শনস্বরূপ এই গ্রন্থখানি তাঁদেরই হাতে তুলে দিলাম। আমার স্মৃতিচারণ যদি তাঁদের মনে ক্রিকেটরসে সঞ্জীবিত মধুর দিনগুলির স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে পারে, ধন্য মানবো নিজেকে।

মুস্তাখ আলি

ভূমিকা

আমার প্রিয় বন্ধু মুশতাখ আলি যখন তাঁর ক্রিকেট গ্রন্থের জন্য একটি ভূমিকা লিখে দেবার অনুরোধ জানিয়ে আমাকে সম্মানিত করেন, তিনি তখন আমাকে জানিয়েছিলেন যে এই গ্রন্থে বিতর্কমূলক বিশেষ কিছু থাকবে না, যা থাকবে তা হল ক্রিকেট ও তার মাধুর্যের কথা।

ভেবেচিন্তে এই সংবাদটুকু জানানোর জন্য তাঁকে প্রশংসা করতে হয়, কারণ এ যুগের হালই হয়েছে, ক্রিকেট গ্রন্থগুলিতে রোমহর্ষণকারী নেপথ্য কাহিনী ভরে দিয়ে তা উত্তেজক ও মহান বিক্রয়যোগ্য করে তোলা।

আমার মনে হয় ওই ধরণের রচনায় কেবলমাত্র ক্রিকেট খেলারই নয়, যে ব্যক্তিটির নাম লেখক হিসেবে থাকে তারও প্রভূত ক্ষতি হয়। সেই কারনেই আমি খুবই আনন্দ পাচ্ছি যে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার মুশতাখ আলি তাঁর গ্রন্থে আনন্দ সঞ্চারের দিকেই দৃষ্টি রেখেছেন। যদিও বইখানা পড়বার এখনো আমার সুযোগ হয়নি, আমি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করি খেলোয়াড় মুশতাখ যখনি মাঠে নেমেছেন হাজার হাজার মানুষকে যে ধরনের সঞ্জীবনী রস বিতরণ করেছেন, লেখক মুশতাখের রচনায়ও সেই রস পরিবেশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে সারা দুনিয়া সফর করেছি, প্রথমে ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে এবং তারপরে ক্রিকেট সমীক্ষক হিসেবে। ফলে যেসব দেশে ক্রিকেট খেলা হয় সে সব দেশের সব বড় খেলোয়াড়কেই দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে।

মুশতাখের চেয়েও পদ্ধতি মেনে সঠিক স্ট্রোকে খেলেন এবং অনেকে অনেক রান করেন এমন খেলোয়াড় আমি দেখেছি, কিন্তু মুশতাখের মত এমন প্রানোজ্জ্বল চরিত্রের ক্রিকেটার দেখেছি কিনা আমার সন্দেহ আছে। আমার চোখে তিনি ক্রিকেটার এরল ফ্লিন, চঞ্চল, দুর্বার, দুঃসাহসী এবং সর্বত্র অতিশয় জনপ্রিয়।

মনে আছে, মুশতাখকে আমি প্রথম দেখি যুদ্ধশেষে গৃহাভিমুখীন অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস দলের বিরুদ্ধে নয়া দিল্লীর খেলায় একটা হাল্কা টুপি পরে ব্যাটিং করতে ও ফাটিয়ে সেঞ্চুরী হাঁকাতে। আমি অনবদ্য লেংগথে একটি বল ছেড়ে

অফ্-স্টাম্পের বাইরে ফেলি, নির্ভুল ক্রসব্যাটের এক ঝটকায় মুশতাখ সেটি স্কোয়ার লেগে পাঠান, রবিনহুড নিক্ষিপ্ত তীরের মত নির্ভুল ও তীব্র গতিতে ছুটে যায় বল। প্রথম দিকে আমি ওই ধরণের তাঁর মারগুলি বরাত জোরে চলে গেছে বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু ক্রমে তেতে উঠে মুশতাখ যখন তাঁর শটগুলির মধ্যে অজস্র বৈচিত্র্য প্রকাশ করতে লাগলেন, মারগুলি তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকলো, আমার বুঝতে দেরি হলনা যে একজন প্রকৃত চ্যাম্পিয়ানের বিরুদ্ধে বোলিং করছি আমি।

একজন ফাস্ট বোলার-কে সোজা ড্রাইভ মারলে তাঁর ভীষণ রাগ হয়, কিন্তু কব্জির একটু সামান্য মোচড়ে যখন বলটি তিনি বোলারের মাথার ওপর দিয়ে ছয়ে পাঠিয়ে দেন, তখন তা একান্তই অসহ্য হয়ে পড়ে। ঠিক তার পরেই অনুরূপ বলটিতে যখন তিনি একেবারে মরা ব্যাট পেতে দেন এবং তারপরেই ব্যাটটা ধীরে উঁচুর দিকে পাক খাইয়ে নেন, পাগল হয়ে যায় বোলার। কিন্তু জনতা? আগের বলটি যে বোঁ বোঁ শব্দে উড়ে গিয়ে বেড়ার ওপারে পড়েছিল, তার চেয়েও এবার বেশি উত্তেজনা বোধ করে।

ওই খেলার ভিতর দিয়েই মুশতাখ আমার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছেন, আসলে তাঁকে ভোলা যায়ই না। অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস দলের বিরুদ্ধে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'টেষ্ট' খেলায় যখন তাঁকে নির্বাচন করা হয়নি, মুশতাখ ভক্ত এক বিরাট জনতা খবরটা জেনে প্রতিবাদ অভিযান করে। ফলে মুশতাখ সেই ম্যাচে খেলেন। যতদূর স্মৃতি যায়, এমন কি সমগ্র ক্রিকেট ইতিহাসেও, কোন খেলোয়াড়ের বেলায় এমনটি ঘটেনি। ক্রিকেটে যাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি কিংবদন্তী প্রচলিত, সেই শ্মশ্রুধারী ডব্লু, জি গ্রেস ও মুশতাখ সম্পর্কিত এই সত্যকাহিনীর কাছে হার মেনে যাবেন।

মুশতাখ এক ও অনন্য। অনেকেই ভুলে গেছেন যে তিনি উৎকৃষ্ট বোলার এবং ফীল্ডসম্যানও ছিলেন, যার জোরে তাঁকে প্রধান চৌকষ ক্রিকেটারদের মধ্যে ফেলা যায়।

মুশতাখের শ্রেষ্ঠ দিনগুলিতে তাঁকে খেলতে দেখবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল, সেই সব অগণিত মানুষকে তিনি যে আনন্দ দিয়েছিলেন, এই বইখানিও পাঠকদের তেমনি আনন্দ দেবে, এই আশা আমি পোষণ করি।

অবশ্য এ চাওয়া হয়তো বড় বেশি চাওয়া হয়ে গেল।

কীথ মিলার

আত্মকাহিনীর জন্মকথা

১৯৫৬ সালে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে আমার অবসর গ্রহণের পর দেশের ও বিদেশের বন্ধুবান্ধব এবং আমার খেলা যাঁরা ভালোবাসেন এমন বহুজন আমাকে স্মৃতিকথা প্রকাশের জন্য বলেন। আমি প্রথম দিকে সংশয় বোধ করেছি, কারণ ত্রিশ বছরের ও বেশিকাল ধরে প্রভূত পরিমাণ ক্রিকেট আমি খেলে থাকলেও, পরিসংখ্যান দিয়ে পাঠকদের কাছে আমার সার্থকতা প্রমাণ করা হয়তো সম্ভব হবে না। মিঃ সাহনি আমাকে কলম ধরানোর ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। এর ওপর কলেজের ছাত্র শ্রীমান এস কে মিশ্রা এমন ভাবে আমাকে বোঝাতে থাকলেন যে এড়ানো আর সম্ভব হল না। ওই দুই ভদ্রলোকের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

কিন্তু মাথায় ও মনে যাই থাক না কেন, অধ্যাপক ইকবাল এইচ কে লোদী যদি সেবছর ইন্দোরের হোলকার কলেজে বদলি হয়ে না আসতেন, কোন কাজই হত না। একবাল সাহেব আমার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও প্রীতি পোষণ করতেন। স্মৃতিকথা রচনার ইচ্ছা যখন তাঁকে জানালাম, তিনি সত্যি সত্যি লাফিয়ে উঠলেন এবং নিজে থেকেই সব রকম সাহায্যদানের প্রস্তাব করলেন। রাতের পর রাত তিনি আমার সঙ্গে বসে পুরাতন নথিপত্র ঘেঁটেছেন, দৈনিক পত্রিকার সঙ্কলিত সংবাদগুলি, এবং অন্যান্য সাময়িক পত্র ও পুস্তক থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সেই রাতগুলির কথা আমি চিরদিন সানন্দে মনে রাখবো। তাঁর ঋণ কোনদিন পরিশোধ করতে পারবো না।

আমার অগ্রজ মমতাজ আলি অধ্যাপক লোদির সঙ্গে আলোচনায় যোগদান করে প্রভূত উপদেশ নির্দেশ দিয়েছেন আর অনুজ ইশতিয়াখ আলি আমার খসড়াগুলি টাইপ করে দিয়েছেন, তাঁদের পরিশ্রমও ভুলবার নয়।

আমার খেলার পরম ভক্ত ও আমার বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীগোপাল রত্নম একাধারে প্রেরণা ও উপদেশ দিয়েছেন, তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো এ আমার একান্ত কর্তব্য।

ইংল্যাণ্ডবাসী মিঃ এডোয়ার্ড নাইট আমার সারা জীবনের ক্রিকেট কৃতি ও তার পরিসংখ্যান সযত্নে ও নির্ভুলভাবে সংগ্রহ করে দিয়েছেন, তাঁর কাছেও আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

পুণ্য স্মৃতি পরলোকগত মহামান্য যশোবন্তরাও হোলকার, তাঁর কন্যা শ্রীমতী উষা দেবী ও তাঁর স্বামী স্ত্রী সতীশ মালহোত্রা আমাকে আজীবন যে পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ দান করেছেন, তারই ফলে আমি জীবনে যা কিছু করতে পেরেছি, তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই সুযোগ আমি সবিনয়ে গ্রহণ করছি।

সাংবাদিক শ্রীরাখাল ভট্টাচার্যের ঐকান্তিক সহযোগিতার কথা উল্লেখ না করলে আমার কর্তব্যচ্যুতি ঘটবে। তিনিই গ্রন্থখানিকে বর্তমান রূপে দান করেছেন। পুরানো সংবাদ পত্র ঘেঁটে তিনি আমার দেওয়া প্রতিটি তথ্যের সত্যাসত্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন এবং অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন। সম্পাদক হিসেবে তিনি অধ্যায়গুলি ভাগ করেছেন এবং সেগুলির অর্থবহ নামকরণ করেছেন। ফোটোগ্রাফ নির্বাচন, সেগুলি সাজানো এ সবই তাঁর কৃতিত্ব।

মুশতাখ আলি
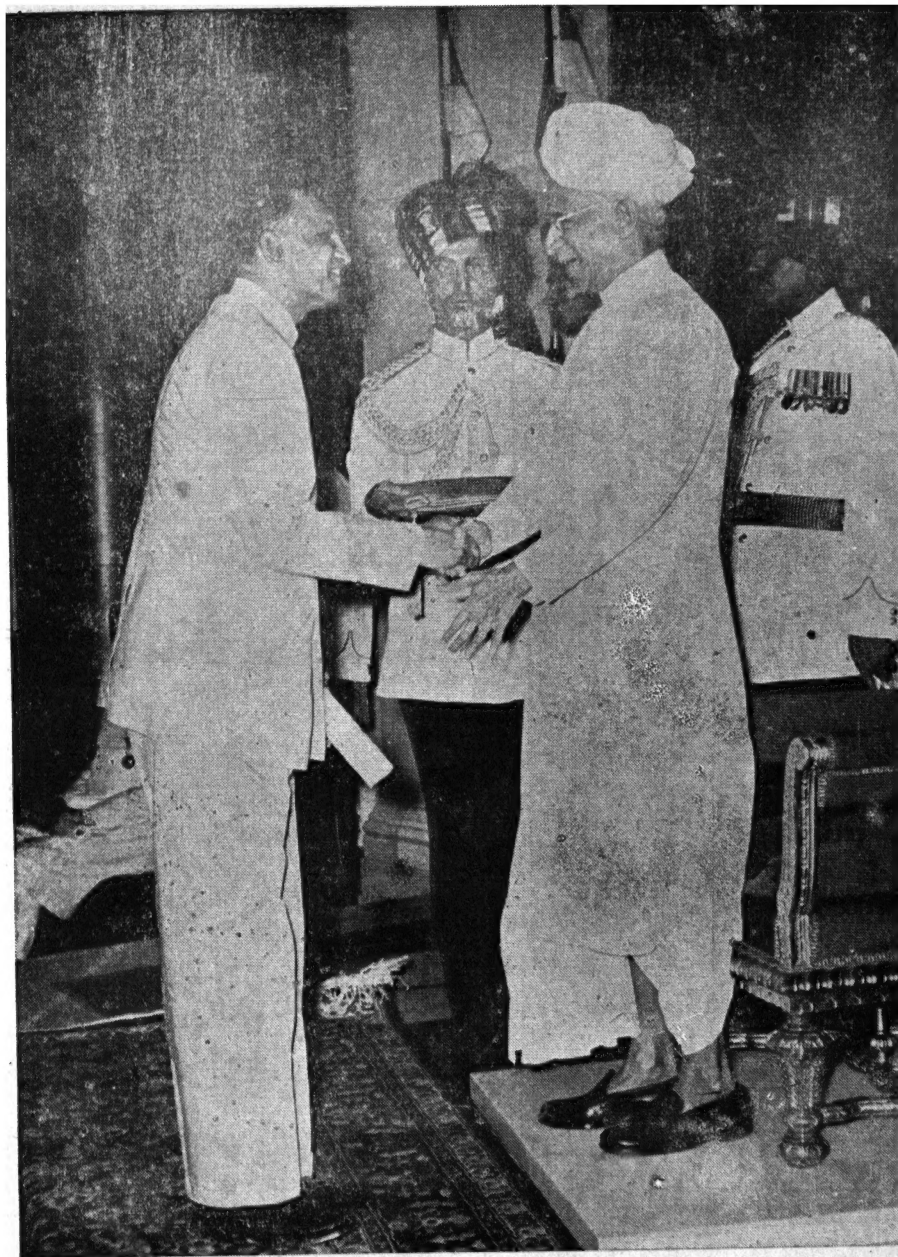
রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণাণের সঙ্গে মুস্তাখ আলি
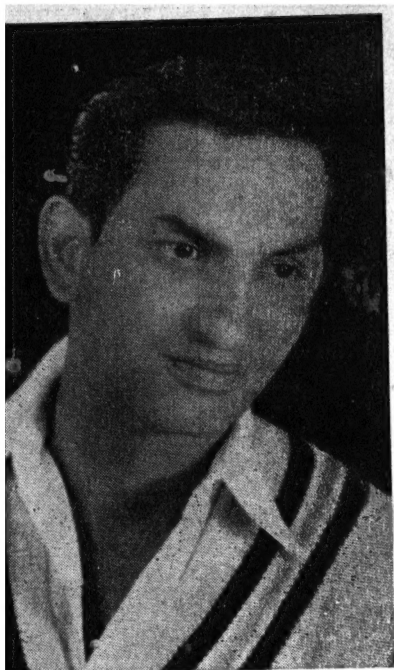
অটোগ্রাফ শিকারীদের পাল্লায় মুস্তাখ আলি
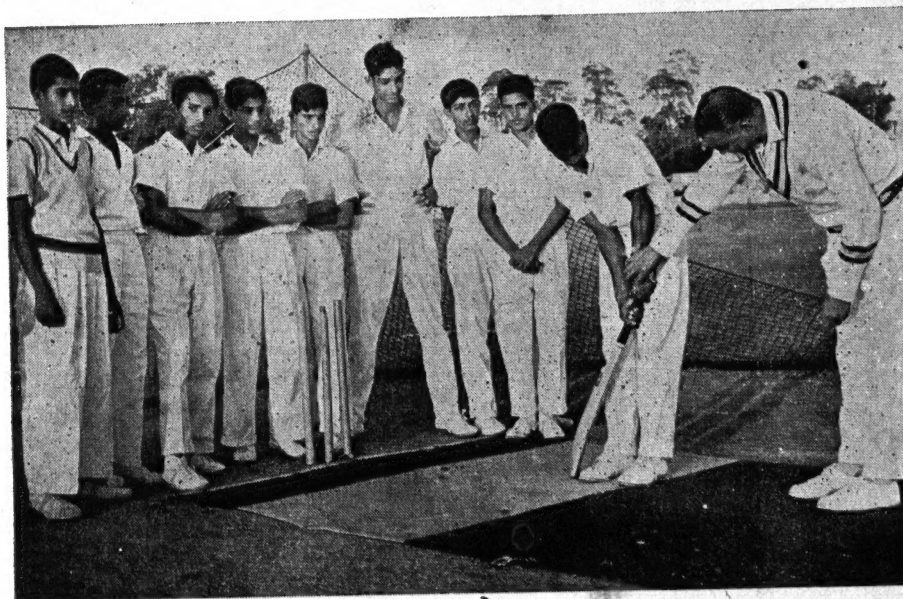
ক্রিকেট শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রশিক্ষকের ভূমিকায় মুস্তাখ আলি
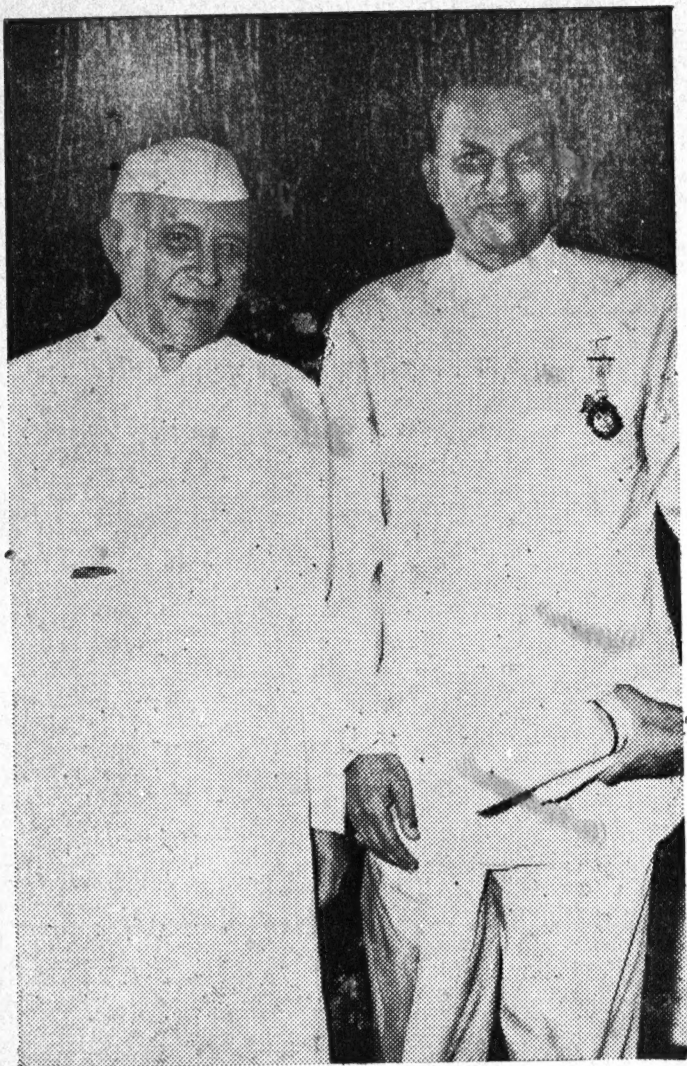
জহরলাল নেহরুর সঙ্গে মুস্তাখ আলি

এক

আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন

ভারতীয় ক্রিকেটে দুঃসাহসী সদানন্দময় পুরুষ বলে আমি বহুবার অভিহিত হয়েছি। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতির সামনে উপস্থিত হবার জন্য আমাকে যখন মহড়া দেওয়া হচ্ছিল তখন না ছিল আমার কোন সাহস, না ছিল আমার সদানন্দময় প্রকৃতি, দুদিক থেকে আমার যুগের দুজন সবচেয়ে ফাস্ট বোলার বল করেছে, নিঃশঙ্ক চিত্তে তাদের খেলেছি, তাদের বলের গতিকে এতটুকু ভয় করিনি, বল যতই লাফিয়ে উঠুক না কেন তাও গ্রাহ্য করিনি। কিন্তু যখন রাষ্ট্রপতির সামনে হাজির হবার আমন্ত্রণ পেলাম, সাংঘাতিক নার্ভাস বোধ করলাম, কি করতে ও বলতে হবে সব গুলিয়ে গেল। চতুরতম বোলারের বল কোন দিক দিয়ে কি ভাবে আসছে বুঝে নিতে কখনো ভুল হয়নি আমার, আর কোন দিকে বলটা মারবো তা নিয়েও সংশয় বোধ করিনি, লেগের বল অসঙ্কোচে অফে মেরেছি, অফের বল টেনে এনে লেগে পাঠিয়েছি, ব্যাটিং করবার সময় সঠিক পদচালনায় কখনো ভুল করিনি এমন কথা বলবো না, তবে যা করেছি অত্যধিক আত্মবিশ্বাসের ফলেই তা ঘটেছে। তবু সনদ বিতরণের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির সামনে কিভাবে অগ্রসর হতে হবে সে বিষয়ে যখন আমায় তালিম দেওয়া হচ্ছিল, পদচালনায় বারবার ভুল হয়ে যাচ্ছিল, যে দিকে যে ভাবে পদক্ষেপ নিষিদ্ধ, পা আমার সেদিকেই চলছিল, কিন্তু কেন? কারণ আমার নিজের বিচারে আমি জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনটির দিকেই পা বাড়াচ্ছিলাম।

অতীতে একাধিক ভারতসম্রাটের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করানো হয়েছে, সেই সম্রাট আবার সসাগরা বৃটিশসাম্রাজ্যের অধীশ্বর, যে সাম্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্ত যায় না। তবে সে ব্যাপারটা ছিল ইংল্যাণ্ডে ক্রিকেট খেলতে আসা যে কোন জাতীয় দলের পক্ষে নিয়ম মাফিক অনুষ্ঠান।

এবার আমাকে সাক্ষাৎ করানো হবে আমার দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে, কোন আনুষ্ঠানিক ভদ্রতা হিসেবে নয়; এবার তিনি আমাকে আহ্বান জানিয়েছেন "জাতীয় জীবনের বিশেষ ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ কোন কৃতির জন্য"

আমাকে যে পুরস্কৃত করা হয়েছে তার সনদ প্রদান করা হবে বলে। খেলার মাঠে জনতা আমাকে যে স্বতোৎসারিত তথা আন্তরিক প্রীতি দিয়ে অভিষিক্ত করে এসেছে, সব সময় যে সম্মান দিয়েছে, বর্ষণ করেছে প্রশংসা, অভিসিক্ত করেছে প্রীতির ধারায় সেই সব কিছু এতদিনে স্থায়ী ও বাস্তব রূপ লাভ করেছে। আমার ক্রিকেট জীবনে সার্থকতার তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ ঘটলো এর ফলে।

১৯৩৬ সালের যেই দিনটিতে আমি ইংলণ্ডের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি করেছিলাম, আমার খেলোয়াড় জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন সেটি, হয়তো ভারতীয় ক্রিকেটেরও। কিন্তু আজ আমার খেলোয়াড় জীবনে যবনিকা পতন হয়ে গেছে। মানুষ হিসেবে ও সচেতন নাগরিক হিসেবে অনেক স্বদেশবাসীর অন্তরে বিশিষ্ট আসন হয়তো আজও অধিকার করে আছি। লক্ষ লক্ষ মানুষ সারাজীবন আমাকে ভালোবেসেছে একথাও সত্য, আমার দুঃসাহসী ক্রীড়া নৈপুণ্যে আনন্দে উদ্বেল হয়েছে। কিন্তু সে সবই তো জীবনের বেসরকারী টেস্টে জয়লাভ। জনসাধারণের স্মৃতি ক্ষণস্থায়ী, জনতার প্রেম চঞ্চল, আজ যা জনপ্রিয় কাল তা বাতিল হয়ে যায়, গতকাল যে মানুষ সবার চোখের মনি, প্রানের ঠাকুর, আগামী কাল সে একেবারে বিস্মৃত।

কিন্তু জনগণের নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান আমার সারাজীবনের কৃত্যকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিচ্ছেন, তাই হল আমার জীবনের সরকারী টেস্টে রাবার জয়ের সামিল।

আমার আগে অন্যান্য ক্রিকেটার যথাযোগ্য সম্মান পেয়েছেন। স্বাধীন ভারতেই খেলোয়াড় তথা গণসংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের কর্মীরা বিশিষ্ট নাগরিক হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছেন। আমার ক্রিকেট গুরু কর্ণেল সি, কে, নাইডু পদ্মবিভূষণ হয়েছেন। ভারতের খেলাধূলার ক্ষেত্রে তিনিই সবচেয়ে মহিমময় ব্যক্তিত্ব, উচ্চতর সম্মানের যোগ্য পুরুষ। নিজের বিশিষ্ট ক্ষেত্রে সামগ্রিক ভাবে মহৎ অবদানের পুরস্কার হিসেবেই খেলোয়াড়েরা সম্মানিত হন, যদিচ কোন একবারের অসাধারণ সার্থকতার জন্য সম্মানিত হওয়ার দৃষ্টান্তও রয়েছে।

আমার "পদ্মশ্রী" লাভ সুদূর নয়, এমন একটা ধারণা কিছুদিন থেকেই আমার মনে জাগছিল। তা সত্বেও যখন ১৯৩৬ সালের ১৬ই জানুয়ারী ভারত সরকারের শিক্ষা সচিব গোপন পত্র পাঠিয়ে জানতে চাইলেন "পদ্মশ্রী" গ্রহণে আমি রাজি আছি কিনা, আমি সত্যিই বিস্মিত হয়েছিলাম। চিঠিতে স্পষ্ট

বলা ছিল যে এই সব সম্মান "জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ কৃতির জন্যই দেওয়া হয়ে থাকে"।

খবরটা পেয়ে আনন্দে মন উদ্বেল হল, কিন্তু তার সঙ্গে এল এক যন্ত্রণা। খবরটা কারো কাছে প্রকাশ করা চলবে না এই ছিল সরকারী নির্দেশ। কাজেই সকলের কাছে গোপন রেখেই সম্মতি পত্র পাঠালাম. কী সে যন্ত্রণা।

এই যন্ত্রণা আমাকে বেশ কদিন সহ্য করতে হয়েছিল, ব্যাপারটা সকলের কাছে গোপন রেখেই চলতে হয়েছিল ২৫ জানুয়ারী পর্যন্ত। ওই দিনই স্বরাষ্ট্রসচিবের তার পেলাম আমাকে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

ইন্দোর টেলিগ্রাফ অফিসই টেলিফোনে খবরটা আমাকে জানালো সেই সঙ্গে অভিনন্দনে ভাসিয়ে দিল আমাকে। বাড়িময় আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। পরদিন খবরটা ছড়িয়ে পড়তে আমাকে যারা ভালোবাসেন সবাই অভিনন্দন বাণী পাঠাতে লাগলেন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর লিখলেন ; "আজ সমগ্র জাতি আপনার অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েছে, আমাদের অতি আনন্দের কারণ যে সম্মান যোগ্যপাত্রেই পড়েছে"। ক্রিকেট মহল থেকে যাঁরা অভিনন্দন পাঠালেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিজয় হাজারে, গোলাম আহমেদ, এম কে মন্ত্রী, এস ডব্লু সোহনী, নানা যোশী, আর কে প্যাটেল এবং বাঙলা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশানের পক্ষে শ্রীঅমর ঘোষ ও এন, সি, কোলে। দিল্লী থেকে এস এ জয় পুরিয়া এম পি লিখলেন আমি আর একখানা তাগড়া ছয়ের বাড়ি মেরেছি। বোম্বাই থেকে আমার এক ভক্ত নিজেকে সঙ্গীতপ্রিয় বলে পরিচয় দিয়ে লিখলেন, আমার খেলায় তিনি বরাবরই সঙ্গীতের মাধুর্য ও সুরমূর্ছনা খুঁজে পেয়েছেন। ইন্দোরের মহারাণী উষা দেবী ও তার স্বামী মিঃ মালহোত্রা বোম্বাই থেকে টেলিগ্রামে শুভেচ্ছা জানালেন। ছায়াচিত্র জগতে আমার বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা আনন্দ প্রকাশ করলেন, তার মধ্যে ছিলেন জানি ওয়াকার ও লতা মুঙ্গেশকার।

২৯ মার্চ তারিখে এক নিমন্ত্রণ পেলাম ১৭ই এপ্রিল দিল্লীর অনুষ্ঠানে আমাকে উপস্থিত থাকতে হবে, সেখানে রাষ্ট্রপতি আমাকে পদ্মশ্রী স্বীকৃতির পদকখানি দান করবেন। দুজন সঙ্গী নিয়ে যাবার অনুমতিও ছিল সেই সঙ্গে।

অনুষ্ঠানে কিভাবে কি কি হবে আগের দিন আমাকে ভালো করে সব বোঝানো হল। আর যথা দিনে ও যথাক্ষণে দেখলাম সে বছরের আর সব সম্মান প্রাপ্তদের সঙ্গে আমিও যথাস্থানে আসীন। মহাজন সঙ্গ নিঃসন্দেহে।

উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর জাকির হোসেন পাবেন 'ভারতরত্ন'। আমাদের আগের সারিতে উপবিষ্টদের মধ্যে রয়েছেন আমার রাজ্যের রাজ্যপাল শ্রীপটাসকার ও রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সাহচর্যধন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এঁরা দুজনেই পাবেন 'পদ্মবিভূষণ'। 'পদ্মশ্রী' যাঁরা পাবেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কলকাতা নাট্যজগতের খ্যাতিমান পুরুষ শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, বোম্বাইর মানবতাবোধযুক্ত ছায়াছবির পরিচালক ও আমার বিশিষ্ট বন্ধু মেহবুব খান আর আকাশবানীর সংবাদচিত্রের প্রধান পরিচালক আস্ওয়াল্ড ডি মেলো; অনেক ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের ধারাবিবরণের মাধ্যমে যে ডি মেলোর কণ্ঠ সর্বজন পরিচিত। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে আমাদেরই সেদিন সবচেয়ে সম্মানের আসন। অন্তত সেদিনের সেই অনুষ্ঠানে সম্মানের বিচারে দ্বিতীয় শ্রেণী ছিলেন কেবিনেট মন্ত্রীরা ও পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ এবং সেই দলেই উপবিষ্ট শ্রীজওহরলাল নেহরু।

কাঁটায় কাঁটায় বিকেল পাঁচটা। রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ মঞ্চের উপর উপনীত হলেন। ঠিক তার আগের মুহূর্তে ঘোষণা হল: ভদ্রমহোদয়গণ রাষ্ট্রপতি আসছেন। রাষ্ট্রপতি প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়ালেন এবং জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হল। এরপর রাষ্ট্রপতি আসন গ্রহণ করলেন এবং তারও পরে সকলে বসলেন। এরপর স্বরাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রপতির অনুমতি নিয়ে সম্মান বিতরণ অনুষ্ঠানের সূচনা ঘোষণা করলেন।

একজনের পর একজন এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চে ওঠেন। রাষ্ট্রপতি প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করে সম্মানসূচক পদকখানি প্রত্যেকের কোটের সঙ্গে পিন দিয়ে এঁটে দেন। আমার ডাক আসতেই আমি উঠে গেলাম। রাষ্ট্রপতি প্রসন্নহাস্যে আমায় অভিনন্দিত করলেন। পদকটি আমার জামায় গাঁথা হতেই আমি নেমে এসে আবার আসনে বসলাম।

অনুষ্ঠান শেষ হতেই রাষ্ট্রপতি প্রস্থান করলেন আর আমাদের জলযোগের জন্য নিয়ে যাওয়া হল। এখানে এসে রাষ্ট্রপতি আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, জওহরলালও এলেন। সহজভাবেই আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন নেহেরুজী। জানালেন যে আমরা যখন ইংলাণ্ডে ক্রিকেট খেলছিলাম তিনি তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের আবর্তে, হয়তো বা কারাগৃহের অন্তরালে। কাজেই ক্রিকেটে কি ঘটছিল তা জানা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, যদিও এটুকু তিনি জানতেন যে দেশবাসীর বিরাট এক অংশ খুব মন দিয়েই আমাদের

খবরাখবর অনুধাবণ করছিলেন। ভারত যখন প্রকৃতই 'জ্বলছিল' তখন আমরা যারা ব্যাট ও বল নিয়ে খেলা করছিলাম তাদের সম্বন্ধে যে প্রধানমন্ত্রী অবহিত তার জন্য আমি সবিনেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। প্রশান্তহাস্যে নেহেরুজী মন্তব্য করলেন 'যারা জনগণের মধ্যে জীবনরস প্রবাহিত রাখতে সাহায্য করেছে, আমাদের স্বাধীনতা অর্জন প্রয়াসে তাঁদের অবদানও অবহেলার নয়।'

সেই মধুর উৎসবেও যথানিয়মে যবনিকা পড়লো, তার স্মৃতি কিন্তু আজও অম্লান। প্রত্যেকের জীবনে অন্তত একটি চিরস্মরনীয় দিন আসে। আমার জীবনেও তা এসেছিল।

দুই

রোমন্থনের আনন্দ

"পদ্মশ্রী" লাভের উত্তেজনা কেটে গেল। এবার ভাবতে শুরু করলাম, কি করেছি আমি যার জন্য জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র আমাকে সম্মানিত করলো। আমি শুধু একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়, ভারতের কোন টেস্ট জয়ে যার অবদান একেবারেই শূন্য। কিন্তু রাষ্ট্রপতি আমাকে যে বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে দিলেন, তা অবশ্য আমার সারাজীবনের কৃতি জাতিকে কোন না কোন ভাবে সমৃদ্ধ করেছে বলেই।

কিন্তু কি করেছি আমি দেশের জন্য? শুরু হল সমগ্র জীবনের বিশ্লেষণ। তা বলে আমার দেশকে আমি কারো চেয়ে কম ভালবাসি একথা মানতে রাজি নই আমি।

খেলার আনন্দেই ক্রিকেট খেলেছি। খেলে আনন্দ পেয়েছি, আর আর সকলের মধ্যে সে আনন্দ ছড়িয়ে দেবার আগ্রহও আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। সহযোগী খেলোয়াড়, দর্শক এবং সংবাদপত্র পড়েও বেতারভাষ্য শুনে যারা আমার ক্রিকেটকৃত্য অনুধাবন করেছেন, সকলকেই আমি আমার আনন্দের সাথী করতে চেয়েছি।

ক্রিকেটের সেই ধ্রুপদী যুগে আনন্দ উপভোগই ক্রিকেট খেলার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল। কিন্তু আজকের বেণিয়া যুগে, জমা খরচ ও হিসাবনিকাশের

দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে মুখ্য সেখানে জয়-পরাজয়ই প্রধান বিবেচনা। ওই মানসিকতার সঙ্গে সুর মেলাতে অবশ্যই আমি রাজি নই। কিন্তু আমি যেসব দলের পক্ষে খেলেছি তাদের সার্থকতায় আমার অবদান নেই, একথাও আমি কিছুতেই মানবো না।

আমি আজও বিশ্বাস করি, প্রাণখুলে আনন্দভরে খেলার সঙ্গে যদি কৌশল প্রয়োগ করে ও সাবধানতার রাশ একটু টেনে চলা যায়, তাহলে অধিকাংশ সময়েই জয়লাভ সম্ভব হয়। কেউ হয়তো বলবেন বীরের কণ্ঠেই বিজয়লক্ষ্মী মালা দেন অথবা আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। জিনিষটা ঘুরে ফিরে একই দাঁড়ায়।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে ভারতের জয়লাভে আমার কোন অবদান নেই। তবু আমি দাবি করবো যে, ক্রিকেটে আমার নিষ্ঠা দিয়ে আমি দেশেরও সেবা করেছি। ক্রিকেট সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গী এবং আমার খেলার স্টাইল লক্ষ লক্ষ লোককে আনন্দ দিয়েছে। ইংল্যাণ্ড সমালোচক গুণগ্রাহীবৃন্দ আমার বিপদ তুচ্ছ করে খেলার ধরণ দেখে উল্লসিত হয়েছেন এবং বলেছেন আমার কৌশল ও দক্ষতা ভারতের জাতীয় শিল্প মনীষা থেকেই উদ্ভূত। এই ধরণের উক্তিতে নিঃসন্দেহে জাতীয় সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমার জন্মের অনেক আগেই রাজকুমার রঞ্জির খেলা দেখে ইংরেজ ক্রিকেট সমালোচকরা উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁর নিজস্ব খেলার রীতিকে 'অখৃষ্টান' স্ট্রোক বলে অভিহিত করেছিলেন। আমার স্ট্রোকগুলিকে ইংরেজ সমালোচক-বৃন্দ একান্তই ভারতীয় বলে মন্তব্য করেছেন। আলোকোজ্জ্বল রূপকথার রাজ্যে দুঃসাহসিক অভিযান পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে চিরকালই প্রাচ্যদেশীয় রোমান্স বলে বিবেচিত। বলিষ্ঠ ও দৃপ্ত স্ট্রোকের বিপরীত ধর্মী যে সূক্ষ্ম স্পর্শের সাবলীল ক্রিকেট তাকেই ওরা ভারতের স্বকীয় পদ্ধতির খেলা বলে অভিহিত করে। ভারতীয় খেলোয়াড়দের নমনীয় কব্জী এবং সূক্ষ্ম ও ছন্দায়িত পদচালনা দেখে ওরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছে, বলেছে এসবই জাদুবিদ্যা, আর ভারতই তো জাদুকরের দেশ। আমার ক্রিকেট খেলায় ওই সব বৈশিষ্ট্য দর্শনে অভিভূত হয়েও পাশ্চাত্যের মানুষ আমার খেলার মধ্যে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেয়েছে। ফলে ক্রিকেটের মাতৃভুমিতেও আমার গুণগ্রাহীর সংখ্যা হয়েছে অসংখ্য। আমার প্রতি প্রীতির ধারা অঝোরে বর্ষিত হয়েছে।

ক্রিকেট খেলে আমি নিজে প্রচুর আনন্দ পেয়েছি। সেই আনন্দই আমার

চারপাশে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কতটা সার্থক হয়েছি তার পরিমাপ কোনদিন পাইনি। ইদানীং জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবীল সংক্রান্ত খেলায় অংশগ্রহণ করতে নানা কেন্দ্রে গিয়ে আমি উপলব্ধি করেছি ভারতীয় ক্রিকেটরসিকসমাজ আমার প্রতি কি অপরিসীম প্রীতি পোষণ করে। আর ভাবপ্রবণ বাঙালীদের জীবনকেন্দ্র কলকাতায় বহুদিন পরে খেলতে গিয়ে যে পরিমাণ উচ্ছ্বাস দেখেছি আমার সম্বন্ধে, আমি তাতে অভিভূত।

দেখেশুনে আমার মন চাইল অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করতে, যে দিনগুলি চলে গেছে, মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়েছে তার স্মৃতি চারণ করতে। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রেম ক্রিকেট থেকে আজ আমি বিচ্ছিন্ন, স্মৃতিই আমার একমাত্র অবলম্বন, সম্পদও বটে।

আমাকে বলা হয়েছে স্বভাব-ক্রিকেটার, যে ঐতিহ্যগত রীতি মেনে খেলেনা, যেন না-পড়ানো পাখী তার সহজাত বনাকাকলী গেয়ে চলে। অন্য লোকে যা বলে বলুক, আমি নিজে বলবো ক্রিকেটের কলাকৌশল আপনা থেকে অর্জন কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে সার্থকতা লাভের একমাত্র পথ প্রভূত অনুশীলন আর অক্লান্ত প্রয়াশ। ক্রিকেট প্রসঙ্গে ও আরো সত্য। দীর্ঘদিনের গভীর অনুশীলনেই যে কোন কঠিন কাজ সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ বলে প্রতিভাত হয়। ক্রিকেটের স্ট্রোক যখন অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়ে ওঠে, তার পিছনের আয়াসসাধ্য প্রস্তুতি লোকচক্ষে নস্যাৎ হয়ে যায়।

তা বলে যতই পরিশ্রম ও অনুশীলন করা হোক না কেন খেলার সঙ্গে জাতীর প্রেমের বন্ধনে বাঁধা না পড়লে খেলা ও খেলোয়াড় কোনমতেই একাত্ম হয়ে যেতে পারে না। ক্রিকেট অনুশীলনের প্রাথমিক স্তরেই আমি ক্রিকেটে এত আনন্দ পেয়েছি যে অনুশীলন যত দীর্ঘ হয়েছে ততই আমি তা উপভোগ করেছি।

এতরকম খেলা থাকতে ক্রিকেটই কেন বেছে নিলাম এবং আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে শ্রেয় বিবেচনা করলাম, তা আমি কোন দিনই বলতে পারবো না। হতেও পারে যে হোলকারের নিজের চেষ্টা ও সমর্থনে পুষ্ট ইন্দোরের ক্রিকেট পরিবেশই আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছিল, ক্রিকেটের রস একবার আস্বাদন করেই আমি তার মধ্যে পেয়েছিলাম অমৃতের আস্বাদ। সেই অমৃতই আজ পঞ্চাশোর্ধেও আমার মনে যৌবনের আবেশ জাগিয়ে তোলে।

তিন

অতি পুরাতন স্মৃতি

রূপার চামচ মুখে নিয়ে জন্মাইনি আমি ; কিন্তু ক্রিকেট ব্যাট হাতে নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম একথা বললে তা একান্ত অসত্য হবে না। কিন্তু সত্যিকারের ব্যাট হাতে পেয়েছিলাম দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও আকুতির পরে।

ইন্দোর পুলিস লাইনস্-এ আমরা বাস করতাম, সেখানেই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর আমার জন্ম। আমার বাবা মধ্যভারত এজেন্সির পুলিস ইন্স্পেক্টর খান সাহেব সৈয়দ ইয়াকুব আলির ক্রিকেটে প্রভূত উৎসাহ ছিল। আমাদের চার ভাই-এর মধ্যে মেজো আলতাফ আলি এবং আমাদের বাড়িতে থাকতেন আমার মামা বসির আলি। দুজনেই ইন্দোরে জনপ্রিয় স্পোর্টসম্যান ছিলেন, হকি এবং ক্রিকেটে দুজনেই সুনাম অর্জন করেছিলেন। বোম্বাই-এ আগা খাঁ হকি প্রতিযোগিতায় ইন্দোর দলের হয়ে দুজনেই খেলেছেন।

আলতাফ আলির চেয়ে আমি বয়সে অনেক ছোট ছিলাম। যখনই দাদা ও মামা খেলতেন আমি গভীর অভিনিবেশ সহকারে তাঁদের খেলা দেখেছি। মাঝে মাঝে তাঁরা আমাকে তাঁদের সঙ্গে খেলবার জন্য ডেকে নিতেন। আমার পক্ষে সেই আহ্বান একাধারে ছিল প্রেরণা ও উদ্দীপনা। ক্রিকেটে আমার দীক্ষাও তাঁদেরই কাছে।

ক্রিকেটে আমার প্রথম পাঠ ওদেরই কাছে হয় এবং সেই শুরু থেকেই আমার তাতে প্রবল আগ্রহ জাগে। সুবিধা পেলেই আমরা পুলিশ লাইন্স থেকে ছেলে সংগ্রহ করে দুটি দল গড়ে ফেলতাম। খেলাটা খেলামাফিকই শুরু হত, তা বলে খেলার মধ্যে সব আইন কানুন মেনে চলার কোন দায় ছিল না। খালি কেরোসিন টিন দিয়ে স্টাম্প হত বলে আনন্দ ও উদ্দীপনা কিছু কম হত না।

সেদিন বিকেলে ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। তারি মধ্যে সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া পুলিসের ইনস্পেক্টর-জেনারেল মিঃ ওয়াটারভীল্ড আয়োজিত শিশুদের বার্ষিক স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হল। আমি ফ্ল্যাটরেসে জিতে সাহেবের হাত থেকে এক

কাপ চকোলেট পুরস্কার পেলাম। পুরস্কার যত সামান্যই হোক, জীবনে প্রথম, তাতে কী যে আত্মতৃপ্তি! মাটিতে আর পা পড়ে না।

কয়েক মাস পরেই বাবা চাকরি থেকে অবসর নিলেন, আমরাও পুলিস লাইন্স ছেড়ে রেসিডেন্সি এলাকায় নিজেদের বাড়ি আলি মঞ্জিলে উঠে এলাম। এখন সে পাড়ার নাম যশোবন্ত রাও হোলকারের একমাত্র কন্যা উষা দেবীর নামানুসারে 'উষাগঞ্জ' হয়েছে।

এতদিন পর্যন্ত গৃহশিক্ষকের কাছে বাড়িতেই আমার পড়াশুনা চলছিল। গৃহ শিক্ষক আমাকে উর্দ্দু শেখাতেন কিছু কোরান মুখস্ত করাতেন, আর অঙ্কও শেখাতেন। ধর্মপ্রাণ ঋজু চরিত্রের সেই মানুষটি আমার উপরে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিলেন আজও তাঁর কথা আমার মনে পড়ে। আমার বিশ্বাস আমার চরিত্রগঠনে তার অবদান অনেকখানি।

নতুন বাড়িতে আসার দিন কয়েকের মধ্যেই বাবা আমাকে ও আমার ছোট ভাই ইশ্তিয়াক আলিকে এক প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। সপ্তাহখানের মধ্যেই সেখানে অনেকের সঙ্গে ভাব জমে গেল।

আমাদের প্রাথমিক স্কুলে ক্রিকেট খেলার কোন সুযোগ ছিল না। তাই স্কুলের মাঠে আমরা ফুটবল ও হকি খেলতাম। দুই খেলাতেই আমি বেশ উন্নতি করলাম, কিন্তু ক্রিকেট খেলতে না পারার দুঃখ তাতে ভুলতে পারিনি। বাড়ির পাশে একটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে সেখানেই যাহোক বিকল্প সংগ্রহ করে আমরা আমাদের মতন ক্রিকেট খেলা চালাতে লাগলাম। এই ভাবেই দুটো বছর কেটে গেল।

একদিন জনাতিন স্কুলের বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে হেডমাস্টারমশাই-এর কাছে ক্রিকেট খেলার সুযোগ সুবিধার জন্য আবেদন জানালাম। হেডমাস্টারমশাই সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের কথা ভেবে দেখবেন বললেন, আমরা মনে আশা নিয়ে বার হলাম তাঁর ঘর থেকে।

মাস দুই কেটে গেল, হঠাৎ একদিন হেডমাস্টারমশাই-এর কাছে থেকে ডাক এল। ক্লাসের পরে আমাদের কয়েক জনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বাজারে বেরুলেন। যখন স্কুলে ফিরে এলাম তখন ক্রিকেট সরঞ্জামে আমরা বোঝাই, মন উল্লসিত। যেন যুদ্ধ হয় করে শত্রু দুর্গ থেকে অনেক ধনসম্পদ সংগ্রহ করে ফিরেছি। আনন্দ চরমে উঠলো যখন আমাকে করা হল ক্রিকেট ক্যাপ্টেন।

স্কুলে ক্রিকেট পিচ ছিল না, ফুটবল হকির মধ্যেই শুরু হয় আমাদের

ক্রিকেট খেলা, অবশ্য সেখানে ম্যাটিংও ছিল না। প্রায় ওই সময়েই ইন্দোর রাজ্যের ক্রিকেটপ্রিয় শাসক স্যর তুকানী রাও হোলকার সি কে নায়ডুকে ইন্দোর নিয়ে এলেন এবং তাকে ইন্দোর সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেনের পদমর্যাদা দিলেন। ইন্দোরস্থিত প্রখ্যাত যশোবন্ত ক্রিকেট ক্লাবেরও অধিনায়ক হলেন সি. কে। চতুর্দলীয় প্রতিযোগিতায় খ্যাতি অর্জন করেছেন এমন কয়েক জন সর্বভারতীয় খেলোয়াড় তখন যশোবন্ত ক্রিকেট ক্লাবে। সি. কে নায়ডু ছাড়াও সে দলে ছিলেন জে. জী-নাভলে, লয়লা যোশী, টি কালে, প্যারে খাঁ, সাহাবুদ্দিন এবং আরো অনেকে। কাজেই যশোবন্ত ক্লাব তখন ভারতের এক শক্তিশালী ক্রিকেট সংগঠন। যশোবন্ত ক্লাবের খেলোয়াড়দের লাল-সাদা ক্লাব ব্যাজ আঁটা চকোলেট রঙের ঝকঝকে কোটগুলি আমার মনে যা মোহ সৃষ্টি করেছিল, আজও তা স্পষ্ট মনে পড়ে। সতৃষ্ণ নয়নে ওই কোটগুলির দিকে তাকাতাম আর ভাবতাম, কোনদিন কি আমারও গায়ে উঠবে ওই কোট। তখন অবশ্য জানিনি যে ভাগ্যদেবী অচিরেই আমার সে আশা মিটিয়ে দেবেন।

চার

ব্যাট-বল থেকে ক্রিকেট

আমারই ভাগ্যের জোর বলতে হবে, নইলে সি কে নায়ডু আমাদেরই বাড়ির কাছাকাছি একটা বাসা ভাড়া করলেন কেন? ছোট দুভাই সি আর এবং সি-এসও দাদার সঙ্গে থাকেন। সি এস আমারই স্কুলে এসে ভর্তি হল আর প্রথম দিনেই আমার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল তার, যখন দেখলাম সি আর এবং সি এস দুজনেই আমার মত ক্রিকেট-পাগল, আমার অপরিসীম আনন্দ হল। আর তাতে আমাদের মধ্যে সম্পর্কও হল নিবিড়তর। সি এসকে দলে পেয়ে স্কুল টীমের শক্তিই শুধু বাড়লো না, আমাদের খেলারও উৎসাহ বাড়লো।

কিছুদিন বাদেই আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করে নতুন হাইস্কুলে ভর্তি হলাম কিন্তু সেখানেও ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা না থাকায় সেই ফুটবল ও হকি নিয়েই পড়ে থাকতে হল আমাদের। এই দুই খেলাতেও আমি

স্কুলের মধ্যে নাম করেছিলাম, হকিতে স্কুলের হয়ে লেফট-আউট খেলেছি। তা বলে ক্রিকেট আমরা ছাড়িনি, নিজেদের সাধ্যমত ব্যবস্থা করে খেলতে লাগলাম, ঠিকমত খেলছি কিনা তা নিয়ে মাথা ব্যথা করলাম না। পরবর্তী যুগে যে আমার খেলাকে "গতানুগতিক স্ট্রোকের বাইরে" বলে আজকে বর্ণনা করেছেন, সেই স্ট্রোক বোধ হয় প্রথম জীবনে যথেচ্ছ খেলা থেকেই অঙ্কুরিত হয়েছিল।

নিজেদের একটা ক্রিকেট টীম গড়বার দৃঢ় সংকল্প তখন আমাদের মনে। টাকার জোগাড় কি ভাবে হবে ভেবে পাচ্ছি না, কিন্তু তাতে তো আর ঘাবড়ালে চলবে না। জলখাবারের পয়সা থেকে সবাই কিছু কিছু চাঁদা দিয়ে সামান্য কটা টাকা উঠলো, একটা পাঁচমেশালি পুরনো জিনিষের দোকানে অনেক দরাদরি করে একটা ব্যবহৃত ব্যাট ও একটা কর্কের বল কেনা হল তা দিয়ে। রাস্তা থেকে ছুতোর ধরে বানানো হল স্টাম্প।

আমাদের ক্লাবে তখন দুজোড়া ভাই, সি এস, আর সি আর এবং আমি ও ইশতিয়ার। আমাদের চেয়ে বয়সে বড়দের দলকে বার কয় হারিয়ে আমরা আমাদের দলের শক্তি প্রমাণ করলাম। পুরানো ব্যাট ও বল কিছুদিনের মধ্যেই অকেজো হয়ে পড়লো। এবার কিন্তু আবার টাকার ব্যবস্থা করা গেল না। অকাল মৃত্যু ঘটলো ক্লাবের। তবে ইন্দোরওয়ালাদের ক্রিকেট বাতিক অচিরেই আমার সমস্যা মিটিয়ে দিল। মেডিক্যাল কলেজের মাঠে শনিবার রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনে প্রায়ই তখন ক্রিকেট ম্যাচ খেলা হয়। মাঠটা আমার বাড়ির কাছেই, কাজেই সুযোগ পেলে লুকিয়ে খেলা দেখতে যাই—তা যেমন খেলাই হোক না কেন। ক্রিকেট তখন আমাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে খেলা শুরুর একঘণ্টা আগেই আমি মাঠে এসে হাজির, মালিটা ছাড়া কেউ তখনো মাঠে আসেনি।

মেডিক্যাল কলেজের মালি নাসিরের ছোট ছেলেদের প্রতি খুব টান। কিছুদিনেই তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললাম। সে যখন পিচ তৈরীর কাজ করে, আমি সঙ্গে লেগে যাই, ব্যাগ গোছ গাছ করার সময়ও হাত মেলাই।

ভগবান বুঝি শেষ পর্যন্ত আমার মনে কথা শুনলেন। একদিন টীমে একজন খেলোয়াড় কম পড়ে যেতে ক্যাপ্টেন আমায় ডেকে নিলেন। কী মন দিয়ে ও আগ্রহ নিয়ে খেলা, যেন টেস্ট ম্যাচে ঠাঁই পেয়েছি। সেই থেকে লোক কম পড়লেই আমি ফাঁক ভর্তি করে দি। দলে খেলোয়াড় কম না পড়লেও

খেলায় আমার ঠিক ঠাঁই হয়ে যায় হয় স্কোর লেখার কাজে না হয় স্কোরবোর্ডে 'নম্বর চড়ানোর। সবকিছুতে নাজির আমাকে প্রশ্রয় দেয়। ক্রিকেটের সঙ্গে নিত্য লেগে থাকতে পেয়ে ততদিন আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে। ক্রমেই দৃঢ় প্রত্যয় জাগলো ক্রিকেটই আমার নিজের স্পোর্ট।

মন তবু ভরে না, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বেড়েই চলে। এবার আমি লয়াল ক্রিকেট ক্লাবে যোগ দিলাম। সি আর এবং সি এস-ও এল। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী জি এস পণ্ডিতের দারুন উৎসাহ। ১৪ মাইল সাইকেল ঠেঙিয়ে তিনি মাঠে ক্যান্টনমেণ্টে যান আমাদের ম্যাচ ঠিক করতে। শ্রী পণ্ডিতের ক্রিকেট পাগলামি এমন যে এক প্রতিযোগিতায় ক্লাবের নাম দেবার প্রয়োজনে নিজের সাইকেলখানা বেচে দিতেও একটুকু দ্বিধা বোধ করেন নি তিনি।

লয়্যাল ক্রিকেট ক্লাবের নিয়মিত সদস্য হিসেবে আমি ডালি কলেজ মাঠে অনেক ম্যাচ খেলেছি। রাজকুমারদের শিক্ষার জন্য ইন্দোরের কলেজের ক্রিকেট মাঠটি অনবদ্য। চমৎকার পরিবেশ। দক্ষিণ পশ্চিম কোনে সুন্দর একটি প্যাভিলিয়ান, আর ঠিক তার উল্টো দিকে কলেজের মূল বাড়ির মাথায় ছবির মত ঘড়িওয়ালা মিনার। এই প্যাভিলিয়ানে বসে ক্রিকেট দেখার আনন্দ ওই মাঠে খেলার আগ্রহ জাগিয়ে তোলে।

এম জি স্ল্যাটার নামে একজন প্রবীণ অক্সফোর্ড ব্লু, যাঁর কাছ থেকে স্বর্গত পতৌদীও ক্রিকেট খেলার প্রথম পাঠ কিছু কিছু নিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন ডালি কলেজের শিক্ষক। তিনি কলেজের মাঠে মাঝে মাঝে এসে হাজির হতেন এবং শুধু কলেজের ছাত্রদের উপস্থিত সবকেই ক্রিকেট সম্পর্কে উপদেশ দিতেন। বলা বাহুল্য আমি তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

আমাদের হেডমাস্টার ক্রিকেট সম্পর্কে উদাসীন আর ডালি কলেজ সম্পর্কে তাঁর ছিল বিরাগ। তাঁর স্কুলের ছাত্ররা ডালি কলেজ মাঠে খেলবে এতে তাঁর প্রবল আপত্তি ছিল। কিন্তু ক্রিকেটের আকর্ষণে ও লয়্যাল ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে খেলবার জন্য আমি হেডমাস্টারের হুকুম অগ্রাহ্য করেই স্কুল কামাই করে বা ক্লাস থেকে পালিয়ে চলে আসতাম। খেলার সাথীদের মধ্যেই কে যেন একদিন ঈর্ষাবশে হেডমাস্টারকে তাঁর নিষিদ্ধ এলাকায় আমার ক্রিয়াকলাপের খবর (গোপনে) পৌছে দিল। সে যুগে কড়া মাস্টারের প্রধান অস্ত্র ছিল বেত। অপরাধের শাস্তি হিসেবে সবার সামনে আমাকে বেত মারা

হল। বেতখাওয়া সহ্য করতে রাজি আছি, ক্রিকেট ম্যাচে থাকবো না তা অসহ্য।

পরের বছর ভারতের কজন প্রধান ক্রিকেটার ইন্দোরে খেলতে এলেন। খেলাটা ডালি শীল্ডের ফাইনাল, তবু তা আমার পক্ষে নিষিদ্ধ এলাকা ডালি ক্লাবের মাঠে না হয়ে যশোবন্ত ক্লাবের মাঠে অনুষ্ঠিত হল। যশোবন্ত ক্লাবের সঙ্গে ভূপালের হামিদিয়া ক্লাবের খেলা, স্বয়ং ভূপালের নবাব তাতে হামিদিয়া ক্লাব দলের অধিনায়ক। সে দলে আরো সব বাঘাবাঘা খেলোয়াড় ছিলেন। যথা, উজীর আলি, এল. পি. জয়, বোটাওয়ালা ও ১৯১১ সালে ইংল্যাণ্ড সফরকারী পাতিয়ালা মহারাজ দলের সদস্য সালাম উদ্দীন। যশোবন্ত ক্লাব দলও ফ্যালনা নয়, এদলে ছিলেন চৌকষ খেলোয়াড় সি. কে. নাইডু, জে. জি. নাভ্‌লে, এস এম যোশী, টিকালে, প্যারে খান ও আরো নামকরা খেলোয়াড়। যা নিদারুণ লড়াই হবে তা দেখতে মাঠে বেশ ভিড় জমেছে। সেই ভিড়ের মধ্যে গর্বভরে বুক চিতিয়ে আমিও বসে গেছি বাবার পাশে। বাবাই আমাকে স্কুল থেকে ছুটি করে এনেছেন।

খেলার বিশদ বিবরণ আজ আর মনে নেই, কিন্তু যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে খেলা দেখেছিলাম, তা ভুলতে পারিনি। আমাদের ইন্দোরের ক্লাবই জিতেছিল। মনে আছে সি, কে এক হাতে ব্যাট করেছিলেন। মাসখানেক আগে নাকি ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে ফেলেছিলেন তিনি কিন্তু এক হাতেই সেকি মার! বোলারেরা নাজহাল। কত রান করে ছিলেন মনে নেই, কিন্তু মনে আছে তাঁর দুর্দান্ত খেলা, শেষ পর্যন্ত জয়-এর একহাতের ক্যাচেই সেই ১-ইনিংসে ছেদ পড়লো। লম্বা যোশী ন্যাটা শ্লো বোলার কিন্তু ডানহাতে তাঁর ব্যাটিং অনবদ্য। প্যারে খানও চৌকষ খেলোয়াড়, ভালো ব্যাট ও চেঞ্জ বোলার। সবার সমবেত চেষ্টাতেই যশোবন্ত ক্লাবের জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল।

ভূপাল দলের মধ্যে উজীর আলি ও জয় উইকেটের চারপাশে মেরে দর্শকদের মন ভরিয়ে দিয়েছিলেন। ওইসব রথী মহারথীর খেলা যখন দেখেছি, ওদের সঙ্গে কোন দিন একই দলে খেলবো এমন বাতুল স্বপ্নও মনের কোনে উঁকি মারেনি। আমার মনের কল্পনা কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটেছে। সে রাতে ভালো ঘুম হল না, ম্যাচ যা দেখেছি সেই স্বপ্নেই রাত কাটলো।

ভোর বেলায় ঘুম ভেঙে গেল। জনকয় অন্তরঙ্গ বন্ধুকে ডেকে নিয়ে

একটু খোলা জায়গায় এলাম, সেখানে বড় বড় খেলোয়াড়দের নকল করে দেখাতে লাগলাম, বললাম, আমি সি, কে ও উজীর আলির মত ব্যাটিং করবো, লয়লা যোশীর মত বোলিং করবো। সঙ্গীরা হেসে উড়িয়ে দিল আমাকে, একজন তো বলেই বসলো একেবারে চাঁদে হাত! যে যা বলুক আমি গ্রাহ্য করিনি, বড় খেলোয়াড় হবো। দৃঢ় সংকল্প মনে তখন গেঁথে গেছে।

ইতিমধ্যে আমাদের লয়াল ক্লাব দশ মাইল দূরে উজ্জয়িনীতে সর্বমঙ্গলা প্রতিযোগিতায় নাম দিয়ে বসলো। প্রথম রাউণ্ডে আমাদের খেলা একটা রেল দলের সঙ্গে। খেলাটি আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে, কারণ বোলার হিসেবে ওই খেলায় আমার প্রথম সার্থকতা। বাঁহাতের স্লো স্পিন বোলিং-এ বেশ কয়েকটি উইকেট নিয়েছিলাম, কিন্তু তার উপরেও ছিল আমার হ্যাট্রিক। একজন দর্শক একটা রূপোর মেডেলও দিয়েছিলেন আমাকে। ক্রিকেট জীবনে সর্বপ্রথম পুরস্কার। আসলে তো ক্রিকেটে আমার প্রথম স্বীকৃতি বোলার হিসেবেই, বাঁহাতের স্লো স্পিন বোলিং-এর দক্ষতার জন্তই টেস্ট খেলায় প্রথম আহ্বান পাই, যদিও শেষ পর্যন্ত হয়ে গেলাম ব্যাটসম্যান, একেবারে ওপেনিং ব্যাটসম্যান, ভারতীয় দলের ইনিংস সূচনার দায়িত্ব যার উপর। ঠিক উল্টোটা ঘটলো আমার বন্ধু সি এস নায়ডুর বেলায়, তার খ্যাতি ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ গুগলি বোলার হিসেবে কিন্তু প্রথম দিকে সে মুখ্যত ব্যাটসম্যানই ছিল। এই ধরণের পরিবর্তন, সব উল্টোপাল্টা হয়ে যাওয়া—ক্রিকেটে দুর্জ্ঞেয় রহস্যই থেকে গেছে, ক্রিকেট পণ্ডিতদের বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা মেলেনি, অবশ্য পরবর্তী জীবনে এমনও ঘটেছে যে সি এস ও আমার ভূমিকা বদল হয়ে গেছে, সি এস ভালো ব্যাট করছে, আমি বোলিং-এ সার্থকতা লাভ করেছি।

কিছু দিনের মধ্যেই আমি সি এস, সি আর ও জগদেল সি কে নায়ুডুর কাছ থেকে আহ্বান পেলাম প্রখ্যাত যশোবন্ত ক্রিকেট ক্লাবের নিয়মিত সদস্য হবার জন্য। প্রাচীন পন্থী কেউ কেউ অতবড় নামকরা ক্লাবে চ্যাংড়াদের খেলতে দেওয়ার বিরোধিতা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সি কে-র সিদ্ধান্তই টিকে গেল এবং তাঁকে আমাদের জন্য কোনও সমালোচনার সম্মুখীণ হতেও দিইনি আমরা। লয়্যাল ক্লাবে আমার শূন্যস্থান পূর্ণ করলো আমার ছোট ভাই ইশতিয়ার আলি। পরে সেও মধ্যভারত এবং হোলকারের হয়ে খেলেছে।

এতদিন আমরা অসমতল পিচে খেলেছি, ম্যাটিং বলে কিছু জোটেনি। এবার যশোবন্ত ক্লাবে আমাদের অনেক সুযোগ, অনবদ্য ম্যাটিং উইকেট, অটো-

প্রায় ব্যাট এবং দামি বল নিয়ে প্র্যাকটিস্। নতুন পরিবেশে প্রথমে একটু অস্বস্তিই বোধ করেছি, কিন্তু উৎসাহভরে চেষ্টা করে ক'দিনেই সবকিছু সামলে নিয়েছি।

সি কে নায়ডুর নির্দেশে আমাদের নিয়মিত অনুশীলন চলতে থাকে। নায়ডু আমাকে নেটে বোলিং করান, ব্যাটিং এর সুযোগ প্রায়ই দেন না। ফিল্ডিং-এর দিকেই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। সি কে-কে বহুবার বলতে শুনেছি, আমি আগে ফিল্ডসম্যান চাই। ব্যাটিং পরে হলেও চলবে। তাঁর বাণী ছিল, ম্যাচ জিততে হলে ক্যাচ ধরতে হবে। আজ অবশ্য আমি সি কে-র ওই বক্তব্যের সঙ্গে একমত। দুঃখের বিষয় ভারতীয় ক্রিকেটে ফিল্ডিং-এর দুর্বলতা বরাবরের। সি এস, গুলমহম্মদ ও লাল সিং-এর মত ফিল্ডসম্যান ক'জন হয়েছে? পরবর্তী যুগে অবশ্য ফিল্ডিং এর কিছুটা উন্নতি দেখা গেছে ছোট পতৌদী, বোর্দে, সুর্তি, হনুমন্ত সিং-এর মধ্যে। ইদানীং কালে সোলকার, পার্কার, চৌহান, গভসকার প্রভৃতি তরুণ খেলোয়াড়দের ফিল্ডিং প্রশংসা পাবার যোগ্য।

পাঁচ

ক্রিকেটার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ

সেদিনটার সকালবেলার স্মৃতি আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সকালের দিকে বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ চোখে পড়লো শালপ্রাংশু পুরুষ সি কে তাঁর রাজকীয় পদক্ষেপে এগিয়ে আসছেন।

সি-কে-র ফৌজী চালচলন ও গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বে তাঁর সামনে পড়তে আমি ভয় পেতাম। তাঁকে আসতে দেখেই তাই ছুটে ভিতরে চলে গেলাম। কিন্তু একটু পরেই বাবার ডাকে তাঁর কাছে গিয়ে পড়ে গেলাম একেবারে সি-কে-রই সামনে। সি কে প্রস্তাব করলেন আমি ক্রিকেট খেলতে তাঁর সাথে হায়দ্রাবাদ যাব। বাবা সঙ্গে সঙ্গে মত দিলেন। কিন্তু সি কে-র প্রস্তাব ও বাবার সম্মতি জ্ঞাপনের মধ্যেকার সামান্য সময়টুকু যে নিদারুণ উত্তেজনায় কাটিয়েছিলাম, জীবনে এমন কদাচ ঘটেছে। বাবা যখন বললেন 'ঠিক আছে' আমি স্বস্তি বোধ

করলাম। সি কে বেহরামুদ্দৌল্লা ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় রাজা ধনরাজগিরি-র দলের হয়ে খেলতে হায়দ্রাবাদ যাবেন। তাঁর ইচ্ছা একজন তরুণ খেলোয়াড়কে সঙ্গে নেন। সে যুগে ওই প্রতিযোগিতাটি ভারতীয় ক্রিকেটের এক মুখ্য প্রতিযোগিতা বলে বিবেচিত হত। সারা দেশের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের সমাবেশ হত সেখানে। এহেন প্রতিযোগিতায় খেলবার জন্য মনোনীত হওয়ায় কোন তরুণ ক্রিকেটের পক্ষে যে বিরাট সম্মান, পনের বছরের এক ছোকরার পক্ষে তা স্বপ্নেরও অতীত।

কিন্তু ওই গণ্যমান্য সমাজে আমি কি করে খেলতে যাব? ক্রিকেট খেলার কোন পোশাকই আমার নেই, না শাদা প্যান্ট, না শার্ট; ক্রিকেট বুটের তো কথাই ওঠে না। কাকার শার্ট ও প্যান্ট দর্জী দিয়ে কাটিয়ে ছোট করে পোশাক সমস্যার সমাধান হল, আর বুট একজোড়াও চেয়ে চিন্তে সংগ্রহ করা গেল। রেল স্টেশনে পৌছে দেখলাম প্রথম শ্রেণীর কামরায় চড়ে যাবার ব্যবস্থা—কত দিনের সাধ এবার পূর্ণ হতে চলেছে। আরও দেখলাম প্রথম শ্রেণীর অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের দলে আমিই একমাত্র কাঁচা খেলোয়াড়।

নিজেকে সাংঘাতিক অযোগ্য মনে হল। রেলের কামরার এক কোণে বড় খেলোয়াড়দের থেকে বেশ দূরে চুপ করে বসে রইলাম। বাবা এবং আত্মীয় বন্ধু যাঁরা আমাকে গাড়ীতে তুলে দিতে এসেছিলেন, তাঁদের কারো সঙ্গে একটাও কথা বলতে পারলাম না। উত্তেজনার ফলে এমন ঘাবড়ে গিয়েছি যে মুখে রা ফুটছে না।

ট্রেনে সফর খুবই আনন্দে কাটলো, অভিজ্ঞ খেলোয়াড়েরা ক্রিকেটের নানান গল্প করে চলেছেন, আমি তা গোগ্রাসে গিলছি। কথাবার্তা শুনে অনুমান করলাম রাজা ধনরাজগিরি মস্ত জমিদার, হায়দ্রাবাদ রাজ্যে সবচেয়ে ধনীদের মধ্যে একজন তিনি, জাঁকজমকে ভারতের সামন্ত রাজাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেন। ক্রিকেট সম্পর্কে তাঁর দারুণ উৎসাহ উৎসাহ এবং তার জন্য দুহাতে খরচও করেন। হায়দ্রাবাদ স্টেশনে যখন পৌছলাম রাজার সেক্রেটারি প্রথমেই এসে আমাদের স্বাগত জানালেন। বিরাট এক রোলস্ রয়েস গাড়ী চড়ে রাজপ্রাসাদে এসে পৌছলাম। রাজ-অতিথি হিসেবে সেখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা। পুনার স্বনামধন্য ক্রিকেটার প্রোফেসার ডি. বি. দেওধর সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি, ১৯২৬ সালে আর্থার পিলিগানের অধিনায়কত্বে সফরকারী এম সি সি-র বিরুদ্ধে শতাধিক রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেছিলেন।
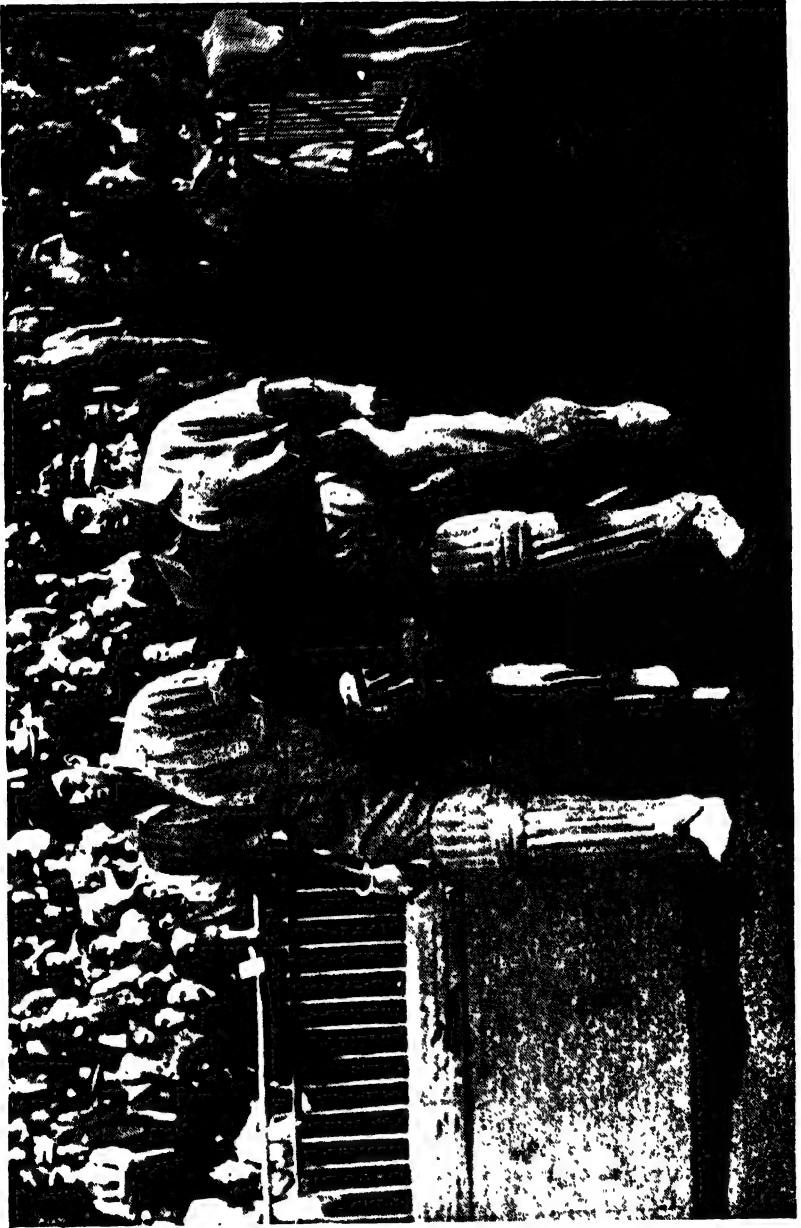
মুস্তাখ আলি বিজয় মার্চেন্টর সাথে তাদের জীবনের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠেরস্মরণীয় টেস্ট ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা করতে যাচ্ছেন।
সময় : ১৯৩৬।
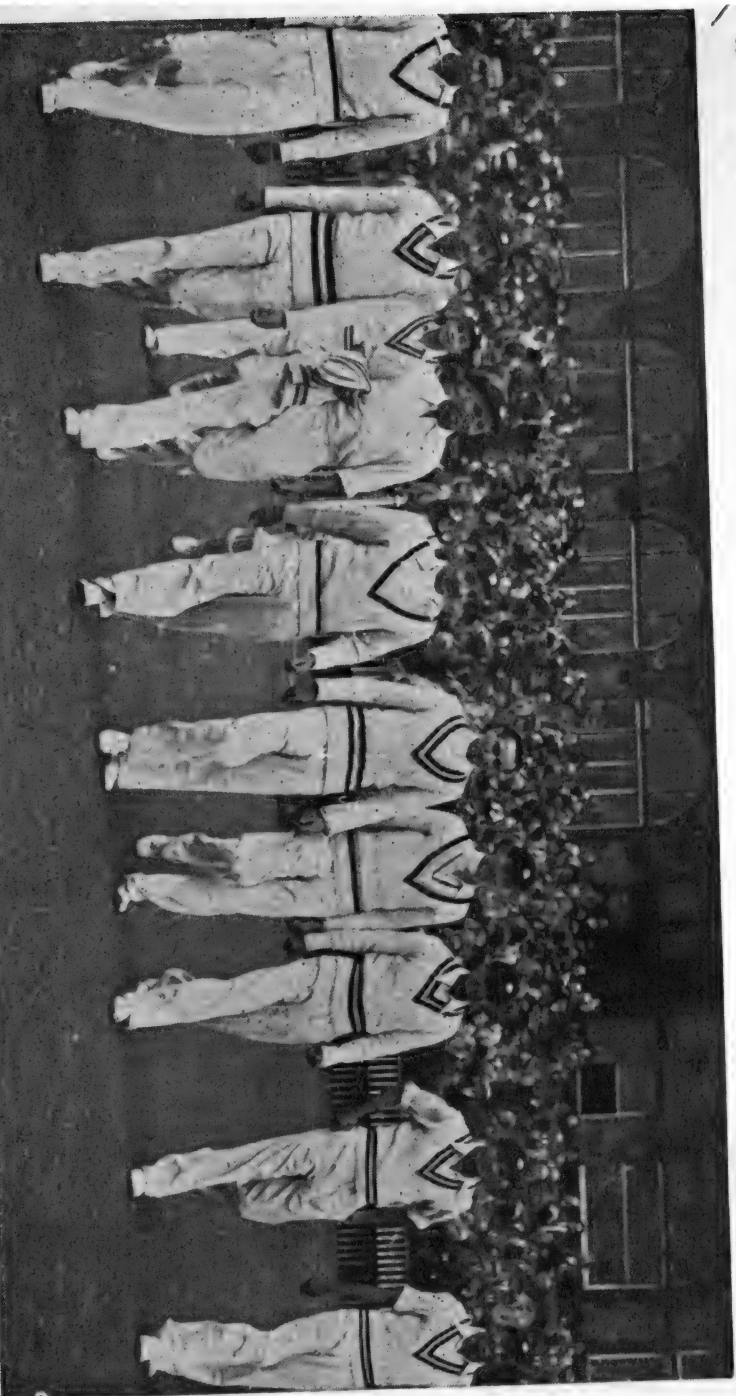
১৯৪৬ এ লর্ডসের মাঠে ভারতীয় দল এম. সি. সি.-কে যে ম্যাচে এক ইনিংস এবং ১৯৪ রানে হারিয়েছিল সেই দলের সাথে মুস্তাখ আলিকে ওই খেলার জন্যে মাঠে নামতে দেখা যাচ্ছে।

যখন জানলাম যে তিনি আমাদের দলের হয়ে খেলবেন, কী যে আনন্দ হল! প্রোফেসার যাঁদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, মোহনী নামে ডানহাতের মিডিয়াম ফাস্ট তরুণ বোলার, বর্তমানে তিনি টেস্টে আম্পায়ার রূপে সুপরিচিত।

খেলাগুলি যা হয়েছিল তার স্মৃতি এতদিনে ঝাপসা হয়ে গেছে। নিজাম স্টেট রেলওয়ের বিরুদ্ধে হ্যাট্রিক করেছিলাম আমি, পাঁচ রানে পাঁচটি উইকেট। হায়দ্রাবাদ দলের বিরুদ্ধে যখন আমাদের দল সঙ্কটের মুখে, সেই সময় ব্যাট করতে এসে ৬৫ রান করেছিলাম, সেই সঙ্গে সর্দার ঘোড়পাড়ের সঙ্গে শতাধিক রানের পার্টনারশিপে। ওই প্রতিযোগিতাতেই দুজন নামকরা স্পোর্টসম্যানের সাক্ষাৎ পাই, দুই ভাই এস এম হাদী ও মহম্মদ হুসেন।

ফাইনালে আমাদের দলই জয়লাভ করে এবং তার জন্য আমাদের সম্মানে বিরাট এক ভোজসভার আয়োজন হয়। আমার প্রথম জীবনের ওই সফরই বিরাট সাফল্য এনে দেয়। আমাকে ধনরাজগিরি দলের গোলাপীর উপর ফিকে নীল ডোরাকাটা কোট উপহার দেওয়া হয় আর হ্যাট্রিক করার পুরস্কার স্বরূপ রাজা নিজে দেন একটি ব্যাট ও দুইপ্রস্থ পশমী স্যুট। বোম্বাই-এর চতুর্দলীয় ক্রিকেটের নামকরা খেলোয়াড় কর্নেল মহম্মদ হুসেন দিলেন ৬৫ রান করার জন্য এক জোড়া বাকস্কিনের শাদা ক্রিকেট বুট। আমাকে উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে রাজা সাহেব আরো দিলেন নগদ পাঁচশ টাকা, যে টাকা দিয়ে আমি ক্রিকেট খেলার প্রয়োজনীয় সবরকমের সাজসরঞ্জাম কিনতে পারলাম। তাছাড়া প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে নিজের নাম বড় হরফে ছাপা হতে দেখে সে আরেক উন্মাদনা।

ছয়

মহাপুরুষ সঙ্গ—হব্‌স্‌ ও সাটক্লিফ্‌

হায়দ্রাবাদের সার্থকতায় উৎসাহিত হয়ে সি. কে দিল্লীর সারাভারত রোশনারা ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় আকৃষ্ট হলেন। বেশ কয়েকটি শক্তিশালী দল ওই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল। ভিজিয়ানাগ্রাম একাদশের

অধিনায়ক ছিলেন মহারাজকুমার, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ক্রিকেটের সম্পর্ক যাঁর ছিন্ন হয়নি। ক্রিকেট সম্পর্কে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমারের অবদান কারো চেয়ে কম নয়, আর আমার ক্রিকেট জীবনে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

দিল্লীর প্রতিযোগিতায় সি. কে-র দলের সঙ্গে গিয়েও আমি খেলার সুযোগ পাইনি। কিন্তু কোন একটি খেলায় দ্বাদশ ব্যক্তি হিসেবে বদলী ফীল্ডার নেমে আমি তিনটি চমৎকার ক্যাচ ধরি। তাই দেখে মহারাজকুমারের মনে ধরলো, আমার জন্য যথাযথ অনুশীলন ব্যবস্থা করবেন এমন প্রস্তাব তিনি করলেন। তাঁর ইচ্ছা আমি বারাণসীতে তাঁর কাছে থাকি। আমার সমস্ত খরচও তিনিই বহন করবেন বললেন। সি. কে-র সঙ্গে আলোচনা করলেন মহারাকুজমার। সি. কে জানালেন, আমার বাবার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলবেন। জীবনে ক্রিকেটার হবার এত বড় সুযোগ পাব ভেবে খুবই আনন্দ পেলাম বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন ও ইন্দোরের সঙ্গীদের ছেড়ে দূরে থাকতে হবে বলে মনটা খারাপও হয়ে গেল। কিন্তু দিল্লীতে এসে জীতমল নাতমল, গোলাম মহম্মদ, রামজী প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ হওয়ার ফলে ইন্দোর শহর ও রাজ্যের সীমিত পরিধির বাইরে বৃহত্তর জগতে ঘোরাফেরা করবার বাসনাও মনে মনে জাগলো।

ক্রিকেট সম্পর্কে বাবার অসীম আগ্রহ, তাই সহজেই মত দিয়ে দিলেন। বারাণসী পৌঁছে দেখি আমার বন্ধু সি. এস নাইডু, তার ভাই সি. আর ও আলিরাজপুরের সাহাবুদ্দীন রাজপ্রাসাদে আগে থেকেই রয়েছেন। পড়াশুনায় যাতে ছেদ না পড়ে তার জন্য আমাকে বাঙালীটোলা হাই স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। ভিজিয়ানাম প্রাসাদের পরিধির মধ্যেই অনবদ্য ক্রিকেট মাঠ এবং সেখানে আমাদের দৈনিক অনুশীলনের ব্যবস্থা। আমি দুর্বলদেহী চেহারার রোগা মানুষ। কিন্তু মহারাজকুমারের যত্নে স্বাস্থ্যের উন্নতি হল, ওজনও বাড়লো। নেটপ্র্যাকটিস ছাড়া স্থানীয় দলের সঙ্গে ম্যাচের ব্যবস্থা করা হত। তাছাড়া এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ ও আগ্রায় সফরের ব্যবস্থাও হত মাঝে মাঝে। আমার বোলিং-এর যে উন্নতি হল এই সব সফরে আমার নেওয়া উইকেট সংখ্যাতে তার প্রমাণ মিললো।

কিছুদিনের মধ্যেই মহারাজকুমার এক শক্তিশালী দল গঠন করলেন এবং ভারত ও সিংহলের নানা কেন্দ্রে সফরের পরিকল্পনা করলেন, যখন জানলাম

ইংল্যাণ্ডের জ্যাক হব্স ও হার্বার্ট সাটক্লিফও দলে যোগদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, আমার আনন্দের সীমা রইল না।

যেদিন থেকে ক্রিকেটের গল্প শুনতে শুরু করেছি, সবচেয়ে বেশি শুনেছি হব্স ও সাটক্লিফের নাম। জেনেছি হ্বস দুনিয়ার সেরা ব্যাটসম্যান, সাটক্লিফের সঙ্গে জুড়িতে ইংল্যাণ্ড দলের ব্যাটিং সূচনা করে টেস্ট ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া দলের মাথা ধরিয়ে দেন। সে যুগে ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ম্যাচ এই সব সংজ্ঞাগুলি আমাদের কাছে যেন কল্পলোকের বিষয়। আর জ্যাক হব্স তো পক্ষীরাজ ঘোড়ার সওয়ার রূপকথার রাজপুত্র বিশেষ। একটা ষোল বছরের ছেলে তো তাঁকে চাক্ষুষ করলেই ধন্য হয়ে যাবে। তার ওপর সাটক্লিফের সঙ্গে জুড়িতে তাঁকে ব্যাটিং করতে দেখা, এর চেয়ে বড় জীবনে কি আর আকাঙ্খা থাকতে পারে! এরও পরে যখন জানলাম যে ওই সফরকারী দলে আমিও থাকবো - উত্তেজনায় সে রাতে আর ঘুম হল না। ওই দুই ইংরেজ মহারথী ছাড়াও ভারতের কয়েকজন ক্রিকেটার ওই দলে যোগদান করলেন, আমি হলাম দলের কনিষ্ঠ সদস্য।

অন্য কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হবার আগে বারাণসী প্রাসাদ মাঠে এলাহাবাদের বিরুদ্ধে একদিনের একটি খেলা হল। হবস ও সাটক্লিফ ইনিংস সূচনা করে জুড়িতে ১০৬ রান তুললেন; সাটক্লিফ ৯৩ রান-এ আউট হলেন, খেলা শেষের আগে হঠাৎ হবস নিজস্ব শতরান পূর্ণ করলেন। ফিরতি ম্যাচে সি. কে-র সঙ্গে আমাকে ইনিংস সূচনা করতে পাঠান হল: পরবর্তী জীবনে যা কৃতিত্বের সঙ্গে বহুবার করেছি এখানেই হল তার প্রথম সূচনা। দলের রান উঠলো পাঁচ উইকেটে ২০৩, আমি নিজে করলাম ৫৩।

প্রথম বড় ম্যাচ খেলা হল দিল্লী রোশনারা ক্লাবের মাঠে অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশের বিরুদ্ধে। ভারতের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটারই মহারাজকুমারের দলে, ফলে অবশিষ্ট দল তেমন জোরদার হয়নি। তা বলে লিম্বডির রাজা ঘনশ্যাম দাসের নেতৃত্বে উজীর আলি, অমর সিং, ইব্রাহিম প্রভৃতিকে নিয়ে গড়া দলও অবহেলার পাত্র ছিলনা। অবশিষ্ট দলের হয়ে বোলিং-এ সবচেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন এ. এস. ডি মেলো—পরবর্তীকালে যিনি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সবচেয়ে উদ্যোগী সভাপতিরূপে এবং ভারতীয় ক্রীড়াজগতে নিজস্ব অবদানে অক্ষয় কীর্তির অধিকারী। হবস ৩০ করে ডি'মেলোর বলে আউট, সাটক্লিফ আউট মাত্র ৭ রান করে, আনন্দে

লাফিয়ে উঠে নাচতে লাগলেন ডি'মেলো, এরও পরে তিনি সি. কে. নাইডুকে (২৮) বোল্ড আউট করলেন এবং মোট ছ'টি উইকেট নিলেন ৬৬ রানের বিনিময়ে। আমি তিন নম্বর হিসেবে ব্যাট করতে নেমে হবসের সঙ্গে জুড়িতে মাত্র পাঁচ রান করে রান আউট হই, দ্বিতীয় ইনিংসে হবসের রান আউট হবার পালা, ভারত সফরে দ্বিতীয় শতরান করতে তখন মাত্র সাত রান বাকি। সাটক্লিফ আবার ডি'মেলোর বলে আউট হলেন, সি. কেও আমাকেও ডি'মেলোই আউট করলেন। আমার রান এবার হল ২৮। তবু অবশিষ্ট দলকেই ১৯৩ রানে হারতে হল।

আমাদের পরবর্তী বিহারভূমি কলকাতায়, যে শহরে ক্রিকেটের বয়স তখন একশ বছর পেরিয়ে গেছে। কলকাতায় খেলার আমার আগ্রহ অন্য কারণে। যা কিছু এতদিন খেলেছি সবই ম্যাটিং উইকেটে, শ্যামলা বাংলার রাজধানী কলকাতায় ঘাসের উইকেটে খেলতে কেমন লাগে, তারই আকর্ষণ বোধ করছিলাম।

প্রথম মোহনবাগানের সঙ্গে একদিনের খেলা। ফুটবলে মোহনবাগানের খ্যাতি তখন সারা ভারতজোড়া, তাদেরই সঙ্গে ক্রিকেট খেলবো কিন্তু শখ আর মিটলো না, দুদলকেই সারাদিন বসে কাটাতে হল। আগের দিন রাত্তিরে বৃষ্টি হয়েছে। বার বার পিচ পরিদর্শন করেও আম্পায়ার খেলা সম্ভব বলে মনে করলেন না।

সেই রাতের বৃষ্টির পর দুদিনের আকাশ মেঘে ঠাসা। ফলে পরের দিন যখন ইডেন গার্ডেনের খেলা, সেখানকার পিচ সাংঘাতিক রকমের নরম। এখানেই বাংলা গভর্ণরের একাদশের বিরুদ্ধে আমাদের কলকাতার মুখ্য খেলা। ইডেন গার্ডেনের ঘন সবুজ নন্দন-কানন সদৃশ পরিবেশ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম, সারিসারি আকাশ-ছোঁয়া পাতাভরা গাছে খেলার মাঠটি ঘেরা দেখে মন ভরে গেল।

বাংলার গভর্ণর তখন স্যর স্ট্যানলি জ্যাকসন, ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ক্রিকেটে স্মরণীয় ব্যক্তি। অনেকগুলি টেস্টে অধিনায়কত্ব করেও কোন টেস্টে পরাজিত হননি তিনি। ১৯০৫-এর টেস্ট সীরিজে রানের (৪৯২ রান, গড়ে ৭২.৮) ও উইকেটের (১৫ উইকেট, গড়ে ১৫.৪৬) হিসেবে শীর্ষস্থানে ছিলেন। এমন একজন ক্রিকেটারকে চাক্ষুষ করাই সৌভাগ্যের কথা। আর তাঁর দলের বিরুদ্ধে খেলবার সুযোগ সে তো মস্তবড় সম্মান। কিন্তু সব ছাপিয়ে গর্বে
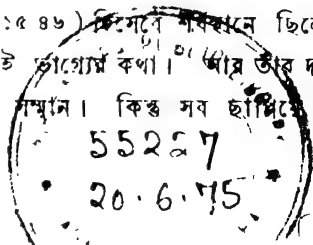
আমার বুক ভরে উঠলো যখন মূলত আমারি বোলিং-এর জোরে তাঁর দলকে আমরা হারিয়ে দিলাম।

স্থানীয় দল আগে ব্যাটিং করে সকালের দিকে দিব্যি রান তুলে চললো। কিন্তু সূর্য উঠতেই সব গেল উল্টে। সবুজ ঘাসে ঢাকা পিচ রোদে শুকিয়ে মৃত্যু ফাঁদ বনে গেল, চার উইকেটে ১৫০ রানের পর আর মাত্র ২২ রান যোগ হতেই সব খতম। এই ঘটনা সম্ভব হল আমার বাঁ-হাতের আলতো স্পিন বোলিং-এর ফলে, আমার এক ওভারে তিনটি উইকেট পড়লো, গণেশ বোস কোনমতে হ্যাট্রিক ঠেকালেন। আমার বোলিং-এর হিসেব হল ১২ ওভার, ৮ মেডেন, ৩৬ রান, ৬টি উইকেট।

উইকেটের ওই অবস্থার সুযোগে কলকাতার বোলাররাও আমাদের বিপদে ফেললো, নক্ষত্র মার্কা খেলোয়াড় নিয়ে তৈরি দল মোট ৭৮ রান তুললো। মাত্র [illegible] রান করে সাটক্লিফ আউট হলেন টেরেন্স সুইনি-র বলে, আর ১৪ রান করে হবস আউট হলেন গুর্লের বলে।

স্থানীয় দলে দ্বিতীয় ইনিংসের গোড়াতেই আঘাত হানলাম আমি, যার ফলে সূচনাকারী কার্তিক বসু ও আমাদ আলিকে যখন প্যাভেলিয়নে ফেরৎ পাঠালাম স্কোর বোর্ডে তখন মোট রান সংখ্যা দুই। বিপর্যয় ঠেকানো কারোর পক্ষে সম্ভব হল না, মাত্র ৪৬ রানে ইনিংস শেষ হয়ে গেল। দ্বিতীয় ইনিংসেও আমারই বোলিং সাফল্যের গড় হিসেব ১২-[illegible]-১৮-[illegible]। সাত উইকেটে জিতে গেল মহারাজকুমারের দল।

মন তখন খুশিতে উচ্ছল, আত্মপ্রসাদে ভরপুর। কিন্তু এর পরেও এল অভাবনীয় সম্মান। খেলা শেষে বহু মানীগুণী ও জনতার সামনে স্বয়ং হবস্ আমার বোলিং কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিলেন এক জোড়া রূপা বাঁধানো ব্রাশ উপহার দিয়ে।

আমি যতদিনে ক্রিকেটার হিসেবে পূর্ণবিকাশ লাভ করেছি হবস ও সাটক্লিফ দুজনেই ততদিনে ক্রিকেট-রূপকথার বিষয়বস্তু হয়ে গেছেন, ইংলণ্ডে খেলতে গিয়েও হবস আমার কাছে সুদূরের তারকা বলেই প্রতিভাত হয়েছেন। কবছর আগে ৮২ বর্ষ বয়সে স্যার জ্যাক হবসের মৃত্যুতে ধ্রুপদী ও আধুনিক ক্রিকেটের শেষ যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে। কিন্তু যে রূপোর ব্রাশ তিনি আমায় উপহার দিয়েছিলেন, তা স্পর্শ করলেই আজও আমি সেই মহান ক্রিকেটারের সস্নেহ করমর্দন ও তাঁর অন্তরের উষ্ণ আবেগ অনুভব করি। ক্রিকেটের ওই

পরম পুরুষের স্মৃতিবাহী ব্রাশজোড়া আমার মনে তাঁর পবিত্র স্মৃতি নিরন্তর জাগিয়ে রাখে, উপলব্ধি করায় ক্রিকেট আমার জীবনচর্যা, জীবনদর্শন ও জীবনধর্ম।

পরবর্তী জীবনে যে প্রীতির ধারায় কলকাতার মানুষ আমাকে অভিষিক্ত করেছে, ইডেন গার্ডেনে প্রথম আত্মপ্রকাশে তাঁর বিন্দুমাত্র আভাসও পাইনি। ক্রিকেটে বড় বড় নামে, বিশেষ করে হবস ও সাটক্লিফের নামে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এসেছিল হাজার হাজার মানুষ। একটা ১৬ বছরের ঢ্যাঙা-দুবলা ছেলে কি করছে না করছে তা নিয়ে কোন আগ্রহ ছিল না কারো। নামকরা স্থানীয় ব্যাটসম্যানেরা সুন্দর খেলেছে আর দেশ-বিদেশের রথী-মহারথী কাৎ হচ্ছে দেখে প্রভূত আনন্দ ও উত্তেজনা বোধ করেছে জনতা, নিজেদের বোলারদের সাফল্যে উল্লসিত হয়েছে। সেই অবস্থায় আমি যখন কলকাতার প্রিয় ব্যাটসম্যানদের উইকেট ঝপাঝপ ভাঙছি, ওরা মোটেই খুশি হতে পারেনি, চীৎকার, টিটকারি ও গালাগালি দিয়ে বাপান্ত ও শাপান্ত করেছে আমাকে। তবু পরবর্তী অভিজ্ঞতা থেকে নিঃসঙ্কোচে ও জোর দিয়েই বলতে পারি যে, কলকাতার জনতা ভালো খেলার গুণগ্রাহী এবং সে বিষয়ে দেশী ও বিদেশী বাচবিচার করে না। বিশেষ করে সবচেয়ে কমদামের গ্যালরিতে ক্রিকেটের সুক্ষ্ম রসবোধ এবং প্রকৃত ক্রিকেট মনোভাবের অভাব কখনো দেখিনি, ব্যাটিং হ ক্রিকেটের আকর্ষণীয় দিক, আর বোলার প্রত্যাশিত ব্যাটিং দেখায় দর্শকদের বঞ্চিত করে। তাই সারা দুনিয়াময় ক্রিকেট দর্শক বোলারদের সম্পর্কে একান্তই নারাজ।

পরবর্তী জীবনে ব্যাটিং-এই আমি প্রাধান্য অর্জন করি, কলকাতায় প্রথম খেলতে এসে সেদিকে আমি কিন্তু একেবারেই ব্যর্থ হয়েছিলাম, কোন রান করার আগেই গুর্লের বলে হোসির হাতে ধরা পড়ি। খেলোয়াড়ের জমায়েতে কথা প্রসঙ্গে সাটক্লিফ ভারতের প্রখর সূর্যালোকে অনভ্যস্ত চোখ নিয়ে ব্যাটিং করার অসুবিধার কথা বললেন। হবস মত প্রকাশ করলেন যে রঙীন সাইটস্ক্রীন ব্যবহার করা হলে বল ঠিকমত দেখা যাবে। হয়তো হবস-এর ওই কথা তখনকার ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের মনে ধরেছিল, তাই পরের বার খেলতে এসে দেখলাম, ইডেন গার্ডেনে শাদার বদলে ফিকে সবুজ রংয়ের সাইটস্ক্রীন খাটানো হয়েছে।

কলকাতা থেকে আমরা মাদ্রাজ গেলাম। সেখানে চিপক মাঠে মাদ্রাজ

প্রেসিডেন্সি একাদশের বিরুদ্ধে খেলা। আমার জন্মকর্মস্থল ইন্দোর কলকাতার চেয়ে মাদ্রাজের অনেক কাছে, কাজেই চিপক মাঠের ছবির মত পরিবেশ ও স্পোর্টিং উইকেটের সুখ্যাতি বরাবরই শুনে এসেছি। সেই চিপক মাঠে খেলতে নেমে আমি আনন্দে উদ্বেল হলাম। তার চেয়ে বেশি উত্তেজনা বোধ করলাম তখনকার ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাট খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড় সি. পি. জনস্টন, এইচ. পি. ওয়ার্ড, আর নেইলার প্রভৃতিকে বিপক্ষ দলে খেলতে দেখে।

ইডেন গার্ডেনের মতন চিপকেও বৃষ্টির জন্য পিচ ভিজে ছিল, যার ফলে এখানেও বোলারদেরই পোয়া বারো। আমাদের দলের প্রথম ইনিংস ১১০ রানে খতম আর উত্তরে বিপক্ষ দল তুললে সবে ১০২ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ঝকমকে ব্যাটিং করে আমরা তুললাম ৩০৩, আর ওরা ২৭৩ আউট হতে ৩৮ রানে জিতলো ভিজিয়ানাগ্রামের দল।

কলকাতায় অত ভালো বোলিং করেছিলাম আমি, তবু মাদ্রাজে আমায় সামান্যমাত্র সুযোগ দেওয়া হল, বাঙ্গালোর ও কলম্বোর পরবর্তী খেলা দুটিতেও সেই একই হাল। তবু ব্যাটিং-এ ভালো করেছিলাম। হবস, সাটক্লিফ, সি. কে. এবং মহারাজকুমার চারজন যখন মাত্র ৩৭ রানে আউট, তখন খেলতে নেমে ২১ রান করেছিলাম আমি, ওই ইনিংসে সবচেয়ে বেশি। নাওমালের সঙ্গে জুড়িতে ফিল্ডিংকে ধোকা দিয়ে অনেক শর্ট রান নিয়েছিলাম আমরা, সংবাদপত্রের মন্তব্য মত দুজনের অনবদ্য সমঝোতার ফলেই তা সম্ভব হয়েছিল। হবস (৭৭) ও সাটক্লিফ (৬০) মনভোলানো ব্যাটিং করেছিলেন, কিন্তু মন মাতিয়ে ছিলেন সি. কে. দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৭ রানের মধ্যে দশটি চারের বাড়ি মেরে। দিলাওয়ার হোসেন ৪৮ নট আউট। আমি এবার ছ নম্বরে নেমে রান করেছিলাম ৫৫।

বাঙ্গালোরে একদিনের অমীমাংসিত খেলাটি আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে অন্য কারণে। কারণ এখানেই আমি প্রথম চাক্ষুষ করেছিলাম পি. এ. কানিকামকে। "দক্ষিণ ভারতীয় হবস" বলে খ্যাত ওই ব্যাটসম্যানের তখন সমগ্র দক্ষিণ ভারত জোড়া নাম, উত্তর ভারতে সি. কে.রই অনুরূপ। ১৯২৬ সালে গিলিগানের নেতৃত্বে সফররত এম সি সি-র বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় দলে বয়সের ভারে ফর্ম পড়ে গিয়েছে বলে তাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। তারও চার বছর পরে আমাদের বিরুদ্ধে তিনি ৩০-এর বেশি রান করতে পারেননি।

তবে সেকালে ও পরবর্তীকালে এখানে ওখানে তাঁর যেটুকু ব্যাটিং আমি দেখেছি, তাঁর সাবলীল স্ট্রোক প্লে বিশেষ করে অফের মার আমাকে বিশেষ মুগ্ধ করেছিল।

বাঙ্গালোরের পরেই সিংহল। আড়াই ঘণ্টার সমুদ্র যাত্রায়ই আমি অসুস্থ বোধ করেছিলাম। এখানকার মনোমোহন সবুজ মাঠে ইউরোপীয়ান দলকে আমরা এক ইনিংস ও ১৭১ রানে হারালাম। হবস মাত্র ৩০ রান করলেন, কিন্তু সাটক্লিফের ১৪৩ চাপ পড়ে গেল সি. কে-র ১১০ রানে চার ও ছয়ের ছড়াছড়িতে। প্রফেসার দেওধর ও নাইডুর জুড়িতে রান উঠলো ১৯১। দেওধরের ১০০ রানের ইনিংসটি ছিল ব্যাকরণ সম্মত ব্যাটিং-এর আদর্শস্থানীয়। দলের মোট রান চার উইকেটে ৩৬৬-এ আমার অবদান মাত্র ২৩। বোলিং তো প্রায় করিইনি।

কদিন বাদে আমার ম্যালেরিয়া ধরলো, কাজেই বাকী সফর আমার বিশ্রাম।

সাত

ভারতে টেষ্ট ক্রিকেট

বারানসী ফিরে আসবার পর কিছুদিনের মধ্যেই ইন্দোরে যাবার ডাক এল, বাবার অসুখ। বন্ধু ও সঙ্গী-সাথীদের ছেড়ে যেতে খুবই খারাপ লাগছিল, কিন্তু বাবার অসুখ না গিয়েও উপায় নেই। স্কুল থেকে সবাই শুভেচ্ছা জানিয়ে ছুটি দিল আমাকে। তখন অবশ্য ভাবিনি স্কুলের সঙ্গে এই আমার চিরবিচ্ছেদ।

মাসখানেকের মধ্যে বাবা সেরে উঠলেন। তাঁর কাছে প্রস্তাব এল আমাকে কোলাহপুর পাঠাবার দেওয়ানের বড় যুবরাজ—পরে যিনি কোহলাপুরের মহারাজ ছত্রপতি হয়েছিলেন, খেলাধূলায় তাঁর প্রভূত উৎসাহ। ইন্দোরে কার কাছে যেন লিখেছিলেন একজন তরুণ খেলোয়াড়কে সেখানে পাঠাতে।

কোহলাপুর এলাম বটে, কিন্তু বেশিদিন থাকা হলনা, বাড়ির জন্য মন কেমন করতে লাগলো। আসলে ওখানে আমার মন ভরিয়ে রাখার মত ক্রিকেট খেলার সুযোগ ছিল না। কোহলাপুরে অল্প কদিনের মধুর স্মৃতি রাজা

রাম হাইস্কুলের একটি ছাত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব। নাম তার বিজয় হাজারে। পরবর্তী কালে রণজি ট্রফিতে মধ্যভারত দলে দুজনে একসঙ্গে খেলেছি এবং তারও পরে হাজারে ভারতীয় ক্রিকেটে অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় রূপে বিকশিত হয়েছেন।

বৈচিত্র্যহীন দিন কেটে যায়। কিন্তু নতুন উত্তেজনা এল ভারতীয় ক্রিকেটের নবমর্যাদায়। ভারতীয় দল ১৯৩২ সালে ইংলাণ্ড সফর কালে একটিমাত্র সরকারি টেষ্ট খেলার ইজ্জত পেয়েছিল। ক্রিকেটের দেশে আমার দেশের খেলোয়াড়দের কৃত্যগুলি আমি মন দিয়ে অনুধাবন করতাম। ম্যাচের পর ম্যাচ যে রাজকীয় মহিমায় খেলে চলছিলেন সি, কে, নাইডু, তাতে উল্লসিত বোধ করেছি। তারপর সি. কে যখন উইজডেনে বছরের পাঁচজন ক্রিকেটারের একজন বলে স্বীকৃতি পেলেন, গর্বে বুক ভরে উঠেছিল। ভারতীয় দলে দুজন ওপেনিং বোলার নিসার ও অমর সিং-এর সার্থকতাও আমাকে কম আনন্দ দেয়নি, বৃটেনের সমালোচকেরা ওদের সারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ওপেনিং বোলার—জুড়ি হিসেবে অভিহিত করেছিলেন।

কী বিপুল আগ্রহ নিয়ে লর্ডস মাঠে একটি মাত্র টেষ্টম্যাচের খবর পড়েছি। সফরকারী দলের স্থায়ী অধিনায়ক পোরবন্দরের মহারাজ ও সহাধিনায়ক লিম্বডি-র রাজকুমার ঘনশ্যাম সিংহজী দুজনেই টেষ্ট থেকে সরে দাঁড়িয়ে, নাইডুকে দিলেন দল পরিচালনার ভার আর নাইডু সে দায়িত্বের পরিপূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করলেন। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য দুনিয়ার শীর্ষে ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট আসন কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ জার্ডিন অসামান্য দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ইংল্যাণ্ডকে জয়ী করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু সাটক্লিফ, হোমস ও উলির মত তিনজন ব্যাটসম্যান যখন মাত্র ১৯ রানে প্যাভিলিয়ানে ফেরত গিয়েছিলেন জার্ডিনের উদ্ধত মাথা একটু নিচু হয়েছিল নিশ্চয়ই। এরপর যখন জার্ডিন নিজে এসে হ্যামণ্ডের সঙ্গে যোগ দিলেন, সাত ওভারে মাত্র দুরান যোগ হয়েছিল, তার মধ্যে দুটি ক্যাচ তুলেছিলেন হ্যামণ্ড, ধরতে পারলে সে খেলার কাহিনী হত অন্যরূপ। কিন্তু ক্রিকেটে 'যদি'র স্থান নেই, ক্যাচ ফেলার মূল্য কড়ায় গণ্ডায় গুণে দিতে হয়।

সফরান্তে যখন ভারতীয় দল দেশে ফিরে এল, দিল্লীর সদ্য তৈরী ফিরোজশা কোটলা মাঠে সেই দলের সঙ্গে ভারতের অবশিষ্ট একাদশের একটি প্রদর্শনী ম্যাচের আয়োজন হল। অবশিষ্ট দলে নির্বাচিত হয়েছি জেনে আমার আনন্দের

সীমা রইল না আমি বুঝে নিলাম যে সর্বভারতীয় দ্বিতীয় দলে খেলবার উপযুক্ত বলে আমি বিবেচিত।

পুণ্যস্মৃতি ফিরোজশা কোটলার ছায়াঘেরা নতুন মাঠটি আমার খুব মনে ধরলো। উইকেট ও আউটফিল্ড মনে করিয়ে দিল ইডেন গার্ডেন মাঠের কথা। খুবই আশ্চর্যের কথা যে এতকাল পরে আজও পর্যন্ত ফিরোজশা কোটলা মাঠে কোন স্টেডিয়াম তৈরি হয়নি, টেষ্ট খেলার সময় দর্শকদের জন্য সাময়িক আসনের ব্যবস্থা করতে হয়। প্যাভিলিয়ানটিও ছোট, খেলোয়াড়দের জন্য প্রয়োজনীয় সুখসুবিধার ব্যবস্থা নেই। অবশ্য ইডেন গার্ডেনে সে ব্যবস্থা হয়নি, যদিও প্রায় সত্তর হাজার দর্শক বসবার পাকা আসন বানানো হয়ে গেছে।

সি. কে. নাইডুর দুর্দান্ত শতাধিক রান ও নিসার-অমরসিং-এর মারাত্মক বোলিং-এর জোরে সর্বভারতীয় দল জিতেছিল ম্যাচটি। তবে আমার কাছে নিজস্ব সার্থকতাই সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সেই ম্যাচে দশটি উইকেট নিয়েছিলাম আমি। ফ্র্যাঙ্ক ট্যারাণ্ট আমার প্রশংসা করে বলেছিলেন 'ভারতের পক্ষে বাঁহাতের অন্য কোনও স্লো বোলার সন্ধানের প্রয়োজন নেই। এই ফ্রাঙ্ক ট্যারাণ্ট দুর্ভাগ্যবশত কোন টেষ্ট না খেলে থাকলেও, ক্রিকেটার হিসেবে সর্বকালের মহনীয়দের মধ্যে গণ্য। মিডল সেক্স দলে পেশাদার হিসেবে তিনি হাজার রাণ ও একশ উইকেটের দ্বিমুকুট অর্জন করেছিলেন আটবার। ট্যারাণ্ট তখন ভারতেই থাকতেন এবং ক্রিকেট মহলে তাঁর দারুণ মর্যাদা। আমার ধারণা আমার সম্পর্কে ট্যারাণ্টের মন্তব্যকে মূল্য দিয়েই নির্বাচকবৃন্দ আমাকে পরবর্তী বছরে ভারতের মাটিতে টেষ্ট খেলার জন্য মনোনীত করেন।

বেশ কিছুকাল দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট অধিনায়ক বলে স্বীকৃত সেই জার্ডিনের নেতৃত্বে শক্তিশালী এম. সি. সি দল ১৯৩৩-৩৪ সালের মরশুমে ভারত সফরে এল। ভারত সফরে এটি প্রথম এম সি সি দল না হলেও ভারতের মাটিতে টেষ্ট খেলার প্রথম সফরসূচী ওদের। ১৯২৫-২৬ সালে এ. ই. আর গিলিগানের নেতৃত্বে যে এম সি সি এসেছিল তারা কোনো টেষ্ট খেলেনি।

১৯৩৩-৩৪-এর এম সি সি প্রকৃতই শক্তিশালী দল ছিল। ব্যাটিং-এ ওয়ান্টার্স বার্নেট, ভ্যালেন্টাইন, ল্যাংগ্রিজ। যে ডি. আর. জার্ডিন অস্ট্রেলিয়ার বাডি লাইন বোলিং প্রবর্তন করে ক্রিকেট জগতে ঝড় তুলেছিল এবার, তার

এবারকার দলে দুজন ফাস্ট বোলার ক্লার্ক ও নিকলস্। কিন্তু দলের সবচেয়ে দক্ষ খেলোয়াড় ছিলেন হেডলি ভেরিটি, সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্পিন বোলার, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সৈন্য হিসেবে অকালে লোকান্তরিত।

সফরকারী এম সি সি দলের সঙ্গে আমার প্রথম মোলাকাত লাহোরে, যেখানে পাঞ্জাব গভর্নরের একাদশ দলের পক্ষে আমাকে খেলতে ডাকা হয়। অনেক অনেক ওভার বল করে প্রচুর পিটুনি খাই আমি। তবু সান্ত্বনা ছিল, সবচেয়ে বেশি রাণ করেছিলেন যে দুজন, মিচেল (১৮৪) ও ল্যাংগ্রিজ ৫৭ তারা দুজনই আমার বলে আউট হয়েছিলেন। ওই ম্যাচ সম্পর্কে যা স্মরণীয় তাহল সি কে নাইডুর খেলা। এম সি সি যখন 'এস এস স্থলতান' জাহাজে চড়ে এদেশের অভিমুখে ভাসমান, নাইডু তারবার্তা পাঠিয়ে বলেছিলেন, 'আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন' সি কে নাইডুর সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় ব্যাটিং শক্তির প্রকৃত আস্বাদ পেতে তাদের, সত্যি অপেক্ষা করতে হয়েছিল এবং সেই সাক্ষাতে সি কে যখন তাঁর দোহাত্তা মার মেরে ১ ৬ রাণ করেছিলেন, এম সি সি মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছিল। বস্তুত তাদের বিরুদ্ধে ও-ই প্রথম শত রান।

ব্যাটিংএ সি কে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা পেয়েছিলেন যাঁর কাছ থেকে (৪৯ রান), তিনি তখন প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে নবাগত এক সামন্ত যুবরাজ, জন্মগত মর্যাদা ও নিজের যোগ্যতা দুই-এর সমন্বয়ে ভারতীয় খেলাধূলার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছেন তিনি। সেই পাতিয়ালার যুবরাজ উত্তরকালে মহারাজ যাদবেন্দ্র সিংরূপে দীর্ঘদিন ভারতীয় ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশানের সভাপতি ছিলেন আরো ছিলেন, অল ইণ্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান।

ব্যাটসম্যান হিসেবে তখন আমার জায়গা নিচের দিকে, আট নম্বর হিসেবে নামলাম। একটু পরেই দুদিনের খেলার প্রথম দিনের সমাপ্তি ঘোষণা হল কোন রান করার স্থযোগই পেলাম না।

তিন সপ্তাহ পরে দিল্লীতে ভাইসরয়ের একাদশের হয়ে খেলবার স্থযোগ যখন পেলাম ব্যাটিং-এ আরো এক ধাপ নেমে পেলাম। অবশ্য ওই দলে নির্বাচিত হওয়াটাই ছিল ক্রিকেটার হিসেবে স্বীকৃতি। ও দলে ছজন শ্বেতাঙ্গ ছাড়াও ভারতীয় ক্রিকেটের চার মহারথী—সি কে, উজীর আলি, অমর সিং ও নিসার সবারই যোগ্যতা টেস্ট খেলায় প্রমাণিত, কাঁচা ও কচি বলতে শুধু

আমি। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে ছিলেন ১৯৩৬ সালে ইংল্যাণ্ড সফরকারী ভারতীয় দলের ম্যানেজার হিসেবে অধিকতর পরিচিত ভাইসরয়ের একান্ত সচিব মেজর ব্রিটান-জোন্স, আরো ছিলেন ইংল্যাণ্ডের কাউন্টি প্রতিযোগিতায় ও ভারতের মাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড় অ্যালেক হোসি, টম লংফিল্ড, জর্জ অ্যাবেথ।

কিন্তু এতসব শক্তিমান খেলোয়াড়দের সমবেত দক্ষতা কোন কাজে এল না। কোন জাদুবলে ভেরিটি ওই সব ব্যাটসম্যানকে রুখে দিয়েছিলেন। তাই মাত্র ১৬০ রানে ভাইসরয়ের দল আউট হয়ে গেল। পাতিয়ালা-এম সি সি খেলায় সদ্য ১৫৬ করে আসা উজীর আলি ১২ রানে আউট, সি কের ৩০ রানই যা পাতে দেয়ার মত। আট উইকেট পড়তে আমার ডাক এল, নবম উইকেট পড়তে এসে যোগ দিলেন মহম্মদ নিসার। ঝড়ের বেগে বল করতেই নিসারের খ্যাতি, কিন্তু ঝড়েরই মত ব্যাট চালিয়েছিলেন সেদিন তিনি। দুজনে ৫০ রান যোগ করলাম। নিসার আউট হলে, আমি নট আউট ১৮।

প্রথম ইনিংসের ১৬০ তো তবু ভদ্রগোছের ছিল, দ্বিতীয় ইনিংসে এল আরো বিপর্যয়। ৬৩ রাণের ওই ইনিংসে আবার আমি ও নিসারই শেষে ঠেকাটুকু দেবার চেষ্টা করেছিলাম, সাত রাণ করে নট আউট রইলাম আমি, আমাদের দুই ইনিংসের মাঝখানে চুটিয়ে ব্যাটিং করে এম সি সি এক ইনিংস ও ২০৮ রানে জিতে গেল।

দিল্লী থেকে ইন্দোর ফিরে দেখলাম বম্বে থেকে চিঠি এসে রয়েছে, প্রথম টেস্টের জন্য দল গঠন উপলক্ষ্যে নির্বাচনী খেলায় অংশগ্রহণের আহ্বান।

বম্বের গল্প অনেক শুনেছি! কিন্তু এমন একটা উপলক্ষে সেখানে সর্বপ্রথম যাবার সুযোগ কল্পনাও করতে পারিনি কোনোদিন। যে গেট ওয়ে অব ইণ্ডিয়ার ছবি দেখেছি অনেক, তারই পিছনে ভারতের পয়লা নম্বর হোটেল তাজমহলে ঢুকে আমি একেবারে বোবা বনে গেলাম। বম্বের সব কিছুই আমার কাছে তাজ্জব ব্যাপার। তার উপর জীবনে সর্বপ্রথম সমুদ্র দর্শন।

ইন্দোরের গাঁইয়া ছেলে বম্বেতে এসেছি, মনে উচ্চাকাঙ্খা টেস্ট ক্রিকেটে খেলবার সুযোগ যদি পাই, টেস্ট ক্রিকেটের দরজা কি জীবনের সার্থকতার ফটকও খুলে দেবে! কত কি তোলপাড় চলেছে মনে। একবারও কিন্তু মনে ভাবতে পারিনি যে ওই বম্বের ক্রিকেট রসিক জনতা একদিন আমাকে প্যাভিলিয়ান থেকে ব্যাট হাতে বেরুতে দেখেই আনন্দে পাগল হয়ে তুমুল কলরোল তুলবে।

বম্বে জিমখানা মাঠে নেট প্র্যাকটিস। পরবর্তী জীবনে আমার দুজন শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট-সখা লালা অমরনাথ ও বিজয় মার্চেন্ট-এর সঙ্গে সেখানেই প্রথম সাক্ষাৎ। নির্বাচক সমিতির সদস্য কর্ণেল মিস্ত্রি ডক্টর কঙ্গো ও অ্যালেক হোসী, প্রত্যেকেই বিরাট খেলোয়াড়, ক্রিকেট সম্পর্কিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় শীর্ষস্থানীয়।

নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একটি পরীক্ষামূলক ম্যাচ খেলার জন্য দুটি দল গঠন করা হল। সেই খেলায় কৃতিত্বের জোরে সি কে নাইডু, মার্চেন্ট ও অমরনাথের নির্বাচন এক রকম নিশ্চিত। আমার মনে হল বোলিং ও ফিল্ডিং-এ আমি নির্বাচনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছি। মনে আশা জাগলো, চূড়ান্ত দলে আমারও ঠাঁই হবে।

কিন্তু হায়, খেলার দুদিন আগে যখন নাম প্রকাশ করা হল, আমার নামে তাতে নেই। নতুন টেস্ট খেলোয়াড় চারজন। লাহোরের তরুণ খেলোয়াড় অমরনাথ ইতিপূর্বেই অমৃতসরে বিদেশী দলের বিরুদ্ধে শত রান করে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি কোন্ দরের খেলোয়াড়। যাদের নির্বাচনের সম্ভাবনা ইঙ্গিত করা হয়েছিল তার মধ্যে আমার নাম ছিল। তখনকার সবচেয়ে নামকরা বাঁহাতি স্পিন বোলার আর জামশেটজীকে না নিয়ে আমাকে নেওয়াই সমীচিন বলে মন্তব্য করা হয়েছিল। আরো নাম ছিল বিজয় মার্চেন্টের। আগের সপ্তাহে এম সি সি-র বিরুদ্ধে বম্বে প্রেসিডেন্সি দলের প্রাণহীন খেলায় তার ১৯ নট আউট ও ৬৭ নট আউটই যা কিছু রস সঞ্চার করেছিল। ১৯৩২-এ দুভাই-এর জুড়ি ভেঙ্গে নতুই ভাই জুড়ি হল এবার। নাজীর আলীর বদলে এলেন অমর সিং-এর দাদা রাম সিং।

একটি সান্ত্বনা পুরস্কার মিলেছিল আমার। একেবারে বাতিল না করে দিয়ে আমাকে বলা হল বম্বেতে থেকে যেতে ও প্রথম টেষ্টের খেলা দেখতে। দল গঠন হল: সি কে নায়ুডু (অধিনায়ক), জে, জী, নাভলে, (উইকেট কীপার), উজীর আলি, এস পি জয়, এল রামজী, এস এইচ এম কোলাহ, ভি এম মার্চেন্ট, লালা অমরনাথ, আর জামশেটজী, মহম্মদ নিসার, অমর সিং ও সি এস নায়ুডু (দ্বাদশ ব্যক্তি)।

বম্বেতে থাকতে পেয়ে আমার দুটো সুবিধা হল। প্রথমত টেষ্ট দলে মনোনয়নের জন্য দরজা আমার খোলা রইল, দ্বিতীয়ত আমি এমন একটি

ইনিংস দেখলাম, তার চেয়ে ভালো ব্যাটিং জীবনে দেখেছি কিনা সন্দেহ। টেষ্টে প্রথম খেলতে নেমেই শতাধিক রান পরে তরুণ অমরনাথ যে ক্রিকেট-অমরত্ব অর্জন করেছিলেন, আজ তা ইতিহাসের বিষয় বস্তু, আর সেই শতাধিক রানও জার্ডিণ-পরিচালিত ইংল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম টেষ্ট খেলায়। অমরনাথ সত্যি অমর।

ভারতের ক্রিকেট গগনে চকিত দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করেছিলেন অমরনাথ। বস্তুতঃ পক্ষে অমরনাথের জীবনে টেষ্ট সেঞ্চুরি ওই একটিই, দুঃসাহস ও ঔদ্ধত্যে অতুলনীয়, অমন আর একটি ইনিংস খেলতে আমি তাঁকে দেখিনি। যেখানে যে কটি টেষ্ট সেঞ্চুরী আমি চাক্ষুষ করেছি, অমন রাজকীয় মহিমামণ্ডিত আর একটিও দেখিনি।

ওই একই সুবাদে আরো একটি সুযোগ মিলেছিল আমার, সি কে নাইডু যে জনতার মনোরাজ্যে অধীশ্বর তাও উপলব্ধি করেছিলাম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়। নাইডু যখন ভেরিটিকে সাবলীল ভঙ্গিতে মেরে সোজাসুজি বেড়ার ওপার পাঠালেন, রকেটের বেগে বেরিয়ে গেল বল, ৩০,০০০ দর্শক একসঙ্গে আনন্দে কলরোল তুললে। বাইশ ওভার খেলে মাত্র ২৮ রান করেছিলেন সি কে। অথচ আউট হয়ে প্যাভিলিয়ানে ফিরবার সময় যে বিপুল অভিনন্দন লাভ করেছিলেন, তা সেঞ্চুরী করিয়েও ঈর্ষার বস্তু।

প্রথম ব্যাট করে ভারতীয় দল ২১৯ রান করলো, তার মধ্যে আট জনের দু-অঙ্কের রান, উজীর আলি ৩৬, তাঁকে দুরানে মেরে সবচেয়ে বেশি রান করার কৃতিত্ব কেড়ে নিলেন অমর সিং; সূর্যকরোজ্জ্বল ঝকমকে শেষ ইনিংস। ভেরিটি, নিকোলস ও ল্যাংগ্রিজের বল খুব সাবধানে খেলতে হয়েছে, এতটুকু যথেচ্ছ মারের সুযোগ ছিল না। আমাকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছিল বল করার সময় ভেরিটির ছন্দায়িত দৌড় ও কমনীয় দেহ ভঙ্গিমা। আগাগোড়া অনবদ্য লেংপথ, নির্ভুল লক্ষ্যে চালিত, তবু বোলারের মুখ শান্ত ও সৌম্য, এতটুকু বিকৃতি নেই তাতে।

এখানেও নিসার প্রবল বেগে ব্যাট চালালেন। মাত্র ১৩ রান করা সত্ত্বেও ভারতের শ্রেষ্ঠ নম্বর ব্যাটসম্যান বলে স্বীকৃতি পেলেন তিনি।

ইংল্যাণ্ডের ব্যাটিং-এ ওয়াল্টার্স সুন্দর সূচনা করলেন, দুটি মূল্যবান পার্টনারশিপে অংশগ্রহণ করলেন জার্ডিন, ভ্যালেন্টিনকে টেষ্টে প্রথম আত্ম-প্রকাশে সেঞ্চুরি করতেও সাহায্য করলেন। বস্তুতঃ নিসার ছাড়া আর কারো

বল ওদের বিব্রত করতে পারেনি। বসে বসে নিসারের বোলিং দেখতে দেখতে আমার বিস্ময় জেগেছে অত ভারী দেহের মানুষ অত জোরে ওভারের পর ওভার একইভাবে অনবদ্য বোলিং করে যেতে পারে, এতটুকু ক্লান্তি বোধ করে না। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি বলতে পারি যে নিসার ক্রিকেটের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ পেস বোলারদের দলে।

ইংল্যাণ্ড পিটিয়ে ভারতের রানের দুগুন রান তুলে ফেললো। ২১৯ রানে পিছিয়ে থেকে আবার ব্যাট করতে নেমে ভারত যখন মাত্র ৩১ রানে দুজনকে খোয়ালো, তখন আশার ক্ষীণতম রশ্মিও কারো মনে জাগেনি।

কিন্তু সি কে নাইডু এসে অমরনাথের সঙ্গে যোগ দিতেই খেলার চেহারা একেবারে বদলে গেল। অধিনায়ক তাঁর তরুণ সেনানীকে কিছু যেন বললেন, তারপরই ভেল্কি দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে অমরনাথ চারদিকে মারতে শুরু করে দিলেন, দুঃসাহী স্কোয়ার কাট ও খুনে কভার ড্রাইভ, আরো কত কি? ক্লার্ক, নিকোলাস, ভেরিটি কারো তোয়াক্কা নেই, বল সোজা বেড়ার দিকে ছোটে, একটা তীব্র ড্রাইভ আটকাতে গিয়ে মিচেলের হাত জখম। এতবড় জনসমাগম ভারতের মাটিতে কোন ক্রিকেট ম্যাচে কোনদিন দেখা যায়নি। ইংল্যাণ্ডের বাঘা বাঘা বোলারেরা একেবারে নির্বীর্য আর জার্ডিনের ফিল্ডিং ব্যূহ ছত্রখান হতে দেখে সেই জনতা অতি আনন্দে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে থাকে।

অমরনাথের শত রান পূর্ণ হতেই জনতা পাগলা হয়ে গেল; দিশেহারা হয়ে সবাই পিচের দিকে ছুটলো ফুলের মালা হাতে নিয়ে। বিপক্ষীয় তরুণ বীরকে প্রথম অভিনন্দন জানালেন জার্ডিন; কিন্তু জনতার আচরণে তাঁর বিরক্তি প্রকাশ পেল। কারো হাতে টাকার থলে, অনেকের হাতে কোন না কোন পুরস্কার, বোম্বের এক জহুরী নিয়ে এলেন একটা সোনার কাপ। অমরনাথকে কিছু না কিছু উপহার দেবার জন্য সবাই ব্যগ্র। গুজব শুনেছি মেয়েরা আপন অলঙ্কার খুলে অমরনাথের প্রতি তা বর্ষণ করেছেন।

ভারত প্রবাসী শ্বেতাঙ্গদের কিন্তু এই আনন্দের আতিশয্য সহ্য হয়নি। ব্রিটিশ পরিচালিত একখানা পত্রিকা তো শ্লেষাত্মক মন্তব্য করলো, ভারত যদি জিতে যায় জনতা হয়তো বা তাজমহলটাই অমরনাথকে উপঢৌকন দিয়ে বসবে।

কিন্তু ভারতের জয়লাভ সুদূর পরাহত। অমরনাথ ১০২, নাইডুর সঙ্গে তৃতীয় জুড়িতে ১৩৮, তবু মোট মাত্র ১৬৯। দ্বিতীয় দিনের শেষ রান এবং

ইংল্যাণ্ডের এক ইনিংসের রান থেকে তখনো ভারত ৫০ রান পিছিয়ে। পরদিনও নাইডু অমরনাথ জুড়ি পিটিয়ে চললে, ১৯৫ মিনিটের খেলায় ২০০ রান পূর্ণ হল। কিন্তু নাইডু আউট হতে না হতেই এল বিপর্যয়, ইংল্যাণ্ডের বিজয় সূর্য মেঘ কাটিয়ে আবার উঁকি মারতে লাগলো। মাত্র ৭৯ রানের বিজয় লক্ষ্যে পৌছতে একটি মাত্র উইকেট হারালো ইংল্যাণ্ড।

আমি খেলতে না পেলেও টেষ্ট যখন ভারতে এসেছে একদিন তার মধ্যে আমার জায়গা হবেই এই আশা জেগে রইল মনে। জীবনের প্রথম টেষ্ট অভিজ্ঞতায় এইটুকু বুঝলাম যে শুধু খেলতে পারাই যথেষ্ট নয়, লড়তে জানা চাই, চাই সংগ্রামী মনোভাব, আমাদের খেলোয়াড়েরা প্রমাণ করেছে ক্রীড়াশৈলিতে তারা এতটুকু কমতি যায় না। অভিজ্ঞতার ফলে যে সংগ্রামী মনোভাব দানা বাঁধে, সেটি আমাদের অর্জন করতে হবে, এই শিক্ষা নিয়েই বম্বে ছাড়লাম।

সাত

টেষ্টের টুপি মাথায় উঠলো

কলকাতায় দ্বিতীয় টেষ্টের নির্বাচন কবে ঘোষণা করা হবে, সেই প্রত্যাশায় বুকের স্পন্দন বেড়ে চলছে কদিন ধরে। প্রথম যেদিন সংবাদপত্রে আমার নাম দেখলাম, নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারিনি। এতবড় উচ্চাকাঙ্খা পূর্ণ হবে, তাও বিশ্বাস হয়! অনেক অনেক পরিশ্রম করেছি। টেষ্টে ঠাঁই পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছি বলেই মনে বিশ্বাস জেগেছে। তবু সেই প্রাপ্য পেয়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। বয়স মোটে ১৯।২০-র নিচে ক জনই বা টেষ্ট খেলতে পেয়েছে! ভারতে তখন পর্যন্ত একজনও না। এমন কি ১৯৫৫-৫৬ সালে নিউজীল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৭ বছর বয়সের বিজয় মেহরা নির্বাচিত হওয়ার আগে পর্যন্ত সবচেয়ে কম বয়সে' টেষ্ট খেলা আরম্ভের দুর্লভ সম্মানের অধিকারী আমিই ছিলাম। আমার বন্ধু সি এম নাইডুও এবার দলে এসেছে, সেও কুড়ির নিচে, তবে আমার চেয়ে মাসকয়েকের বড়।

আরো একজন নতুন খেলোয়াড় দলে এলেন, তিনি মাদ্রাজের এম জে

গোপালন হকিতেও যাঁর ক্রিকেটের সমান খ্যাতি, টেনিসেও কিছুটা সুনাম ছিল। একটু বেশি বয়সে টেষ্ট খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন গোপালন। তাই তাঁর ভাগ্যে কলকাতার টেষ্টই প্রথম ও শেষ। ১৯৩৬ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে গোপালন ছিলেন, কিন্তু কোন টেষ্টেই তিনি নির্বাচিত হননি। কিন্তু তাঁর অনন্য মর্যাদা দুটি ভিন্ন খেলায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারায়, ১৯৩৫ সালে নিউজীল্যাণ্ড সফরকারী ভারতীয় হকি দলের সদস্য ছিলেন তিনি।

বোম্বেতে যে দল খেলেছিল তার অনেক ওলট পালট হল। উইকেট কীপার হিসেবে নাওলের বদলে এলেন দিলওয়ার হোসেন ; বাদ পড়লেন জয়, কোলাহ্, জামশেটজী ও রামজী। গত দুই টেষ্টের ইনিংস সূচনাকারী ব্যাটস-ম্যান নাভল্ রইলেন না বটে, ইংল্যাণ্ডের টেষ্টে তাঁর সহযোগী সিন্ধু প্রদেশের নাওমল আবার দলে এলেন। সব মিলিয়ে এবারকার দলটি হল তরুণ এর।

কলকাতার হাওড়া স্টেশনে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন বাংলা ও আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। আরো এসেছিলেন এক তরুণ ক্রিকেট উৎসাহী, পরবর্তীকালে সমালোচক ও বেতার ভাষ্যকার হিসেবে প্রখ্যাত শ্রীবেরি সর্বাধিকারী।

বোম্বাই-এর বীর লালা অমরনাথের কলকাতায় আসা সম্পর্কে একটি সরস গল্প পরে তাঁরই মুখে শুনেছি। গাড়ী ততক্ষণে হাওড়া স্টেশনে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু অমরনাথের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, রাতের পোশাক পরে আড়মোড়া ভাঙছেন। ওদিকে কুলিরা গাড়ির কামরায় ঢুকে মালপত্র টানাটানি শুরু করে দিয়েছে। অমরনাথ রেগে কাঁই, চেঁচিয়ে উঠলেন, ক্যা কর রহা তুমলোগ, মায় ইধার উতরানা ওয়ালা নেহি হ্যায়, হাম তো কলকাত্তা যায়েগা।

ততক্ষণে স্থানীয় ব্যক্তিরা সেখানে এসে গেছেন। কাজেই অমরনাথকে নামতে হল। পরে অমরনাথ আমাদের বলেছেন, কলকাতা কোই রেল স্টেশন নাহি, ও হামরা ক্যায়সে মালুম আয়েগা, ইস লিয়ে হাম বুদ্ধু বন গয়া।

বেরি সর্বাধিকারী সি কে, সি এস ও আমাকে সঙ্গে করে তাঁর জ্যাঠামশাই স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর বাড়ি নিয়ে গেলেন, সেখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা। বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি জীবনের বরেণ্য নায়ক দেবপ্রসাদ আমাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন এবং যে কদিন ছিলাম আমাদের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে সব সময় খবরাখবর করেছেন।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের এঁর ওঁর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা, কিন্তু এম সি

দল গ্রেট-ইস্টার্ন হোটেলে, আর ও দলের অধিনায়ক জার্ডিন ছিলেন লাট সাহেবের বাড়িতে, তাঁর অতিথি হয়ে।

খেলার আগেই আমাকে ভারতীয় বড় ক্রিকেট দলের পোশাক দেওয়া হল—নীল রঙের ব্লেজার কোট, বাঁ পকেটের ওপর দিকে ভারতীয় বড় তারা জরি দিয়ে বোনা, একটা সোয়েটার ও হলুদ-নীল ও ফিকে নীল ডোরাকাটা টাই।

সেদিন ইডেনে দাঁড়িয়ে যে নন্দন-কানন সদৃশ পরিবেশ আমাকে মুগ্ধ করেছিল, আজ আর তা নেই। অনেক বেশি দর্শকাসন তৈরির প্রয়োজনে চারপাশের বড় বড় গাছগুলি কেটে ফেলা হয়েছে। মাঠের শ্যামল শোভা হয়তো ব্যাহত হয়নি, কিন্তু সে যুগের স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত পিচের বদলে এখনকার উইকেট একেবারেই মরা। তাতে বল চলে মন্থরগতিতে। তবে আবহাওয়া ভারি বলে বল অনেকখানি সুইং করে এবং পুরানো হয়ে গেলেও তার চকচকে ভাব নষ্ট হয় না। ইডেন গার্ডেনের মাঠে কি ছিল আর কি আছে। সে সব প্রশ্ন বাদ দিয়েও ইডেন আমার প্রিয়, আমার সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক।

জানুয়ারীর ৫ তারিখ, টসে হেরে আমাদের নিয়ে ফিল্ডিং করতে মাঠে নামলেন নাইডু, ত্রিশ হাজারের জনতা সমবেত অভিনন্দন জানালো। সূচী-ভেদ্য নীরবতা, প্রত্যেকের নিজের নিঃশ্বাসের শব্দটুকুই বা কানে বাজে, তার পর নিসার ও অমর সিং ওয়াল্টার্স ও মিচেলের বিরুদ্ধে বোলিং শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরে অধিনায়ক আমার হাতে বল তুলে দিলেন, দ্রুত হৃৎস্পন্দন গোপন করে ছুটি মেডেন দিলাম। ইডেনে প্রথম আবির্ভাবে ভাগ্যদেবী আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন, সেই কথা মনে হল, মনে হল বোলার হিসেবেই দলে আমার জায়গা হয়েছে। যথাসাধ্য বল করেও সুবিধা পেলাম না। একেবারে ব্যর্থ হয়েছি এমন কথা বলবো না। ১৯ ওভারে ৪১ রান দিয়ে যে একটি মাত্র উইকেট পেয়েছিলাম সে উইকেটটি জার্ডিনের, একটি মাত্র শিকার হলেও বাঘ শিকার করেছিলাম আমি, অবশ্য ভাগ্য গুণেই তা সম্ভব হয়েছিল। খেলার টুপি পরে বল করছি হাত নামাতে গিয়ে হঠাৎ টুপিতে ঠেকে যাওয়ায় শর্ট পিচ পড়লো, এগিয়ে এসে মারলেন জার্ডিন, বল সোজা কভারে চলে গেছেই তা সি এস এর হাতের মুঠোয়। তবু প্রথম দিনে পাঁচ উইকেটে ২৫৭ থেকে পরদিন ৪০৫-এ ইংল্যাণ্ডের ইনিংসে শেষ হল। অত রান সামনে রেখে ব্যাট

করতে নামা, তবু অধিনায়ক সবাইকে সাহস দিলেন। কিন্তু মাত্র ১১ রান উঠেছে, নিকোলস-এর একটা বাম্পার দিলওয়ারের মাথায় গিয়ে লাগলো, ধরাধরি করে প্যাভিলিয়ানে আনা হল তাঁকে, কাটেনি বটে, কিন্তু ফুলে আলু বেরিয়ে গেছে। উজীর আলি যোগ দেবার অল্পক্ষণের মধ্যেই নাওমল আউট ; সি কে এবং অমরনাথ এলেন আর গেলেন। বোম্বাই-এর বীরাগণ্য অমরনাথ বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে মাঠে নেমে কোন রান করার আগে ফিরে এলেন মাথা নিচু করে। বোর্ডে মাত্র ২০ রান।

উজীর আলি ও মার্চেণ্ট জুড়ি সাহসে ভর করে ৬৩ রান যোগ করলেন, কিন্তু দিবা অবসান করা সম্ভব হল না, শেষ বলে উজীর আউট হয়ে গেলেন।

যে যাই ভেবে থাকুক, নাইডু আশা ছাড়েন নি। সেই রাত্রে মেয়রের সভাপতিত্বে কলকাতা পৌরসভা প্রদত্ত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি ভারতের একটি কাহিনী বর্ণনা করলেন। রাজকুমারের খেলার বল কুঁয়োয় পড়ে গিয়েছিল, দ্রোণাচার্য কুঁয়োর মধ্যে তীরের পর তীর মেরে তুলে আনলেন বলটি। নাইডু বললেন, আমাদের দলে অন্তত দুজন দ্রোণাচার্য আছেন, হারানো বল তুলে আনতে পারবেন তাঁরা।

পরদিন সকালে মার্চেণ্টের সঙ্গে নামলেন মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দিলওয়ার হোসেন এবং মুহূর্তে খেলার ধারা বদলে গেল। ক্লার্ক বল করতে গেলেই গ্যালারি থেকে নো-বল ধ্বনি ওঠে। শেষ পর্যন্ত আম্পায়ার বিল হিচ সত্যি তাকে নো-বল ডাকতে তবে চিৎকার থামলো। মার্চেণ্ট আউট হতেই (৫ উই ১৬৬) আমার ডাক পড়লো। আহত ও উবু হয়ে ব্যাট ধরা দিলওয়ার একদিকে আর অপর দিকে কাঁচা খেলোয়াড় আমি, জার্ডিন এবার ফিল্ডিং খুব কাছে এনে আমাদের ঘিরে ফেললেন। বিরক্ত হয়ে দিলওয়ার তেড়ে ব্যাট চালালেন, বল বোলারের মাথার ওপর দিয়ে সোজা ছ'য়ে, আর সিলি পোজিশানের ফিল্ডারদের ও ভয়ে দূরে অপসরণ। অপর দিকে আমি পায়ে ভর করে সজোরে ড্রাইভ মারলাম, উইকেটের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ানো কার্ণেইকে সরে যেতে হল। কিন্তু মধ্যাহ্ন ভোজের পরে নিকোলসের একটা বলের গতি ঠিক ঠাহর করতে না পেরে এলবি হয়ে গেলাম আমি। এরপর সি এম ও দিলাওয়ার এমন পিটিয়ে খেলা শুরু করলেন যে জার্ডিনকে ছড়িয়ে দিতে হল ফিল্ডিং। দিলাওয়ার আরো একটা ছয়, সঙ্গে সঙ্গে সি এস ও। পঞ্চাশ পার হয়ে

দিলাওয়ার আউট ; এলেন অমর সিং। এবং গেলেনও। সি এস যখন গেলেন তখনো ফলো-অন বাঁচাতে ১৮ রান বাকি। শেষ জুড়ি নিসার ও গোপালন। ১১ রান যোগ হতেই ইনিংস শেষ করলো ভারত এবং অনিবার্য ফলো-অন।

দ্বিতীয় দিনের খেলার এখনো আধ ঘণ্টাটাক বাকি, ১৫৭ রানের ঘাটতি নিয়ে দ্বিতীয়বার নামতে হবে ভারতীয় দলকে। একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম যখন আমাকে নাওমলের সঙ্গে ইনিংস সূচনা করতে বলা হল। ক্যাপ্টেন কি ভেবেছিলেন জানি না। হয়তো ভাবছিলেন যে আহত দিলাওয়ারের বিশ্রামের প্রয়োজন, দলের ব্যাটিং-জুটি ওয়াজিরকে দিন শেষে খেলতে পাঠানোর ঝুঁকি অনেক, তাছাড়া আকাশে মেঘ জমেছে।

আমি কোন রান করবার আগেই দশ উঠে গেল। চতুর্থ ওভারের খেলায় নিশানা করে স্কোয়ার লেগে চার মারলাম আমি। ১৯ মিনিটে ২০ রান উঠে যেতে জার্ডিন ক্লার্কের বদলে টাউন সেণ্ডকে বল দিতে আমি এক স্ট্রোকে তুই রান নিলাম। পরের ওভারে ভেরিটিকে লেগে মেরে চার পেলাম। শেষ ওভারে কোন রান না হওয়া সত্ত্বেও দিন শেষে ৩১ মিনিটে রান উঠলো ৩০। আমার নিজের রান সংখ্যা ১০।

পরের দিন ওই ভাবেই খেলা শুরু হল, ৫৬ মিনিটে উঠে গেল ৫০, বেশি রান নাওমলই করেছিলেন। সাত রান যোগ হতেই আমাকে চলে যেতে হল। নিকোলাসকে ফাইন লেগে গ্লান্স করেছি। বলটি ক্লার্কের হাত ফসকাতেই মেরেছি দৌড়। কিন্তু দড়ির কাছে বলটা ধরেই সঙ্গে সঙ্গে ছাড়ছে ল্যাংগ্রেজ। বাঘের তাড়া খেয়ে ছোটার মত বেগে এসে লাফিয়ে লম্বা শুয়ে পড়লাম। সেবারের মত বেঁচে গেলাম বটে। কিন্তু মনের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই সেই ওভারে বার্নেট তুনম্বর স্লিপে আমাকে ধরে ফেললেন। পরবর্তী জীবনে ওপেনিং ব্যাট হিসাবে প্রতিষ্ঠিত মুশতাক আলি জীবনের প্রথম টেস্টেই ওপেনিং-এর দায়িত্ব পালন করলো মাত্র ১৮ রান সংগ্রহ করে। কিন্তু কোন বোলারকেই অতিরিক্ত মর্যাদা সে দেয় নি। আর দিলাওয়ারের মাথার অবস্থা দেখেও ফাস্ট বোলার সম্পর্কে কোন ভয় জাগেনি তার মনে।

উজীর আলি ও অমরনাথ অল্প রানেই আউট হলেন। কলকাতাকে একেবারেই নিরাশ করলেন অমরনাথ। কিন্তু সি কে ও মার্চেন্ট টেনে নিয়ে গেলেন ৫ উইকেটে ১২০। এরপর বিপুল অভিনন্দনের মধ্যে দিলওয়ারের তৃতীয় বার আবির্ভাব। ডান হাতের বুড়ো আঙুলের নখ উড়ে গেছে

আগের দিন সারারাত রক্ত পড়েছে, কড়ে আঙুলটাও প্রায় ভাঙ্গা। তারও আগে উইকেট কীপিং-এ তর্জনীটা জখম। কুছপরোয়া নেই। হু হু করে রান উঠে চললো। দেড়ঘণ্টা মাত্র খেলা যখন বাকি, আর ইনিংস পরাজয় এড়াতে বাকি সাত রান, সি কে আউট হলেন। কিন্তু দিলাওয়ার নির্ভয়। সি এস কে সঙ্গে নিয়ে নিজেই পর পর দুওভারে দুটো চার মেরে ঘাটতি পুরিয়ে দিলেন। ভেরিটি ঘন করে ফিল্ড সাজালেন, কিন্তু তারই ভিতর দিয়ে স্কোয়ার কাটে চার মারলেন দিলাওয়ার, পরের ওভারে নিকোলসের বলকে লেগ বাউণ্ডারিতে পাঠিয়ে মাথার উপর ব্যাটটা ঘুরিয়ে দিলেন ডোণ্ট কেয়ার-এর ভঙ্গীতে। তারও পরের ওভারে ভেরিটিকে দুবার চারে পাঠালেন। সি এস, বার্নেটকে স্কোয়ার লেগে ছয় মারলেন, আর দিলাওয়ার এমন অন-ড্রাইভ করলেন, বল গিয়ে পড়লো স্কোর বোর্ডে। এরও পরে দিলাওয়ারের লেট কাট থামাতে গিয়ে দুনম্বর স্লিপে মিচেল-এর আঙুল মচকাল, প্যাভিলিয়ানে গিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে আসতে হল তাঁকে। চা-বিরতির পরবর্তী ওভারেই দিলাওয়ার পঞ্চাশ রান পরিপূর্ণ করে এমন রেকর্ড করলেন, যা আজও ভাঙেনি। কোন উইকেটকীপারই এক টেষ্টম্যাচের দুই ইনিংসেই ৫০ রাণ করতে পারেনি কখনো। ২৩৭ রানে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস যখন শেষ হল, ইংল্যাণ্ডকে জিততে হলে ৮২ রান করতে হয়, অথচ সময় মাত্র ২০ মিনিট। অতএব অনিবার্য ড্র।

মাদ্রাজের তৃতীয় এবং চূড়ান্ত টেষ্টে আমাকে রিজার্ভ হিসেবে ডাকা হল। তবু খেলতে পেলাম অসুস্থ নিসারের বদলে। ইংল্যাণ্ডের কোন পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে এম সি সি দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন হবস, তিনি আমার মত একজন কাঁচা স্পিন বোলারকে দলে নেওয়া সমর্থন করলেন। বলও অনেক করলাম, প্রথম ইনিংসেই ২৯ ওভার, অমর সিং ও অমরনাথের চেয়ে বেশি। তবে ধীরে ধীরে যেন আমার বোলার সত্তা চাপা পড়ে যাচ্ছিল। এখানেও দ্বিতীয় ইনিংসে আমাকেই ব্যাটিং সূচনা করতে দেওয়া হল। দিলাওয়ারকে অপর দিকে নিয়ে আমিই বোলারের সম্মুখীন হলাম।

গোড়া থেকেই ভাগ্যের বিড়ম্বনা। নিসার অসুস্থ। নাজির আলি বল করতে পারলেন না, কোমরে খিঁচ ধরেছে। নাওমাল দিলওয়ারের সঙ্গে প্রথম ইনিংস সূচনা করে অচিরেই ক্লার্কের বাম্পার হুককরতে প্রয়াসে ব্যর্থ হয়ে চোট খেলেন, বাঁচোখ কেটে প্রচুর রক্ত পড়লো, সারা খেলা থেকেই সরে থাকতে হল।

আক্রমণ শক্তির দুর্বলতা বুঝে সি কেই অমরসিং এর সঙ্গে প্রথম বোলিং করলেন। অমরসিং এর সেদিনের বোলিং-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন হবস্। অমরসিং ছাড়াও মারাত্মক বোলিং করলেন অমরনাথ। এক সময় অমরসিংএর হিসেব হল ১৬-৭-৩০-৪, আর চা-পানের আগে অমরনাথ দশ ওভারের মধ্যে আটটি মেডেন পেলেন, তাঁর পাঁচটিই জার্ডিনকে বল করে। শুরু ভালোই হয়েছিল। তারপর দুই উইকেটে ১৬৭র পর ১৫ রান যোগ হতেই আরও চারজন আউট। তবু জার্ডিন ও ভেরিটি দিন শেষে ২৮১ পর্যন্ত টেনে নিলেন।

জার্ডিনের আপত্তিতে আম্পায়ার ফ্রাঙ্ক ট্যারাণ্টকে সরানো হয়েছিল এ ম্যাচ থেকে। তিনি নাকি ভারতীয়দলের এলবির আবেদন বড় বেশি সমর্থন করছেন। নতুন আম্পায়ার হিগিনস আমাদের সবরকম আবেদনেই কানে তালা মেরে রইলেন, যার ফলে দুই ওপেনিং ব্যাট বেকোয়েল ও মিচেল ১১১ তুলে ফেললেন। জনতা গলা ফাটিয়ে আম্পায়ারকে দুয়ো দিয়ে গেল। এদিনের বোলিং সম্পর্কে হবস লিখলেন, দিনের খেলা যে ভাবে চলবে ভেবে নিয়েছিল লোক, অমরনাথ ও অমরসিং সে ধারনা নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তবু জার্ডিনের দৃঢ়তা ও ভেরিটির সাহসিকতায় মোট রান উঠলো ৩৫৫। ভারতীয় দলের শুরু হল অশুভ। পিচের একটা নরম অংশের সুযোগ নিয়ে ভেরিটি আমাদের ব্যাটিংকে কোন ঠাসা করে রাখলো। আমি আট নম্বরে নেমে সাতে নট আউট রইলাম। মোট রান হল ১৪৫।

উইকেটে অবস্থা খারাপ হয়ে আসছিল দেখে জার্ডিন আমাদের ফলো-অন করালেন না নিজের দলকেই আবার ব্যাট করতে নামালেন এবং উইকেটে ২৬৭ উঠতেই ডিক্লেয়ার। ভারতকে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ৫৪২ রান করতে সময় দেওয়া হল ৩৭৫ মিনিট। ওয়ান্টার্স শতরান পূর্ণ করলেন। হবস লিখলেন, বিপক্ষের রানসংখ্যা সীমিত রাখার প্রয়োজন বুঝেও ভারতীয়রা সোজা বল করেছে, নেতিবাচক বোলিং কিংবা অফ থিওরি, লেগ থিওরি কোন অখেলোয়াড়ী কুট কৌশল অবলম্বন করেনি।

দ্বিতীয় ইনিংসে আমাদের একান্ত সাবধানী খেলা। তারই মধ্যে ক্লার্ক ও ভিকোলসকে চার করে মেরে নিজের রান আটে তুললাম কিন্তু তার পরে ভেরিটির বলে আউট হয়ে গেলাম। চতুর্থ দিনের যখন শুরু তখন আমাদের দু উইকেটে ৬৫, হয় ৩৮৭ রান যোগ করা অথবা সারাদিন টিকে থাকা অন্যথায়

অনিবার্য পরাজয়। একদিকে দিলাওয়ারের সাবধানী ব্যাটিং অপর দিকে অমরসিং তুবড়ি ফাটাচ্ছেন। এমনি করে শতরান পুরে গেল কিন্তু উইকেটের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে এবং ২৫ রান যোগ হতেই আরো তিনটি উইকেট পড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত মার্চেন্ট ও পাতিয়ালার যুবরাজ ষষ্ঠ জুড়িতে দলীয় রান ২০০-য় টেনে নিয়ে গেলেন। ন রান বাদে যুবরাজ ৬০ বিদায় নিলে যোগ দিলেন অমরনাথ। কিন্তু ভারত ২০২ রানে পরাজিত হল। অপরাজিত অমরনাথের ২৬ রান দেখেই হবস তাঁর উজ্জল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। পরাজিত ভারত সম্পর্কে হবস-এর মন্তব্য ছিল: 'ক্ষয়ে যাওয়া পিচে, বিশেষ করে একদিকের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, কোন টীমই এরচেয়ে ভালো খেলতে পারতো বলে আমার মনে হয় না।'

খেলাটি কিন্তু শুরু হবার আগেই বরবাদ হবার দাখিল হয়েছিল মাদ্রাজ ক্রিকেট ক্লাবের সম্পাদক রিচমণ্ডের গোঁয়ার্তুমির ফলে। বোম্বাই ও কলকাতার প্রত্যেক খেলোয়াড়কে দুখানা করে বিনা পয়সায় টিকেট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রিচমণ্ড সাহেব তা দিতে নারাজ। আমাদের অধিনায়ক অনেক বোঝালেন, কিন্তু সাহেবের গোঁ। প্রতিবাদে খেলার আগের দিন সন্ধ্যায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অস্বীকার করলেন নাইডু, খেলোয়াড়েরাও পূর্ণ সমর্থন জানালো তাদের নেতাকে। এর ফলে সাহেবের টনক নড়লো। খেলোয়াড়দের পাশ দেওয়া হল এবং পরদিন যথা সময়ে খেলা শুরু হল।

বাড়ী ফিরে আসতেই বন্ধু ও আত্মীয়দের সহৃদয় অভিনন্দন। বাবাকে কোট-টাই-সোয়েটার দেখালাম, তিনি আনন্দে হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁর পুত্র জাতীয় ক্রিকেট দলে খেলতে পারায় তার আকাঙ্খা পূর্ণ হয়েছে, এটা প্রচ্ছন্ন গর্ববোধ তাঁর মধ্যে অনেকেই উপলব্ধি করছিলেন।

কলকাতা ও মাদ্রাজ টেষ্টের মাঝখানে এম সি সি-র বিরুদ্ধে দুটি খেলায় আমি অংশ গ্রহণ করি। জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে ইন্দোরে সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া বা মধ্যভারত দলের সঙ্গে খেলা। আমার স্বস্থানে খেলা, তা নিয়ে কোন দুশ্চিন্তাই বোধ করিনি। আমাদের দলে ইশ্তিয়াকেরও ঠাঁই হয়েছিল। এত বড় ক্রিকেট ম্যাচ বাবা বোধ হয় জীবনে দেখেননি, সেই খেলায় তাঁর দুটি ছেলে খেলছে, কী খুশি তিনি!

খেলাটি আদপেই শুরু হবে কিনা সন্দেহ জেগেছিল। প্রথমে ভূমিকম্প, তাতে কোন ক্ষতি হয়নি, তবে এমনিতেই খেলা শুরুর মুখে কাঠের গ্যালারির

এক অংশ ভেঙে পড়লো। সব সত্বেও খেলা যথা সময়েই আরম্ভ হয়েছিল।

স্থানীয় দলে দুজোড়া ভাই: আমি-ইশতিয়ার এবং সি-কে-সি-এস। অনেক সামন্তরাজের সমাবেশ, তাছাড়া ডালি কলেজের রাজকুমার ছাত্ররা প্রায় সবাই হাজির। ঠিক শুরুর মুখে জনৈক উৎসাহী এম সি সি ভক্ত তাদের এম সি সি রঙের পাপড়ী উপহার দিল। ডালি কলেজ মাঠে ঘন সবুজ রঙের ম্যাটিং-এ খেলা। জার্ডিন শিকারে গেছেন তাঁর বদলে ওয়ান্টার্স দলাধিনায়ক। ভ্যালেণ্টাইম সর্দি জ্বরে শয্যাশায়ী। টাই ম্যাচ না হলেও প্রথম ইনিংসে দুদলেরই সমান রান ১৫৭। মাত্র ৪৪ রানে ছটি উইকেট নিলেন সি কে।

আমাদের এক নম্বর ব্যাটসম্যান ইয়ার্ডে মাটি কামড়ে বল ঠেকাচ্ছেন ব্যাট তোলার নাম নেই। মধ্যাহ্ন ভোজ পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব রান ২২, পরবর্তী এক ঘণ্টায় মাত্র এক রান যোগ। মোট ২৪ রান করতে পাঁচ ঘণ্টা বিশ মিনিট। দর্শকরা এত বিরক্ত যে ক্লার্কের একটি বাম্পার তাঁর মাথায় লাগাতে জনতা ক্লার্ককেই বাহবা দিল। এম সি সি এমন বিরক্ত যে একজন খেলোয়াড়কে যখন প্রশ্ন করা হল ইয়ার্ডে কতক্ষণ খেলবে, এম সি সি খেলোয়াড়ই জবাব করলেন, পরবর্তী এম সি সি টিম ভারত সফরে এসে দেখবে ইয়ার্ডে তখনো উইকেটে রয়েছেন।

এক সপ্তাহ পরে মঈনুদ্দৌলা দলের হয়ে খেললাম হায়দ্রাবাদে, হায়দ্রাবাদ রাজ্যের বিরাট ধনী নবাব মঈনুদ্দৌলার ক্রিকেটে গভীর আগ্রহ এবং সেজন্য অর্থব্যয়েও তিনি দরাজ। সেই সুবাদেই তাঁর নামের একটি দলের বিরুদ্ধে এম সি সির খেলার আয়োজন।

বেশ শক্তিশালী দল গঠন করেছিলেন নবাব। সি কে উজীর আলি, অমর সিং, অমরনাথ, মহম্মদ হুসেন, হাদি আরও অনেকে ছিলেন সে দলে। অমর সিং আর আমি সমান ভাগে এম সি সির দশটি উইকেট ভাগ করে নিলাম, আমি মাত্র ৩৭ রান দিয়ে, অমর সিং দিলেন ৮২ রান। এ দলে সি কে নাইডুর জয় ও দলে নিকোলস এর নট আউট ৫৫ ছিলো ওই অমীমাংসিত খেলাটিতে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান।

এই আমার এম সি সির বিরুদ্ধে প্রথম আবির্ভাবের কাহিনী। তবু এক হায়দ্রাবাদ খেলায় ছাড়া কোথাও আমার মন ভরেনি। মনে সংশয়

রইল পরবর্তী বিদেশী সীরিজে খেলবার জন্য ডাক পাবতো! তবে যাত্রা অশুভ হয়নি। আমার খেলোয়াড় জীবনের ইতিহাস এই থেকে শুধু এগিয়ে চলারই কাহিনী।

নয়

অস্ট্রেলিয়ানদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ

ভারত ত্যাগের পূর্বে জার্ডিন ভবিষ্যদ্বাণী করে গেলেন, আগামী দশ বছরের মধ্যে ভারত দুনিয়ার ক্রিকেটে শীর্ষ স্থান দখল করবে। অথচ দুবছর পরে ভারতীয় দল যখন ইংলাণ্ড সফরে যাত্রা করে, একখানি প্রধান সংবাদপত্রে মন্তব্য করা হল, ইদানীং যে খেলা দেখিয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায় যে ভারতীয় দল কোন কাউণ্টি দলকেও হারাতে পারবে না।

ইদানীং খেলা বলতে ১৯৩ -৩৬ সালে ভারত সফরকারী অস্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে খেলাগুলিই বোঝানো হয়েছিল।

সাময়িক প্রাধান্য ও ব্যক্তিগত সার্থকতা সত্ত্বেও ভারতীয় ক্রিকেট ইংরেজ ক্রিকেটের পরিমাপে বামন বলেই প্রতিভাত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এদেশের খেলোয়াড়, পরিচালক প্রভৃতি সকলেরই মনে আগ্রহ পনসফোর্ড ও ব্রাডম্যানের দেশের ক্রিকেট দলকে ভারতের বিরুদ্ধে ভারতের মাটিতে খেলিয়ে দেখতে হবে। ক্রিকেটের মহান পৃষ্ঠপোষক পাতিয়ালার মহারাজ ভূপিন্দর সিং ফ্রাঙ্ক টারাণ্টের মাধ্যমে প্রয়াস চালালেন, সুফলও ফললো, ঠিক হল একটি বে-সরকারী অস্ট্রেলিয়ান দল ভারতে ব্যাপক সফর করবে এবং তার মধ্যে চারটি খেলা হবে চারদিনের "টেষ্ট"। অবশ্য বেসরকারী পর্যায়ের।

আমরা আশা করেছিলাম পনসফোর্ড, ব্রাডম্যান, ওরেইলি, গ্রিমেট ও ম্যাকেব-রা আসবে, তার বদলে কিন্তু গড়ে ৪০ বছর করে বয়স এমন একদল এল। বুড়োদের দল তার আর নেতৃত্বে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসরপ্রাপ্ত অস্ট্রেলিয়া দলের ভূতপূর্ব অধিনায়ক জ্যাক রাইডার। দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট গভর্ণর জেনারেল বলে খ্যাত ম্যাফকিনিও আছেন জেনে আমরা সবাই খুশী হলাম।

সফরকারী দলটিকে বলা হল মহামান্য পাতিয়ালা মহারাজের অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল। লাহোরে তৃতীয় "টেষ্টের" আগে পর্যন্ত ওরা কিন্তু আমাদের নিয়ে খেলাই করে গেল, ইঁদুর ছানা নিয়ে বেড়াল যেমন করে। পনেরটি খেলার পাঁচটিতে ইনিংসে জিতলো, পাঁচটিতে সাধারণ জয় লাভ। আর পাঁচটি খেলা অমীমাংসিত, তার মধ্যে তিনটি দুদিনের খেলা, একটি একদিনের। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দুটি "টেষ্টে" ওরা পরাজয় বরণ করেছিল, আর সর্বশেষ খেলায় ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজকুমার পরিচালিত মঈনুদ্দৌলা একাদশ ওদের হারিয়েছিল এক ইনিংস ও ১১৫ রানে।

টেষ্ট সীরিজ দুই-দুইয়ে অমীমাংসিত হওয়াতে আমরা প্রভূত আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলাম বটে, কিন্তু বেশ কিছুকাল আগে অবসর নেওয়া বুড়ো আর পরে যারা টেষ্ট ক্রিকেটার হিসেবে বিকাশ লাভ করতে পারেনি এমন কিছু তরুণের সমাবেশে গড়া অস্ট্রেলিয়ান দলকে কোন মতেই সে দলের প্রতিনিধি স্থানীয় বলা চলে না। অমন দলের বিরুদ্ধে আমাদের রথী' মহারথীদের ব্যর্থতায় এদেশে চরম নৈরাশ্য জাগলো। ৪৬ বছরের বৃদ্ধ রাইডার মোট ১১২৯ রান করলেন, আর ৪৪ বছর বয়সে অক্সেন হাম উইকেট পিছু ৮.২৯ রান দিয়ে ১০১ জনকে আউট করলেন। "টেষ্ট' ম্যাচে অক্সেন হাম নিলেন ১৩ উইকেট (গড়ে ৯.৮০ রান দিয়ে), পেস বোলার থেদার নিলেন ২২ উইকেট আর ব্যাটসম্যান ম্যাকার্টনি নিলেন ১৭ উইকেট (উভয়েরই গড় ১২.৫০ রান)। এমন কি রাইডার নিজে "টেষ্ট" ছাড়া অন্য ম্যাচে ৭৮ ওভার বল করে গড ২২.২ রানে ১২টি উইকেট পেলেন।

বম্বেতে প্রথম "টেষ্টে" পাতিয়ালা যুবরাজের নেতৃত্বে গঠিত ভারতীয় দলকে যুবরাজের একাদশ আখ্যা দেওয়া হল। আমি রিজার্ভ হিসেবে খেলাটি দেখলাম শুধু।

ইংলাণ্ডের বিরুদ্ধে টেষ্টে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে যারা ডবল-সেঞ্চুরী করেছেন তাঁদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি তথা অস্ট্রেলিয়ার ভূতপূর্ব অধিনায়ক জ্যাক রাইডার খাশা মানুষ, একেবারে মাই ডিয়ার লোক, সব সময় একমুখ হাসি আর ব্যাট চালনায় অসিধারী বীর যোদ্ধা। সে যুগে অবশ্য স্বাক্ষর শিকারির সংখ্যা এযুগের তুলনায় সামান্য ছিল, তবুও 'মাঠের বাইরে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে 'আর কে আছে' বলে ডেকে ডেকে হাসি মুখে অটোগ্রাফ দেওয়ার

মধ্যে যে মানসিকতা ছিল তাতে মুগ্ধ হয়েছিলাম। শেষ লোকটির পর্যন্ত ইচ্ছা পূরণ করে তবে তিনি সরেছিলেন সেখান থেকে। আর কেউ নেই তো? বলে বার দুই চীৎকার করে তবে হোটেলগামী গাড়িতে উঠেছিলেন। দৃশ্যটি আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে।

চুয়ান্ন বছর বয়সের ফ্রাঙ্ক ট্যরান্ট দলের ম্যানেজার। তাঁর থেকে পাঁচ বছরের ছোট সি জি ম্যাকার্টনি প্রবীনতম খেলোয়াড়। তবু ধ্রুপদী স্ট্রোকের জন্য প্রখ্যাত অস্ট্রেলিয়ার সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান ওই ম্যাকার্টনি-ই ছিলেন মুখ্য আকর্ষণ। আর যাঁরা দলে ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে কোনরূপ খ্যাতিবিহীন। আয়রন মঙ্গার হেন্ড্রী ও অক্সেন হাম যথাক্রমে ১৪, ১১ ও ৭টি টেস্ট খেলেছেন, আলেকজাণ্ডার নেগেল ও লাভ খেলেছেন একটি করে।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বম্বের এসপ্লানেড ময়দানে প্রথম 'টেষ্ট' খেলা ম্যাকর্টনি খেলবেন না জেনে খুবই নিরাশ হলাম। পায়ের একটি সন্ধি বন্ধনী ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে দুটি খেলার পরেই বসে গেছেন তিনি। একজন প্রত্যক্ষদর্শী যখন গভর্নর জেনারেলের ১০৬ রানের ইনিংসের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছিলেন, তাঁর খেলা না দেখতে পারার দুঃখ আরো বেশি করে বাজলো।

এই ম্যাচে দুজন নতুন খেলোয়াড় সর্বভারতীয় দলে এলেন, তারা হলেন মুবারক আলি ও আমির ইলাহী, দুজনেই বোলার। মেয়ার ও আয়রন মঙ্গারের গুগ্‌লির বিরুদ্ধে আমাদের বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানেরা একেবারেই ব্যর্থ হলেন, দুইনিংসেই ১৬৩ রানে খতম। অধিনায়ক না হয়েও দলনেতার দায়িত্ব ও মনোভাব নিয়ে ব্যাটিং করলেন সি কে নাইডু, চতুর্থ জুড়িতে অমরনাথের সঙ্গে ৬০ যোগ করলেন, পঞ্চম জুড়িতে অধিনায়ক যুবরাজের সঙ্গে ৪৮।

ব্যাটিং-এর পরে ফিল্ডিং-এ আরো কেলেঙ্কারী। অমরনাথ, অমর সিং স্নাভলি সবাই ক্যাচ ফেলতে লাগলেন। নিচের ফিল্ডিং আরো খারাপ। বোলিং-এ নিসার—অমর সিং-এর সূচনা ভালোই হল, দশ রান না উঠতে ওদের প্রথম জুড়ি ভেঙ্গে গেল। কিন্তু ফেলা ক্যাচের ফলে অনেক ফাঁড়া কাটিয়ে মরিসবি ও রাইভার তৃতীয় উইকেটে ১৩৬ যোগ করলেন। রাইভার ২০৫ মিনিটে নিজস্ব শতরান পূর্ণ করলেন। পিচের অবস্থা ক্রমশ খারাপের

দিকে, ব্যাট ঠুকলেই ধুলো উড়ছে। নিসার তার পূর্ণ সুযোগ নিলেন, মরিসবি ও রাইভার বাদে বাকি নজন মিলে মাত্র ৯৭ রান তুললো।

নিসার এলবি-র আবেদন করতেই আম্পায়ার তা অনুমোদন করলেন, লাভ ফিরে চললেন প্যাভিলিয়ানে। কিন্তু যুবরাজ তাকে ফিরিয়ে আনলেন, আম্পায়ার ভুল করেছেন এই অজুহাতে, কিন্তু আম্পায়ার কড়কে দিলেন তাকে, বললেন, আম্পায়ারকে অস্বীকার করবে, অধিনায়কের এমন অধিকার নেই।

১০৫ রান পিছিয়ে থেকেই ভারতীয় দলকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করতে হল। এবারেও প্রথম জুড়ি উজীর আলি ও ন্যাভলের ব্যর্থতা ঢাকলেন সি কে ও অমরনাথ, দিবা অবসান করে দিলেন দুজনে, রান উঠলো ৮২। তবু তৃতীয় দিনে ১৬৩তে ইনিংস শেষে, অমর সিং কিছু দোহাত্তা মেরে কিছুটা যা উদ্দীপনা জাগিয়ে ছিলেন। এবারকার দুষমন আয়রন মঙ্গার। চার দিনের খেলায় তৃতীয় দিনেই ন উইকেট জিতে গেল অস্ট্রেলিয়ান দল।

ঠিক পরের ম্যাচেই রাইভারের দল মাত্র ৮৯ রানে আউট। যুক্ত প্রদেশের (এখন উত্তর প্রদেশ) সঙ্গে দুদিনের খেলা এলাহাবাদে। যুক্তপ্রদেশ দলের মোট রান ১৩৭, সবচেয়ে বেশি ৪০ করলেন অধিনায়ক ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমার। খেলা অমীমাংসিত ভাবেই শেষ হল।

এলাহাবাদ থেকে সোজা ইন্দোর, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া দলের সঙ্গে তিন দিনের খেলা। স্থানীয় দলের অধিনায়ক আলি রাজপুরের মহারাজকুমার। এলাহাবাদের কথা স্মরণ করে আমাদের উদ্দীপিত করলেন সি কে, আমরাও অনুপ্রেরণায় অস্ট্রেলিয়ানদের কোণঠাসা করে দিলাম। আমরাই প্রথম ব্যাটিং করলাম কিন্তু সূচনা শুভ হল না। তিন নম্বর হিসেবে নেমেও আমি হঠকারিতা করে অল্পরানে আউট হয়ে গেলাম। দুনম্বর জাগডেগ মনবস্থ খেলে আটটি বাউণ্ডারি সমেত ৫৫ রান করলেন আর সি কের ৫০ রান—দুজনের জুড়িতে খেলা যারপরনাই উপভোগ্য হল। শেষের দিকে জে এন ভায়া ৩৬ রান করলেন সুন্দরভাবে খেলে। ১৮০ মিনিট ১৬টি চার মেরে। ভায়া হাজারের (৩৯) সঙ্গে অষ্টম উইকেটে ৯৩ রান যোগ করলেন। সি এস পিটিয়ে ৪২ তুললেন। নারকেলের ছোবড়ার কড়া ম্যাটিং-এ জিয়া-উল হুসেন ও সি কের মারাত্মক বোলিং করার ফলে। অস্ট্রেলিয়ানরা ফলো-অন করতে বাধ্য হল। অক্সেন হাম ৪০ রান করলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ২৭২ তুলে বেঁচে গেল

অস্ট্রেলিয়ানরা। আমি মাত্র সাত ওভার বল করেছিলাম, ১৮ রানে একটিমাত্র উইকেট জুটেছিল বরাতে।

কলকাতার দ্বিতীয় 'টেষ্ট' দলে অনেক অদল বদল হল। ভারতীয় দলের অধিনায়ক হলেন সি কে; উইকেটকীপার হিসেবে এলেন সিন্ধু প্রদেশের আব্দুল আজিজ, সেলিম দুরানীর পিতা। অমর সিং অসুস্থ তার জায়গায় ওপেনিং বোলার হলেন ইউ পির সাহাবুদ্দিন। ফাষ্ট বোলার অনেক দেখেছি, অনেক খেলেছি, অতখানি দৌড়ে এস বল ছাড়তে দেখিনি কাউকে। আমিও দলভুক্ত। আগের দিন রাতভোর বৃষ্টি হয়েছিল, পিচ অবশ্য ঢেকে রাখা হয়েছিল, তবু উইকেট বেশ নরম। তারি মধ্যে উজীর আলির সঙ্গে আমাকে ইনিংস সূচনা করতে পাঠানো হল। রাইডার টসে জিতে আমাদেরই প্রথম ব্যাট করালেন। আগের ম্যাচে বাঙলা-আসামের বিরুদ্ধে ম্যাকার্টনির ৮৬ রানের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা শুনে তাঁর খেলা দেখবার আশা পোষণ করেছি। ভিজে মাঠের খেলায় ব্যাটিং চাপা পড়ে গেল, ম্যাকার্টনিকে দেখলাম সাংঘাতিক বোলার রূপে।

কিছুক্ষণ বাদেই মেঘের ফাঁকে সূর্যদেব উঁকি মারলেন, ভিজে পিচে টান ধরলো, রাইডার দুই স্লো বোলার ম্যাকার্টনি ও অক্সেনহামকে কাজে লাগালেন। সাত উইকেটে ৪৮ রানের পরে চার বলে বাকি তিনটি উইকেট নিলেন অক্সেন হাম। ৪৮ই সব শেষ। প্রথম জুড়িতেই অর্ধেক রান উঠেছিল, উজীর আলি ২০ ও আমি ১৩, বাকী সবাই মিলে ১৫, মধ্যাহ্ন ভোজ বিরতির এখনো ১২ মিনিট বাকি।

অস্ট্রেলিয়া দলের ব্যাটিং শুরু হতে নিসার তীব্র বিষ ঢেলে বল ছাড়তে লাগলেন। অমর সিং তখন দর্শকাসনে বসে। আমার খুব জ্বর এসে গেছে, দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, সারা গা টনটন করছে। মাঠ ছেড়ে চলে গেলাম, দ্বাদশ ব্যক্তি আমির ইলাহি বদলি ফিল্ডিং করতে গেলেন। নরম পিচে স্লো বোলার হিসেবে আমি দলের কাজে লাগতে না পেরে আরো মন মরা হয়ে গেলাম। ৬ উইকেটে ওদের ৬২ রান উঠে গেল। একদিকে বাঁকা হিলানি খাঁ রান আটকে রেখেছেন, অন্যদিকে নিসার রান দিয়েও উইকেট পাচ্ছেন। জ্বর গায়েও ঘরে শুয়ে থাকতে পারলাম না। বাইরে বসে খেলা দেখতে লাগলাম। উইকেট পড়তে লাগলো, আট উইকেটে ৯২।

অস্ট্রেলিয়ানদের শতরান পুরবে কিনা জল্পনা কল্পনা চলছে গুগুলি বোলার

মেয়ার লেগ স্পিনার বাঁকা হিলনির বলে এল বি হলেন, শেষ ব্যাটসম্যান লেদার যখন এলিসের সঙ্গে যোগ দিলেন, তখনও শ পুরতে এক রান বাকি।

বল হাতে নিসার একমাত্র ভরসা, শতরান পুরতে যদি না দেওয়া যায়, ৪৮-এর শোধ কিছুটা ওঠে। বিশহাজার দর্শকের আকাশ ফাটানো চীৎকারের মধ্যে নিসার বল ছাড়লেন, বল তো নয় বজ্র, এক চাপড়া কাদা তুলে নিয়ে সে বল ধাক্কা মেরে স্টাম্প শুইয়ে দিল।

ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হতে পরদিন। লেদার যে দিকে বল ফেলছে কাদা শুকিয়ে উইকেটের এক অংশ এবড়ো খেবড়ো হয়ে গেছে, ফলে বলটা পড়ে এদিক ওদিক বিশ্রী রকম লাফিয়ে উঠছে। অমর নাথ মাত্র তিন রান করেছেন, লেদারের সোজা বল একটা পুল করতে যাবেন, মাথা পর্যন্ত লাফিয়ে উঠে চড়াক করে চোয়ালে লাগলো বলটা। রুমালে মুখটা চেপে ধরে মাঠ ছেড়ে যেতে হল তাঁকে। যুবরাজের ৩২ রানের জোরে মোট রান সংখ্যা যখন ৯০, তখন ছ নম্বর উইকেট পড়তে আমার পালা এল, সঙ্গী অমরনাথ জখমি ফোলা চোয়াল নিয়েই আবার নেমেছেন। লেদারের একটা বলে চার মেরেই পরের বলে এলবি হলাম আমি। অমরনাথ রয়ে গেলেন, অমিত বিক্রমে খেলে আব্দুল আজিজকে সঙ্গে নিয়ে রান তুলে চললেন। ৯১ রানে যখন আজিজ বিদায়, একমাত্র সাহাবুদ্দীন বাকি। শত রান পূর্ণ হবে এমন কি অস্ট্রেলিয়ানদের প্রথম ইনিংসের সমান ৯৯ হবে তাও বাতুলের কল্পনা মনে হল। কিন্তু অমরনাথ, তেজস্বী অমরনাথ, দুঃসাহসী অমরনাথ। কী খেলাই খেললেন। রাইডারের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করে প্রতি ওভারের শেষে রান নিতে থাকলেন, আর সে কি দৌড়, সাহাবুদ্দীনও তেমনি। হরিণের মত দ্রুত কিন্তু বল কোথায় কিভাবে কার কাছে যাচ্ছে সেদিকেও সাবধানী দৃষ্টি। একবার তো শ্লিপ ফিল্ডারদের কাছে বল পৌছবার আগেই রান নেওয়া শেষ। যখন লেদারের বলে বোল্ড হলেন অমরনাথ দশম উইকেটে ৩৩ রান যোগ হয়েছে, তার মধ্যে সাহাবুদ্দীনের মাত্র চার। বোম্বাইর শোনা কাহিনী; অমরনাথ কলকাতার দর্শক হৃদয়ে বীরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন সেদিন। যেভাবে তিনি ম্যকার্টনির একটা বল অফ্-স্টাম্পের বাইরে থেকে টেনে এনে লেগ বাউণ্ডারিতে পাঠিয়ে ছিলেন, সে মার আমি কোনদিন ভুলবো না।

ভারতীয় দলের রান হল ১২৭। লেদার একদফায় ৪—২ ওভারে ১৯ রান দিয়ে চারটি উইকেট নিয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ান দল মাত্র দুই উইকেটেই

জয়ের নিশানা ৭৫ রান পেরিয়ে আরও পাঁচ রান ফাউ সংগ্রহ করে নিল।

চারদিনের খেলা মাত্র দুদিনে শেষ। কর্তৃপক্ষ দর্শকদের কথা ভাবলেন। প্রস্তাবটা এল ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমারের কাছ থেকে। আয়োজিত হল তার ভারতীয় একাদশ ও ফ্র্যাঙ্ক ট্যারেণ্টের অস্ট্রেলিয়ান একাদশের মধ্যে দুদিনের প্রদর্শনী খেলা। আমি তখন জ্বোরো শরীরে আরামে বিশ্রাম নিচ্ছি, খেলা দেখিনি। শুনেছি খেলাটি দর্শকদের উপভোগ্যই হয়েছিল।

পরবর্তী ইংল্যাণ্ড সফরের জন্য মনোনীত অধিনায়ক পতৌদীর নবাব (মনসুর আলির পিতা) কলকাতা 'টেষ্টে' খেলার কথা ছিল, কিন্তু তাঁর ডাক্তার বাদ সাধলেন। তবু আশা ছিল লাহোরের তৃতীয় 'টেষ্ট' তিনি খেলবেন। কিন্তু দলের নাম যখন ঘোষণা করা হল দেখা গেল পতৌদী তাতে নেই। উজীর আলি অধিনায়ক, সি কে নাইডুও দলভুক্ত। বোম্বাই-এর চতুর্দ্দলীয় খেলায় অজিত মার্চেণ্ট কলকাতার মত এখানেও অনুপস্থিত। আমি অসুস্থ, অমর সিংও সুস্থ নন। আগেই প্রমাণ হয়েছে উইকেট কীপার হিসেবে নাভলের দিন গত, বিকল্প সন্ধানে আব্দুল আজিজকে ডাকা হয়েছিল, তাঁকে দিয়ে কাজ হয়নি। বোম্বাই-এর তরুণ উইকেট কীপার তথা ওপেনিং ব্যাট হিণ্ডেল-কারকে এবারেও ডাকা হল না। তঁরে বদলে আনা হল কে আর মেহেরোমজীকে। অবস্থা সত্যি শোচনীয়।

কিন্তু আনন্দের সীমা পরিসীমা রইল না যখন জানা গেল যে লাহোরের চতুর্থ 'টেষ্টে' উজীর আলির দল অস্ট্রেলিয়ান দলকে সর্বপ্রথম পরাজয় বরণে বাধ্য করেছে। অথচ ঠিক আগের ম্যাচে অমৃতসহরে দক্ষিণ পাঞ্জাবকে ওরা ইনিংসে হারিয়েছিল।

ইন্দোরে বসে বসে খবরগুলি সাগ্রহে অনুধাবন করছিলাম। অবশেষে নিজের ফর্ম ফিরে পেয়ে উজীর আলি দুই ইনিংসেই দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রান করেছেন এবং জোড়াতালি দেওয়া দলকেও প্রাণপণে খেলতে অনুপ্রাণিত করেছেন। অস্ট্রেলিযানরা অক্সেন হামকে পায়নি পুরো ম্যাচ, খেলার মধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অথচ প্রতিটি খেলায়ই তাঁর বলে থরহরি কম্প। তাই নিয়ে রসিকতা প্রচলিত হল অক্সেন (ষাঁড়) এবং হাম (শূকর মাংস) —এই দুই-এর সমন্বয় যাঁর নামে, হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের খেলোয়াড়েরাই তাঁকে এড়িয়ে চলেন। সেকেন্দ্রাবাদে মঈনুদ্দৌলা একাদশের হাতে সফরকারী দলের শোচনীয়তম পরাজয়—এক ইনিংস ও ১১৫ রানে।

পরবর্তী খেলায় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিরুদ্ধে এক উইকেটে জিতলেও মাদ্রাজের চতুর্থ তথা চূড়ান্ত 'টেষ্টে' ভারতীয় দল দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়েই মাঠে নামলো। এবারে সি কে-কে দলে নেওয়া হয়নি, ঘোষণা করা হল বিনা নোটিশে লাহোরের খেলায় অনুপস্থিত থাকার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। অমর সিং সুস্থ, আমিও দলে ফিরে এলাম। কিন্তু অদ্ভুত কাণ্ড লাহোরের বিজয়ী দলের মাত্র তিন জনকে রাখা হল।

বাংলার কার্তিক বসু প্রথম ব্যাটিং করলেন, অপর প্রান্তে রইলাম আমি। প্রথম ওভারে রান নেই। পরবর্তী ওভারে ফাষ্ট বোলার লেদারকে পরপর দুখানা লেগ-গ্লাইড করে দুই দুই চার রান সংগ্রহ করলাম, তার পরে কাট মেরে বল সীমানা পার করে দিলাম। কার্তিক বসু অল্পেই আউট হতে অমরনাথ এলেন। বোলারের অনুকূল চিপক পিচে ম্যাকার্টনিকে বল দিতে দেরি করলেন না রাইডার। অমরনাথ তাঁকে হুক মেরে প্রথম বাউণ্ডারী করলেও, পরবর্তী দশ ওভার মেডেন খেললেন এবং পরবর্তী চার মারলেন এক ঘণ্টা বাদে। চিরদিনের চঞ্চল ব্যাটসম্যান আমি অসঙ্কোচে লেগ-গ্লাইড করে ও দুপাশে ড্রাইভ করে অনেকখানি এগিয়ে গেলাম। কিন্তু একান্ত দুর্ভাগ্য রান আউট হতে হল। অমরনাথ মেয়ারকে কাট মারলেন, মরিসবি ক্ষিপ্রগতিতে দৌড়ে দড়ির কাছাকাছি বলটি ধরে ফেললেন। তিনরান ততক্ষণে হয়ে গেছে, আমি চতুর্থ রান নিতে দৌড়ে ওদিকে চলে গেছি কিন্তু অমরনাথ নড়েন নি। তবু এবারকার ৪৩ সর্ব ভারতীয় দলের হয়ে এযাবৎ আমার সর্বোচ্চ রান।

অমর সিং এলেন। মারে মারে অন্ধকার দেখালেন ওদের। প্রথম বলেই ড্রাইভ মেরে মেয়ারকে চারে পাঠালেন, পরেরটাও চার, এবার হুক করে। মেয়ারের পরবর্তী ওভারে দুটো চার এবং একটা ছয়—বল গিয়ে পড়লো প্রেস তাঁবু পেরিয়ে। পরের মারটাও উঁচু ছিল, একটু খাটো হয়ে দড়ির এপারেই পড়লো, কেউ ধরবার চেষ্টা না করায় অমর সিং বেঁচে গেলেন এবং কিছুটা সাবধানও হলেন। তা সত্ত্বেও মেয়ারকে পরের ওভারে একবার চারে ও একবার ছয়ে পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ারের বল করা বন্ধ করে দিলেন রাইডার। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় দু উইকেটে ১২৮ রাণের সঙ্গে মাত্র চার যোগ হতেই অমর সিং ও অমর নাথ দুজনেই আউট। এরপর শুধু উজীর আলি ও হাদীই যা দু সংখ্যার রাণ করলেন—তাও কুড়ির

নিচে, ফলে ইনিংসের মোট রাণ উঠলো ১৮৯।

নিসার ও অমর সিং এর আক্রমণে অস্ট্রেলিয়ানরা গোড়া থেকেই বেসামাল, দিনের শেষে রান হল ৬৪, কিন্তু চারটি উইকেট এরি মধ্যে পড়ে গেছে।

পরদিন সকালে মুষলধারে বৃষ্টি। মাঠের জল বালতি ভরে সরিয়ে, কম্বল ও চট দিয়ে চিপে চিপে উইকেট ঠিক করার চেষ্টা হল, কিন্তু দুপুরের আগে খেলা শুরু হল না। কড়া সূর্য উঠতেই পিচে চড় চড় করে টান ধরলো। তারি মধ্যে বে-পরোয়া খেলে শেষে ছ উইকেটের বদলে ৯৮ রাণ যোগ করলো অস্ট্রেলিয়ানরা। এর মধ্যে এতদিনের আশা পুরিয়ে নিলাম ম্যাকার্টণির সুষমা মণ্ডিত ব্যাটিং দেখে। তাঁর ৪৮ই দলের সবচেয়ে বেশী, পরবর্তী রান ব্রায়ান্টের ২৬, রাইডারের উদ্দেশ্য ছিল যত তাড়াতাড়ি ইনিংস শেষ করা যায়, তাহলেই ওই ভয়াবহ পিচে ভারতীয়দের আবার ব্যাট করতে নামানো যাবে। অবশ্য তাড়াতাড়ি ইনিংস শেষ করার মধ্যে দ্রুত রান তোলারও প্রয়াস ছিল। বল করবার জন্য দৌড়ানো বন্ধ করেছেন নিসার, বোলিং ক্রীজে ছড়ানো কাঠের গুঁড়োর ওপর দিয়ে জোর কদমে হেঁটে এসে বল ছাড়ছেন। লাভের মাঝে পান্টা ক্যাচ পেয়েও নিচু বল ধরতে মুখ থুবড়ে পড়ার ভয়ে ছেড়ে দিলেন। নিসার বল করছেন, তবু উইকেট কীপার তিরুভেঙ্কটাচারি স্টাম্প ঘেঁষে বসে আছেন। লেদার ও মেয়ার জোরে দৌড়ে ও প্রাণ খোলা শট মেরে ২৬ মিনিটে ৩২ রান যোগ করলেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে যখন সামান্য রানেই কার্তিক বোস ও আমি ফেরত গেলাম, মনে হল যে প্রথম ইনিংসে ২৭ রানের নামে মাত্র এগিয়ে থাকা বিফলেই গেল। দ্রুত উইকেট হারিয়ে চা পানের সময় আমাদের রান হল চার উইকেটে ৫১, তার পরের খেলায় মিছিল করে প্যাভিলিয়ানে ফেরত যাওয়া। শেষের দিকে নেমে নিসার মাকার্টনির এক ওভারে চার, দুই ও দুই নিয়ে পরের ওভারেই আউট হলেন। হাদী দুই ইনিংসেই ১৯ রানে অপরাজিত।

মাত্র ১৪১ রান হলেই অস্ট্রেলিয়ানরা জিততে পারে। কিন্তু ৩৬ রানে ছটি উইকেট নিয়ে নিসার বাদ সাধলেন। পঞ্চম উইকেট পড়লো ৮৪ রানে, পরের পাঁচজনে যোগ হল মাত্র ২১। শেষের তিনটি উইকেট নিয়ে নিসার

দিলেন মাত্র পাঁচ রান; উজীর আলির ভারতীয় একাদশ ৩৩ রানে জিতলো। এ খেলাতে নিসার প্রধান বীর, খাসা ব্যাটিং, ৯৭ রান ১২টি উইকেট। অমর সিং পেলেন সাতটি উইকেট, রান দিলেন ১০৮।

অস্ট্রেলিয়ার বুড়োদের সঙ্গে বেসরকারী রাবার সমান সমান হল, যদিচ প্রথম দিকে আমরা অস্ট্রেলিয়া নামের ভয়েই কাবু হয়ে হেরে মরেছিলাম। শেষের দুটো 'টেষ্টের' জয়লাভ নিয়ে অতি উল্লাস আমার কাছে অযৌক্তিক মনে হয়েছে। মাত্র ১৩ সপ্তাহে ২৪টি ম্যাচ খেলে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো, অসুস্থও হয়েছিল কেউ কেউ। একটি ম্যাচে স্থানীয় খেলোয়াড় ধার করে খেলতে হয়েছিল ওদের। মাদ্রাজের 'টেষ্টে' ওরা জো ডেভিসকে খেলাতে বাধ্য হয়েছিল, ডেভিস খেলোয়াড় ছিলেন না, মালপত্র তদারকীর জন্য আনা হয়েছিল তাঁকে। তাছাড়া এ খেলায় অসুস্থ অক্সেনহাম, অনুপস্থিত, যে অক্সেনহামের ভয়ে সবাই কেঁপে কেঁপে আউট হয়ে গেছে।

দশ

কলঙ্করেখা

অস্ট্রেলিয়ানদের সফরের ফলে নতুন নতুন যোগ্য খেলোয়াড়ের সন্ধান মিলেছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতের ক্রিকেট পরিচালনার অনেক নোংরামিও বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। ১৯৩২ সালে ভারতীয় দলের ইংল্যাণ্ড সফরে কোন বিরোধের কথা আমি কখোনো শুনিনি, ক্রিকেট পরিচালকমণ্ডলীর উচ্চতম পর্যায়ের বাইরে আর কেউ শুনেছেন কিনা তাতেও আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু আগামী সফরের জন্য অধিনায়ক নির্বাচন প্রসঙ্গে যে বাদানুবাদ শুরু হল, সেই প্রসঙ্গে ভারতের এক প্রধান দৈনিক পত্রে লেখা হল যে ১৯৩২ সালে ২৪ জুন লর্ডস মাঠে ভারত-ইংল্যাণ্ড টেষ্ট ম্যাচের ঠিক আগে দলের মধ্যে অন্তর্বিরোধ প্রকট হয়েছিল। পত্রিকায় চাঞ্চল্যকর এক তথ্য উদ্ঘাটিত হল। খেলার আগের রাতে কয়েকজন নির্বাচিত খেলোয়াড় স্থায়ী অধিনায়কের ঘুম ভাঙিয়ে তাঁকে নাকি

জানিয়েছিলেন যে টেষ্ট ম্যাচে সি কে নাইডুর অধিনায়কতায় খেলতে তাঁরা নারাজ। পত্রিকায় আরো বলা হল যে অনেক বুঝিয়ে তবে তাঁদের রাজি করানো গিয়েছিল।

১৯৩২-র ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অস্ট্রেলিয়ানদের বিরুদ্ধে বোম্বাই-এর প্রথম টেষ্টে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব ও সম্মান পাতিয়ালা যুবরাজকে দেওয়া হয়েছিল কিনা, আমি তা বলতে পারবো না। কিন্তু যে ব্যবস্থায় একপাল সাধারণ মানুষের রাখাল কোন রাজা বা রাজকুমারকেই দিতে হবে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল সর্বত্র। ক্রিকেটের কূটনীতির বাইরে দেশের সর্বত্র অগনিত নাইডুভক্তের মনে জেগেছে তিক্ততা, একি কাণ্ড! দুসিরিজের ভারতীয় অধিনায়ককে কিনা আজ খেলতে হবে এক ছোকরার অধীনে, বয়স যার বিশ পেরোয়নি! যুবরাজের তুলনায় দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়েরা সবাই প্রবীনতর, একটা 'কচি ছেলের' অধিনায়কত্বে খেলতে তাদের কি মনের অবস্থা হয়েছিল, আমি হলফ করে বলতে পারবো না। কিন্তু যুবরাজের নির্বাচনের প্রতিবাদে নির্বাচক সমিতির প্রধানতম সদস্য ডক্টর এইচ.ডি.কাঙ্গা পদত্যাগ করাতে অন্তর্বিরোধ প্রবলতম আকার ধারণ করলো। কড়া মন্তব্য করলেন ডক্টর কাঙ্গা, তিনি বললেন: 'নির্বাচক সমিতির প্রধান দায়িত্ব হল সারা দেশ থেকে সম্ভাবনা সম্পন্ন তরুন খেলোয়াড় খুঁজে নিয়ে তাদের ভিতর থেকে ইংলণ্ডগামী ভারতীয় দল মনোনীত করা। অন্তত তিনজন আছেন যাঁদের দলভুক্ত হবার পূর্ণ যোগ্যতা রয়েছে, এমন কি অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতাও আছে তাঁদের। তা সত্বেও কেন যে জাতীয় দলে খেলবার যোগ্যতা যার এখনো প্রশ্নাতীত নয় এমন এক যুবরাজকে অস্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে বোম্বাই-এর খেলায় ভারতীয় দলের অধিনায়ক করা হল! নির্বাচকবৃন্দ কি সত্যি যোগ্যতার বিচারে ওই যুবরাজকে অধিনায়ক হিসেবে যাচাই করার সুযোগ গ্রহণ করেছেন? যদি বুঝতাম ওঁরা স্বাধীনভাবে নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশ করেছেন, তাহলে আমি পদত্যাগের চরম পন্থাটি গ্রহন করতাম না। আমার বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে নির্বাচকবৃন্দ ক্রিকেট-যোগ্যতার বহির্ভূত অন্য কিছুর বিচারে প্রভাবিত হয়েছেন'।

'কেবল জন্মগত যোগ্যতার বিচারে একজন অধিনায়ক চাপিয়ে দেওয়ার

এটিই প্রথম নিদর্শন নয়। ক্রিকেটের স্বার্থ অবহিত হয়ে আমি ওই বিচারের সঙ্গে একমত হতে পারিনা। ক্রিকেট ভালবাসি, তার সেবা করতে চাই, ও তার উন্নয়নে অংশ গ্রহণ করতে চাই বলেই নিজের যথেষ্ট অসুবিধা করেও নির্বাচক সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হতে রাজি হয়েছিলাম। যখন দেখলাম যে আমার সহযোগিরা ক্রিকেটের স্বার্থের বাইরেকার বিচারের দ্বারা চালিত হয়েছেন, আমি একমাত্র খোলা পথ গ্রহণ করে পদত্যাগ করলাম।'

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হলনা, আরো অনেকদূর গড়ালো। ডক্টর কাঙ্গার সমর্থনে বম্বে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েসান রুখে দাঁড়ালো। অ্যাসো-সিয়েসানের ম্যানেজিং কমিটি একযোগে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো: ডক্টর যে ক্রিকেট বহির্ভূত বিষয়ের বিচারে অধিনায়ক নির্বাচনের প্রতিবাদে নির্বাচক সমিতি থেকে পদত্যাগ করেছেন, তাঁর কৃত্য সম্পূর্ণ অনুমোদন করা হল। তাছাড়াও সমগ্র নির্বাচক সমিতির বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপন করা হল।

বম্বে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েসান আরো সিদ্ধান্ত নিল যে ইংল্যাণ্ড সফরের জন্য মনোনীত অধিনায়ক পতৌদীর নবাবের অস্বাস্থ্য বিধায় ভারতের ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে সফরকারী দলে যাঁদের নির্বাচন নিঃসন্দেহ এমন দুজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে সহাধিনায়ক মনোনীত করা হোক।

অ্যাসেসিয়েসানে ম্যানেজিং কমিটির অধিবেশন থেকে কণ্ট্রোল বোর্ডে তাদের প্রতিনিধিকে নির্দেশ দেওয়া হল, তিনি যেন বোর্ডের পরবর্তী সভায় উক্ত প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করেন।

কারণ যাই হোক না কেন, অস্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে কলকাতার দ্বিতীয় 'টেষ্টের' জন্য সি.কে নাইডুকে ভারতীয় দলের অধিনায়ক করা হল। কিন্তু কলকাতায় পৌছে খেলার আগেই আঁচ পেলাম যে সি.কে-কে ডোবাবার চেষ্টা চলছে। সি.কে. ও আমার সঙ্গে একই বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা ছিল এমন একজন তরুণ খেলোয়াড়কে ও আমাকে খেলা শুরুর আগের দিন এক সান্ধ্য মজলিসে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। নাইডুকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল কিনা জানিনা, তবে তিনি মজলিশে অনুপস্থিত ছিলেন, কিন্তু আমাদের দুজনকে অনুমতি দিয়েছিলেন। পরদিন খেলার মাঠে

আমাদের শারীরিক পটুতা যাতে ব্যাহত হয়, মজলিশে এমন সব ব্যবস্থা ছিল। মজলিশের ব্যবস্থাপনায় ওই ধরনের ব্যবস্থা ভারতীয় দলকে ডুবিয়ে দেবার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য নিয়েই করা হয়েছিল কিনা বলতে পারবো না। কিন্তু জনকয়েক বিশিষ্ট ব্যক্তি মজলিশে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে কিছু কিছু লোক ভারতের ক্রিকেট অধিনায়ক হিসেবে সি.কে নাইডুকে সায়েস্তা করবার জন্ত উঠে পড়ে লেগেছেন। পরবর্তী ঘটনা সি কে বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, অবশ্য লুঠের বখরা নিয়েই সে ঝগড়া।

পরদিন অমর সিং জানালেন তিনি অসুস্থ। ডাক্তার তাঁকে সুস্থ বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও তিনি খেলতে নামলেন না। লাহোরের 'টেষ্টে' সি,কে -কে অধিনায়ক পদ থেকে সরিয়ে শাস্তি স্বরূপ মাদ্রাজ 'টেষ্টে' তাঁকে যে খেলতেই ডাকা হয়নি সে কাহিনী আমি আগেই বর্ণনা করেছি।

ইতিমধ্যে আঞ্চলিক মনোভাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। মাদ্রাজ ক্রিকেট এসোসিয়েসান থেকে দাবী করা হল যে চতুর্থ 'টেষ্টে' তিনজন দক্ষিণ ভারতীয়কে দলভুক্ত করতে হবে। তাঁরা হলেন এ. জি. রামসিং, এম. জে গোপালন ও তিরু ভেঙ্কটাচারী। ওই তিনজন খেলোয়াড়ের যোগ্যতা নিয়ে আমি কোন প্রশ্ন তুলছি না, সংশ্লিষ্ট কোন প্রাদেশিক অ্যাসো-সিয়েশানের পক্ষে নির্বাচন প্রসঙ্গে বক্তব্য পেশ করার অধিকারও আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সেই বক্তব্য যদি একান্ত ভাবে নিজস্ব অঞ্চলের খেলোয়াড় সম্পর্কেই হয়, এমন বক্তব্য রাখা নিশ্চয়ই অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচ্য। কৃতী-অল-রাউণ্ডার রাম সিং দল ভুক্ত হলেন। টেষ্ট পর্যায়ের তিন চারজন উইকেট কীপারকে অগ্রাহ্য করে তিরু ভেঙ্কটাচারীকেও নেওয়া হল। গোপালন টেষ্টে বাদ পড়লেও ইংল্যাণ্ড সফরের জন্ত তাঁর নির্বাচনে সর্বত্র বিস্ময়ের সঞ্চার হল।

জ্যাক রাইডারের দলের বিরুদ্ধে খেলাগুলিকে যদি ইংল্যাণ্ডগামী দলের খেলোয়াড় নির্বাচনের জন্তই মুখ্যত বিবেচনা হয়ে থাকে, তবে চারটি টেষ্টে ২৮ জনকে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা অযৌক্তিক বলে নাও গণ্য হতে পারে। কিন্তু অধিনায়ক নির্বাচন নিয়ে যে বাদানুবাদ চলেছিল, তাতে বোঝা গেল যে জন্মগত আভিজাত্যকে প্রধান যোগ্যতা বলে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চলছে। কলকাতার প্রধান সংবাদ পত্র ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজ কুমারের পক্ষে খোলাখুলি

ওকালতি শুরু করে দিল। অথচ মহারাজকুমার নিজেই নির্বাচক সমিতির অন্যতম সদস্য। অস্ট্রেলিয়ানদের বিরুদ্ধে মঈনুদ্দৌলা একাদশের জয় লাভ প্রসঙ্গে বলা হল,' মহারাজ কুমার ছাড়া আর কোন অধিনায়কই খেলোয়াড়দের একাগ্র ও ঐকান্তিক সহযোগিতা আদায় করতে পারেননি।' কিন্তু মাত্র তিনজন প্রতিষ্ঠিত ও খেলোয়াড় ও আজে বাজে নিয়ে গড়া দলের অধিনায়ক উজীর আলি দুটি 'টেষ্টে' জয়লাভের অপরিসীম ব্যক্তিত্ব দেখিয়েছিলেন সে কথার উল্লেখও কেউ করলো না। উজীর আলী না ছিলেন নবাবজাদা না মহারাজ কুমার, সি.কে নাইডুরই মত 'মামুলি আদমি'। নাইডুকে বাতিল করার আগে তাঁর বিরুদ্ধে অন্তত অভিযোগ আনা হয়েছিল, কিন্তু উজীর আলিকে নিঃশব্দে কোতল করা হল।

ইংল্যাণ্ড সফর শুরু হবার অনেক মাস আগেই পতৌদীর নবাবকে অধিনায়ক মনোনয়ন করা হয়েছিল। এমন কি অস্ট্রেলিয়ানদের বিরুদ্ধে বেসরকারী টেস্টগুলিতেও তারই অধিনায়কত্ব করার কথা। ইতিমধ্যে ভারতে একটি খেলায়ও তিনি অংশগ্রহণ না করেও অধিনায়ক পদে ইস্তফা দিলেন না তিনি। সংবাদ পত্রে যখন আলোড়ন উঠ্‌লো যে ভারতীয় ক্রিকেট সম্পর্কে কোন আগ্রহ নেই নবাবের, ভারতীয় খেলোয়াড়দের সম্পর্কে কিছু জানেনও না তিনি এরপর তিনি ইংল্যাণ্ড সফরে দল পরিচালনার অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন। ১৯৪৬-এর ইংলণ্ড সফরে যখন নবাব আবার অধিনায়ক নির্বাচিত হন, সেবারও তাঁর অনুরূপ অবস্থা, সেবার সংবাদপত্রগুলি তাঁর সম্পর্কে তেমন মুখর হয়নি।

ইংল্যাণ্ড সফরের জন্য খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণায় অহেতুক এবং অস্বাভাবিক রকমের বিলম্ব হতে লাগলো। দলে অনেক জল্পনা কল্পনা চললো, আর নির্বাচক সমিতির দুই সদস্য মহারাজকুমার ও পতৌদীর নবাব পাল্টা বিবৃতি দিয়ে চললেন। আমার কি হবে এই দুশ্চিন্তায় দিন কাটাতে লাগলাম, তবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সম্ভাব্য দলের অধিকাংশ ঘোষণায়ই আমার নামের উল্লেখ দেখে কিছুটা ভরসা পেলাম।

অধিনায়ক মনোনয়ন নিয়ে কলহ তীব্র থেকে তীব্রতর হল, যার ফলে নির্বাচক সমিতির দায়িত্ব বহনে অনিচ্ছা দেখালেন অনেকেই। ১৯১১ সালে ইংল্যাণ্ড সফরকারী দলের সদস্য আলিগড়বাসী মহামান্য হাইকোর্ট জজ স্যর কে সালহউদ্দীন, বোম্বাই-এর শ্রী চুনীলাল মেহতা ও ১৯৩২ নির্বাচক

সমিতির সদস্য লাহোরের এস ই এল ওয়েন্সকে আমন্ত্রণ জানান হল। ওয়েন্স সাহেব প্রথমে তাঁর পরিবর্তে কোন ভারতীয়কে সদস্যপদে বরণের প্রস্তাব করেছিলেন, পরে অবশ্য নিজেই সদস্য পদ গ্রহণে রাজি হয়ে যান। ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি ভূপালের নবাবই শেষ পর্যন্ত নির্বাচক সমিতির সভাপতি হলেন। সে যুগে অধিনায়ক মনোনয়ন বোর্ডের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে করা হত। সে সভায় তুমুল ঝড় বয়ে গেল। অস্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে প্রথম 'টেস্টে' পাতিয়ালার যুবরাজকে অধিনায়ক করা প্রসঙ্গে বোম্বাই-এর নিন্দাসূচক প্রস্তাব ২—১৫ ভোটে বাতিল হয়ে গেল। এরপর বোম্বাই-এর প্রতিনিধি মিঃ ফৈজী উদাত্ত আবেদন জানালেন যাতে দলভুক্ত হবার পূর্ণ যোগ্যতা সম্পন্ন কাউকে অধিনায়ক মনোনীত করা হয়। মিঃ ফৈজীকে সমর্থন করে ওয়েন্স সাহেব বললেন, সি কে নাইডুকে যদি খেলেয়াড়রা পছন্দ না করে (অনেক যত্নে ও পরিশ্রমে ওই ধরণের একটা হেঁয়ালী তৈরী করা হয়েছিল।) তাহলে দেশে অবশ্যই যোগ্য ক্রিকেটার আরো আছেন যাঁরা কেবল নেতৃত্ব দিয়ে নয় ক্রীড়াশৈলি দিয়েও নিজেদের কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।

ওয়েন্স সাহেব উজীর আলির কথাই বলতে চেয়েছিলেন। বোর্ড মিটিংএর দিন কয় আগে ইংল্যাণ্ড সফরে যেতে নিজের অক্ষমতা জানালেন পতৌদী এবং তিনিই বোর্ডের অধিবেশনে উজীর আলিকে অধিনায়ক প্রস্তাব করলেন। কিন্তু সে নাম প্রত্যাহার করানো হল। ইতিমধ্যে পাতিয়ালার মহারাজ এক বিবৃতিতে জানালেন যেহেতু অস্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে তাঁর পুত্রের অধিনায়ক নিয়োগ প্রসঙ্গে প্রভূত বাদানুবাদ হয়েছে ইংলণ্ডগামী দলের অধিনায়ক নিয়োগের টানাহেঁচড়ার মধ্যে তিনি তাঁর পুত্র অর্থাৎ যুবরাজকে লিপ্ত হতে দেবেন না।

সব নাম বাদ বাতিল হয়ে দ্বৈতপ্রতিদ্বন্দ্বিতা দাঁড়িয়ে গেল, একদিক সি কে নাইডু অপরদিকে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমার। জনমতে নাইডু বিরোধী দলভুক্ত বিবেচিত হলেও পাতিয়ালার মহারাজ নাইডুর নিয়োগ প্রস্তাব সমর্থন করলেন, প্রস্তাব উত্থাপন করলেন সিন্ধু ক্রিকেট এ্যাসোশিয়েশনের প্রতিনিধি মিঃ এফ টি জোনস, মহারাজকুমারের নাম প্রস্তাব করলেন, সমর্থন করলেন বাঙলা ও আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি মিঃ মারে রবার্টসন। ১০—৫ ভোটে মহারাজকুমার অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন। বোম্বে, উত্তর ভারত, গুজরাট, মধ্যভারত ও দক্ষিণ পাঞ্জাব নাইডুর পক্ষে ভোট দিল।

মহারাজকুমারের সমর্থক রবার্টসন-ই মধ্যভারতের বিকল্প প্রতিনিধি হিসেবে অ্যাসোসিয়েশনের নির্দেশমত নাইডুর পক্ষে ভোট দিয়ে প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা রক্ষা করলেন। সংবাদ পত্রের ইঙ্গিত ছিল গিলিগানের দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের অধিনায়ক কর্নেল মিস্ত্রি ম্যানেজার হবেন। তিনি অক্ষমতা জানিয়ে দিলেন। ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হলেন ভাইসরয়ের একান্ত সচিব মেজর জোনস, সহকারী ম্যানেজার মেজর রিকেটস।

অনেক নোংরা জমে উঠেছে তা বেশ বোঝা গেল, বাকি রইল সেগুলি নিয়ে ইংল্যাণ্ডের জনগণের সামনে প্রকাশ্যে ঘাঁটাঘাঁটি করা। অধিনায়ক ও ম্যানেজার নিয়োগের সময় বোর্ড সেই দুজনের হাতে অবাধে ক্ষমতা দেবার সিদ্ধান্ত নিল, তাতে বলা হল: 'অধিনায়ক ম্যানেজার যখন যে সিদ্ধান্ত নেবেন তাতে বোর্ডের পুর্ণ সমর্থন থাকবে।' নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অপপ্রয়োগে সমগ্র সফরটাই বিষিয়ে গিয়েছিল। সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচনা করবো।

এগার

ইংলণ্ডে পাড়ি

অস্ট্রেলিয়ানদের বিরুদ্ধে বেসরকারী 'রাবার' অমীমাংসিত রাখতে পারার উত্তেজনা কেটে গিয়ে এবার জাগলো দুশ্চিন্তা, কি হবে ইংল্যাণ্ডে।

কিছুদিন ধরে অধিনায়ক ও দল নির্বাচনের অনিশ্চয়তায় ভুগে আসছি। ইন্দোরে বসে নির্বাচন প্রত্যাশী দুই তরুণ প্রত্যহ সংবাদপত্রের পাতা সন্ধান করছে। সি এম ও আমি রোজ রেলষ্টেশনে ছুটে যাই, খবরের কাগজ দেখার আশায়। রাত্রিতে বসে খবরের কাগজ পড়ার সে যুগে পদস্থ ব্যক্তিদের ভাগ্যেই জুটতো।

দিন যত যায় উত্তেজনা তত বাড়ে, সময় যেন আর কাটেনা। আমাদের বাড়িতে রেডিও নেই, কাছের রেডিও থাকা এক রেস্তোরায় খবরের সময়টুকু কান খাড়া করে থাকি। সন্ধ্যা ছটায় সংবাদ শুরু। অনেক খবরের শেষে সেদিন নামগুলি ঘোষণা করা হল। নামগুলো বলছে আর আমাদের

হুজনের বুকের টিপটিপানি বাড়ছে: ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমার (অধিনায়ক), সি কে নাইডু, উজির আলি, মহম্মদ নিসার, বিজয় মার্চেন্ট, পি ই প্যাশিয়া, মহম্মদ হসেন, বাঁকা জিলানি খান, এস জে গোপালন, এল পি জয়, লালা অমরনাথ, এস মুসতাক আলি ··· আমার নামের আদ্যক্ষর উচ্চারিত হতেই আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। এই একটি মুহূর্তের মধ্যে যেন সমগ্র জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা পুঞ্জীভূত। ঘোষণা চলতে থাকলো: আমির ইলাহি, সি রামস্বামী, কে আর মেহেরেমজী, এস ব্যানার্জী ও ভি ডি হিণ্ডেলকার। ঘোষণা শেষ হয়ে গেল, আমার বন্ধু সি এস-এর নাম কিন্তু অনুচ্চারিতই থেকে গেল। মনটা মুষড়ে গেল, ইংল্যাণ্ডগামী দলে সি এস-এর ঠাঁই হলনা।

সি এস কিন্তু খাঁটি স্পোর্টসম্যান। নিজের ব্যর্থতা গায়ে মেখে আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে এল সুখবর বহন করে, ওই খবরটা বাবার কাছে এবং আর সবার কাছে প্রকাশ করলো। বাবা পিঠ চাপড়ে সাবাস দিলেন, দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন আমাকে, মেহেরবান খোদার কাছে দোয়া ভিক্ষা করলেন। কিন্তু ওই আনন্দের পরিবেশেও সি এস-এর জন্য বেদনার ছায়া।

আমার তো জীবনের স্বপ্ন সফল; ক্রিকেট দুনিয়ার সিংহদ্বার এখন আমার সামনে খোলা। আনন্দের মধ্যেও সি এস'র কথা ভেবেছি, সেদিনকার আমাদের প্রার্থনা কিন্তু ব্যর্থ যায়নি। একথা আজ সবারই জানা যে শেষ পর্যন্ত বিলম্বে হলেও সি এস'কে দলে নিতে হয়েছিল। কদিনের মধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড থেকে পাকাপাকি আমন্ত্রণ পেলাম। ইংল্যাণ্ড যাত্রার জন্য আমার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল।

এবারেও দলের ম্যানেজার ইংরেজ। বড়লাট লর্ড উইলিংডনের একান্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি মেজর ব্রিটেন জোনস্। দীর্ঘাকৃতি পুরুষ, খেলাধূলায় প্রভূত তাঁর আগ্রহ। ক্রিকেটে গভীর জ্ঞান, ভারতীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে গভীর পরিচিতি, ইংরেজ আদবকায়দায় দক্ষ এবং ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট ও তার পরিবেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা—ম্যনেজার হবার মত ওই সব যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ভারতীয়দের মধ্যে একাধিক ছিলেন। রঞ্জি ট্রফি খেলোয়াড় আই সি এস এম আর ভি দে আদর্শ ম্যানেজার হতে পারতেন। কিন্তু সেদিনের ক্রিকেট বোর্ডের ইংরেজ পক্ষপাতিত্ব ছিল স্বতঃসিদ্ধ।

আমাদের দলটিতে হল দীর্ঘকায় পুরুষের সমাবেশ, অর্ধেকই ছিল ছ ফুটের উপরে। ১৭ জন সদস্যের বয়সের গড় ছিল ২০।২২ বছর। বয়সে আমিই ছিলাম কনিষ্ঠ।

ইংল্যাণ্ড রওনা দেবার আগে আমাদের দল ভূপাল যেতে ক্রিকেট বোর্ড সভাপতি নবাব হামিদুল্লা খাঁর আহ্বানে। হঠাৎ মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। যাত্রার দিন এগিয়ে আসে, ওদিকে মার বাড়াবাড়ি, আমার তখন দারুণ সঙ্কট।

মাই আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেন সফর বাতিল করার কথা যেন কোনক্রমে মনেও না আনি, সেরে উঠবেন বলে আশ্বাস দিলেন। বাবাও আমার যাবার পক্ষেই মত দিলেন। যথাসময়ে ইন্দোর রেল স্টেশনে সবার কাছ থেকে বিদায় ও শুভেচ্ছা নিয়ে ভূপাল যাত্রা করলাম।

ভূপালে আমাদের সবাইকে নবাব বাহাদুর ভোজসভায় আপ্যায়িত করলেন। আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছার বার্তাবাহী বলে অভিহিত করলেন, ক্রিকেটের এবং স্বদেশের সম্মান উচ্চে তুলে ধরবার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করিয়ে দিলেন।

ভূপাল থেকে বম্বে, সেখানকার তাজমহল হোটেলে দুদিন থাকার পর জাহাজে ওঠা। ফোটো তোলা হল সবাইকার। দলের ভাগ্যের প্রতীক হিসেবে একটি খেলনা হাতী ছবিতে আমাদের মধ্যে রাখা হল।

জাহাজ ছাড়ার কিছুক্ষণ আগেই বেশ কিছু লোক ঘাটে জমায়েত হয়েছিল। মালায় মালায় ঢাকা হয়ে গেলাম আমরা। সকাল দশটায় শান্ত সমুদ্রের বুকে বিশ হাজার টন জাহাজ 'এস এস স্ট্রাথনেয়ার অব ইণ্ডিয়াতে' উঠলাম আমরা। বড় জাহাজ দেখিনি এর আগে কখনো, ওঠা তো দূরের কথা।

জাহাজ যখন নোঙর তুলে ধীর যাত্রা করলো, আমরা সবাই ডেকের উপর সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে। উচ্চে আন্দোলিত হাতগুলি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে এল, ক্রমে বম্বে বন্দর এবং শহর দিগন্তে বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেল।

তিন দিন জল দেখে আর জাহাজ দেখে কেটে গেল। এবার আমাদের ক্যাপ্টেন জাহাজের ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ জানালেন ক্রিকেট অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে। জাহাজের সর্বাধিনায়কের নির্দেশে সুষ্ঠু ব্যবস্থা হল নেট প্র্যাকটিসের, প্রতিদিন সকালে দুঘণ্টা করে খেলে হাত পা ছাড়িয়ে নেওয়া, দৈহিক পটুতা বজায় রাখা।

জাহাজ কায়রোর দিকে এগোচ্ছে, কেউ কেউ মতলব করলো, কায়রো ঘুরে আসবে। পোর্ট সৈয়দ পৌছানো মাত্রেই আমরা মিশরের বৃহত্তম নগর অভিমুখে যাত্রা করলাম। কায়রোর অবস্থান মাত্র দুঘণ্টা, তার মধ্যে বিলাসবহুল হোটেল শেফার্ড-এ মধ্যাহ্নভোজন। কায়রো ইয়োরোপের দ্বারনগরী, অনবদ্য সুন্দরী, কিন্তু বাজারের পরিবেশ ভারতীয় বাজারেরই অনুরূপ, হৈহল্লা ও বিশৃঙ্খলায় ভরা। অল্পক্ষণের মধ্যেই পিরামিডগুলিও একবার দেখে নিলাম। এত বিরাট যে মাথা ঝিমঝিম করে। কিন্তু কী সুসমঞ্জস গঠন পারিপাট্য। কিছু কেনাকাটাও হল। তারপর সোজা মোটর চড়ে জাহাজ ছাড়ার সময়মত পোর্ট সৈয়দ প্রত্যাবর্তন। লোহিত সাগরের অসহ্য উত্তাপের পরে ভূমধ্য সাগরে কী আরাম। দুদিন বাদেই কর্মব্যস্ত ফরাসী বন্দর মার্সলইতে জাহাজ ভিড়লো।

সি কে, অমরনাথ ওঁটে ব্যানার্জী ও আমি—চারজন ট্যাক্সি ভাড়া করে সর্বজাতি সমন্বয়ের শহর মার্সেইলস্ দেখতে রওনা হলাম। বেড়ানো শেষে ঘাটের কাছে নেমে ট্যাক্সি চালকের হাতে সি কে ১০০ ফ্রাঙ্কের নোট একটা দিতেই ট্যাক্সিওয়ালা ভোঁ করে গাড়ী ছেড়ে দিল। চলতি গাড়ির উপর লাফিয়ে উঠে লালা চেপে ধরলো ড্রাইভারকে, ভাড়ার টাকা কেটে নিয়ে ১০০ ফ্রাঙ্ক নোটের বাকি পয়সা ফেরৎ দাও। ট্যাক্সিটা থামানো গেল, আমাদের ঘিরে কিছু লোক জমায়েৎ হল, একজন পুলিশও এল। আমরা তাদের বোঝাবার যতই চেষ্টা করি, ইংরেজী ভাষা কেউ বোঝে না। শেষমেশ অবশ্য আমাদের প্রাপ্যটা আদায় হল।

মার্সেইলস ছেড়ে ইংল্যাণ্ড অভিমুখে। টিলবেরিতে এসে ভিড়লো জাহাজ। ক্রিকেটের মাতৃভূমির প্রথম পুণ্য দর্শন ঘটলো আমার। কুয়াশায় ভরা, ভিজে স্যাৎসেঁতে পরিবেশ আর কী শীত! তার উপর হাত বাড়ালেই ঘনকালো মেঘের আস্তরণে হাত বোধ হয় ঠেকে যায়। সেই পরিবেশেই ক্যামেরার আলোর ঘন ঘন বিজলীচমক, সংবাদপত্রীদের সাক্ষাৎকার। কিছু লোকও এসেছিল ডকে আমাদের স্বাগত জানাতে। অগত্যা ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পদার্পন ঘটলো।

টিলবেরি থেকে ট্রেনে চড়ে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে। এম সি সি প্রতিনিধিরা আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জ্যাক হবস, সার প্লামওয়ার্ণার, এইচ ডি জি লেভসন-গাওয়ার, ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক জি ও

অ্যালেন, ভূতপূর্ব অধিনায়ক ডি আর জার্ডিন। আমাদের দলের ভারত থেকে যাত্রা-না করা দু জনকে দেখলাম সেখানে, জাহাঙ্গীর খাঁ ও দিলওয়ার হোসেন, মনটা খুশিতে ভরে গেল। ওঁরা দুজনেই তখন ইংল্যাণ্ডে পড়াশুনা করছেন, সেখান থেকেই সফরে যোগ দিলেন।

মায়ের স্বাস্থ্যের জন্য দুশ্চিন্তা অচিরেই নিরসন হল। খবর এল অনেকটা সুস্থ হয়েছেন। মনের বোঝা নেমে যেতেই ক্রিকেটে পুরোপুরি মন দিতে পারলাম। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের খামখেয়ালী আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে কিছু সময় লাগলো আমাদের। ভিজে স্যাঁৎস্যাঁতে ভাব, তার সঙ্গে বেজায় ঠাণ্ডা। স্বদেশের রৌদ্রজ্জ্বল পরিবেশের জন্য মন কেমন করছিল। তবে বিভিন্ন অভিনন্দন অনুষ্ঠানে হৃদয়ের যে উষ্ণতা পেলাম, তাতেই কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। প্রথম অভিনন্দন দিল রয়েল এম্পায়ার সোসাইটি, হোটেল ভিক্টোরিয়ায় অনুষ্ঠান। সাম্রাজ্যের মূলকেন্দ্রের হোমরা চোমরা সবাই হাজির, সভাপতির আসনে লর্ড চ্যান্সেলার লর্ড হ্যালিশাম। আরো ছিলেন ফীল্ড মার্শাল স্যর উইলিয়াম বার্ডউড, সস্ত্রীক স্যর স্টানলি জ্যাকসন, লর্ড ও লেডি কার্জন। ক্রিকেট জগতের দিকপালদের মধ্যে রঞ্জির সহযোগী ব্যাটসম্যান ও অন্তরঙ্গ সুহৃৎ সি বি ফ্রাই ক্রিকেটের সেই স্বর্ণযুগের আমেজ তাঁর উপস্থিতিতে, ফ্রাই হয়তো অনেক কিছু হন নি, তাঁর বহুবিধ গুণাবলী ছিল সর্বজন বিদিত, জেনেভা সম্মেলনে বিকল্প হিসেবে একাধিক বার ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার ফলে আমাদের দেশের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

এই সফরেই ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমারকে সর্বপ্রথম 'ভিজি' বলে উল্লেখ করা হয়েছিল, সে নামে বাকি জীবন তিনি পরিচিত ছিলেন। সভাপতি লর্ড হ্যালিশ্যাম মন্তব্য করলেন যে সংক্ষিপ্ত ডাকনামে পরিচিতি ইংল্যাণ্ডে জনপ্রিয়তার লক্ষণ। রনজিৎ সিংজীর পরিচিতি যেমন রঞ্জি বলে, 'মহারাজা' যদি অচিরেই 'ভিজি' বলে উল্লিখিত হন, আশ্চর্য হবার কিছু নেই, এমন মন্তব্য তিনি করলেন। ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত ভারত বিষয়ক অজ্ঞতা আমাদের কানে তুলো দিয়ে শুনে যেতে হল। শুধুমাত্র হ্যালিশ্যামের মন্তব্যে নয় অনেক সংবাদ পত্রেই ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমারকে সরাসরি মহারাজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে কিন্তু 'মহারাজা' নিজে অনুপস্থিত, কারণ শরীর বেঠিক। ভারতীয় দলের হয়ে বক্তৃতা করলেন সি কে নাইডু ও এস এম হাদী।

চমৎকার এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ফ্রাই জানালেন যে সি রামস্বামী ১৯২১ সালে ছাত্র হিসেবে কেম্ব্রিজের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের সংযুক্ত টেনিস দল যখন ইয়েল—হারভার্ডের সঙ্গে খেলবার জন্য মার্কিন রাজ্যে গিয়েছিল, তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল প্রিন্স ক্লড এবং সারা সফর তিনি ওই নামেই পরিচিত ছিলেন। ওই গল্পের পরে রামস্বামীর এবারের ডাকনামও প্রিন্স ক্লড হয়ে গেল।

ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে আমরা অনেক শুভেচ্ছা বাণী পেলাম। ভারতের ভূতপূর্ব ভাইসরয় লর্ড উইলিংডন এক বাণী মারফত উপদেশ দিলেন 'সোজা ব্যাটে এবং নতুন এল বি ডব্ল্যু আইন বাঁচিয়ে খেলবে সবাই। একটা কথার প্রচলন হল উইলিংডন ভাইসরয় থাকা কলেই ভারত ক্রিকেটে 'ডোমিনিয়ান স্টেটাস' অর্থাৎ সমপর্যায়ে তিনটি টেস্ট খেলার অধিকার লাভ করেছে।

পরীক্ষামূলক নতুন এল বি ডব্লু আইনে খেলতে রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এবারকার সফর এম সি সি পাকাপাকি ভাবে অনুমোদন করেনি। আমাদের দল দেশ থেকে যাত্রা করার আগেই সেই প্রসঙ্গে প্রতিবাদ উঠেছিল। নতুন আইনে বলা হয়েছিল: 'বোলারের উইকেট থেকে ব্যাটসম্যানের উইকেটে সোজাসুজি বল পড়া ছাড়াও ব্যাটসম্যানের উইকেটে অফসাইডে যদি বলের পিচ পড়ে, তাহলেও ব্যাটসম্যান পায়ে বল ঠেকালে আউট হতে পারে'। এম সি সি-র বক্তব্য ছিল, যেহেতু ইংল্যাণ্ডের কাউন্টি প্রতিযোগিতায় নতুন আইনটি প্রযোজ্য হবে, ভারতের বিরুদ্ধে অন্যভাবে খেলা হলে খেলোয়াড় এবং আম্পায়ারদের বিশেষ অসুবিধা ঘটবে। খবরের কাগজ পড়ে এক সময় মনে হয়েছিল ওই আইনের প্রয়োগ মতানৈক্যের জন্যই বোধ হয় সফরটা শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে যাবে। এম সি সি-র যুক্তির সারবত্তা শেষ পর্যন্ত ভারতীয় কর্তৃপক্ষ মেনে নেন, বিশেষ করে কোনরকম বাদানুবাদ যে ক্রিকেটে অসঙ্গত এই বোধ থেকেই তাঁরা রাজি হয়েছিলেন।

লর্ডস মাঠে অনুশীলনের প্রস্তাব অসম্ভব বলে একেবারে তোলাই গেলনা। সফরসূচীর প্রথম খেলা একদিনের একটি চ্যারিটি ম্যাচের জন্য গ্রেভস এণ্ডে পৌঁছবার আগে ফেয়ারফ্যাক্স ইনডোর ক্রিকেট স্কুলেই যেটুকু হাতপায়ের জড়তা কাটিয়ে নেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেখানেই অনেক সাংবাদিক ও সমালোচক আমাদের অনুশীলন দেখতে এসেছিলেন। মোটের উপর আমাদের ব্যাটিং সকলেরই খুব উচ্চশ্রেণীর বলে মনে হয়েছিল। ম্যাঞ্চেস্টার ইভনিং

নিউজ পত্রিকার ম্যালকম গান সি কে প্রসঙ্গে বলেছিলেন 'দলের সর্বশ্রেষ্ঠ চৌকশ খেলোয়াড়, কাল্পনিক বিশ্বএকাদশে স্থান লাভে তার দাবি আছে, স্পোর্টসম্যানসিপ তাঁর সহজাত।'

আমাদের ব্যাটসম্যানেরা উচ্চতম পর্যায়ের বলে স্বীকৃত হলেও বোলিংকে বলা হল দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং দলে নিসার ও অমর সিং থাকা সত্ত্বেও। গান অবশ্য অন্য কথা বলেছিলেন: 'ভারতীয় বোলিং বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল্। লারউডের মত বিদ্যুৎগতি প্রয়োগে দক্ষ বোলার এদলে যেমন আছেন, গ্রিমেটের মত ছলনা ভরা বল দেবার লোকও আছেন। আমাদের ফিল্ডিং অবশ্য শুরু থেকেই সমালোচিত। কেউ কেউ অবশ্য স্বীকার করেছিলেন যে 'অনভ্যস্থ ঠাণ্ডায় হাত পা কাঠ হয়ে যাবার ফলে দূরের বল ধরতে অঙ্গ সম্প্রসারণে ওদের যেমন অসুবিধা, সোজা বল ধরবার অসুবিধাও তাতে কম নয়'। একজন সমলোচক লিখলেন। 'রোদ উঠলে ভারতীয় ফিল্ডিং ত্রুটিবিহীন। কনকনে মেঘলা আবহাওয়ায় ওদের ফিল্ডিং দেখলে সত্যি ওদের জন্য দুঃখ হয়, গরম দেশের মানুষের কি দুরবস্থা করে দিতে পারে আমাদের আবহাওয়া তা প্রমাণ হয়ে যায়।

গ্রেভসএন্ডে প্রথম খেলাটিতে আমরা নানা কারণে বিশেষ আনন্দ পেয়েছিলাম। 'যেই ব্যাট অ্যাণ্ড বল' মাঠে ১৮৯৫ সালে ডক্টর ডব্লু জি গ্রেস এক অনন্য রেকর্ড করেছিলেন, সেই মাঠে খেলা। কেন্ট-গ্র্যামারান প্রতিদ্বন্দ্বীতা। সারা খেলায় সমস্তক্ষণই গ্রেস মাঠে ছিলেন, রাণ করেছিলেন ২৫৭ ও অপরাজিত ৭৩। সেই খেলা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে টিচ ফ্রীম্যান (ইংল্যাণ্ড ও কেন্ট-এর স্লো বোলার যিনি গ্রেভসএণ্ডের খেলায় আমাদের বিপক্ষ দলের অধিনায়ক ছিলেন) বা নতুন এলবি আইনে কারো সাধ্য হত না সেই দাড়িওয়ালা ভদ্রলোককে উইকেট থেকে সরায়। আমাদের বিরুদ্ধে ফ্রীম্যান উলি, এমস, অ্যাশডাউন প্রভৃতিকে নিয়ে বেশ কড়া দলই সংগ্রহ করেছিলেন। দর্শক আকর্ষণের ব্যবস্থাও ছিল এক শিলিং টিকেট নিয়ে লটারীর প্রথম পুরস্কার একটা ফোর্ড মোটর গাড়ী আর ছ পেনি টিকেটের পুরস্কার পাঁচ পাউণ্ড দামের বাইসাইকেল।

মেঘলা আকাশ ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া সত্ত্বেও খেলাটি কিন্তু মনোজ্ঞ ও প্রাণবন্ত হয়েছিল। নিষ্প্রাণ পিচের চেয়ে আমাদের বেশি দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল নতুন এল বি ডব্লু আইন। সে আইনের প্রথম বন্দি সি কে নাইডু।

পালিয়া এবং আমিও তাতেই আউট হই। সংবাদপত্রে আমার ষোল রাণের খেলা সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল যে আমি নাকি 'কব্জির সূক্ষ্মমোচড়ে নিখুঁত লেটকাট' মেরেছি।' তবে দর্শকদের প্রকৃত আনন্দ দিয়েছিলেন লালা অমরনাথ ও ফ্রাঙ্ক উলি, উলি সম্পর্কে নাইডু-র কাছে অনেক প্রশংসাবাদ আমার শোনা ছিল, তাঁর খেলা চাক্ষুষ করে বুঝলাম যে এতটুক বাড়িয়ে বলা হয় নি। কী সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে হুক মেরেছেন, সমগ্র খেলায় উৎকর্ষ মাখানো। অমরনাথ ছটি চারের বাড়ি মারার পর এম্‌স্ তাকে সুনিপুণভাবে স্টাম্পড আউট করেন।

অধিনায়ক গলা খুশখুশ জর নিয়ে খেললেন এবং খেলা শেষ হতেই চিকিৎসার জন্য লণ্ডন চলে গেলেন। গ্রেভস-এণ্ড-এর মেয়র প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভায় তিনি অনুপস্থিত।

হিণ্ডেলকারকে পঞ্চমুখে প্রশংসা করলে টাইমস্ পত্রিকা, তাঁর উইকেট-কীপিংকে ওই খেলার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলে মন্তব্য করলে। একান্ত সহজভাবে তিনি এপাশ ওপাশ দুপাশ থেকেই নিসারের বল ধরেছেন।

প্রথম খেলা থেকেই প্রানবন্ত ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে আমি দর্শক চিত্ত জয় করলাম। সংবাদপত্রে অবশ্য প্রশংসাও যেমন বার হল আবার আমাদের বেপরোয়া মনোভাব যে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে জয়লাভের অনুকূল নয়, এমন মন্তব্যও করা হল।

সরকারী সফরসূচী শুরু হবার আগেই আমরা জনপ্রিয়। যেখানে গিয়েছি সেখানেই, এমনকি দলের কনিষ্ঠ খেলোয়াড় আমাকেও, শতশত অটোগ্রাফ সই করতে হয়েছে, বড় খেলোয়াড়দের স্বাক্ষর শিকারীরা সবসময় ঘিরে থেকেছে।

কোথায় কোন ছদ্মবেশী সাংবাদিক ঘুরছে এই ভয়ে আমরা বহু ভাবাপন্ন কোন ব্যক্তির সঙ্গে পর্যন্ত মুখ খুলতে সাহস পাইনি। লোকে আমাদের বোবা ক্রিকেট দল, আখ্যা দিয়ে ফেললো। ম্যানেজার ব্রিটেন জোনস তখনো এসে পৌঁছননি, অস্থায়ী ম্যানেজার মেজর রিকেটস আগে থেকেই আমাদের সাবধান করে দিলেন সে সংবাদপত্রীদের সঙ্গে এমন কি আবহাওয়া সম্পর্কেও, কথা না বলতে আমরা চুক্তিবদ্ধ।

কারো সঙ্গে কথা বলা চলবে না। করবোটা কি? অতএব সুযোগ পেলেই বেড়াতে বেরোই। অক্ত সময় ওয়েষ্ট এণ্ড হোটেলের বসবার ঘরে কুঁকড়ে বসে আগুন পোহানো মুখে চাবি এঁটে।

উস্টার্সের বিরুদ্ধে আমাদের সরকারী পর্যায়ের প্রথম খেলা। খেলার আগেই সংবাদ পত্র লিখলে 'ভারতীয়দের প্রধান আকর্ষণ তাদের নতুনত্ব। খেলায় জিতুক আর ব্যর্থই হোক ওরা খেলায় প্রাণসঞ্চার ও দীপ্তি বিকীরণ করবে। একজন অপরিচিত বিদেশী, যার নাম পর্যন্ত আমরা ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারিনা, সে যখন প্যাভিলিয়ান থেকে বেরিয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে উইকেটে আসে তার সম্বন্ধে স্বভাবতই অতিরিক্ত আগ্রহ জাগে। হয়তো আহামরি কিছু খেললো না, হয়তো আমাদের অধিকাংশ খেলোয়াড়ের চেয়ে নিকৃষ্ট খেলোয়াড়, কিন্তু তার সব কিছু আমাদের চোখে নতুন। আমরা স্বভাবতই যে কারো মধ্যে স্বকীয়তার সন্ধান করি, সে স্বকীয়তা ভারতীয় ক্রিকেটারের প্রতি আমাদের আকর্ষণ করে।'

অবজার্ভার পত্রিকায় 'ওয়াচম্যান' নাম দিয়ে একজন লিখলেন; ভারতীয়দের চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য আমাদের ভালো লাগছে, তা হল ক্রিকেট সম্পর্কে তাদের ঐকান্তিক আগ্রহ, কখনো কখনো তারা একেবারে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমাদের অধিকাংশ খেলোয়াড় যখন মাঠে যায়, তাদের দেখে মনে হয়, যে কষ্টদায়ক কর্তব্য করতে এসেছে, কাজ দেওয়া হয়েছে, কাজ করতে হবে তা যে ভাবেই হোক। বছরের পর বছর দিনের পর দিন ক্রিকেট খেলতে হয় তাদের, তাই ওই অবস্থা। একটা প্রাচীন বা সুবিখ্যাত মাঠ আর বিশাল জনতা দেখে তাদের মনে কোনও সাড়া জাগে না। কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড়েরা সাধারণত ক্লাবের হয়ে খেলতে অভ্যস্ত, তাই ক্রিকেটের বড় খেলা সম্পর্কে তাদের আগ্রহ অপরিসীম।'

ওই মন্তব্য অবশ্য বর্তমান যুগের ভারতীয় খেলোয়াড় সম্পর্কে করা যায় না। জাতীয় দলে খেলবার যোগ্যতা বিবেচিত হবার আগেই তাদের অনেকে ইংল্যাণ্ডের লীগ ক্রিকেটে পেশাদার হিসেবে যোগ দেয়।

বারো
আমরা ব্যর্থতা নিয়ে ফিরিনি

অতীত চিরদিনই স্বর্ণযুগ, তার পরিপ্রেক্ষিতেই সচরাচর বর্তমানের মূল্যায়ণ করা হয়ে থাকে। আমরা আবিষ্কার করলাম যে বৃটেনের সংবাদপত্রগুলির মতে আমাদের দল ১৯৩২ সালের ভারতীয় দলের তুলনায় নিষ্প্রভ বলে বিবেচিত।

সোচ্চার ঘোষণা করা হল যে ১৯৩২-এর দল দশম খেলায় প্রথম পরাজয় বরণ করে, আর এবার এসেক্সের বিরুদ্ধে যখন আমরা হারলাম, সেটি অষ্টম খেলায় পঞ্চম পরাজয়, অবশ্য দুইনিংসে দুটি শতরান করে অমরনাথ সে খেলায় প্রভূত প্রশংসা অর্জন করলেন।

হিসেবের খাতা হাতে নিয়ে আমাদের তৃপ্ত হওয়ার মত সামান্যই মিলবে। ২৯টি প্রথমশ্রেণীর খেলায় জিততে পেরেছি মাত্র পাঁচটিতে, বাকি চব্বিশটিতে পরাজয় ও অমীমাংসা সমান সমান। তা সত্ত্বেও আমি দাবি করবো যে আমাদের সফর অসার্থক হয়নি। জমা খরচের হিসেবে যাই দেখা যাক না কেন, অধিকাংশ খেলাতেই আমাদের ব্যাটিং ও বোলিং অতি উচ্চস্তরের হয়েছিল। যা আমাদের মধ্যে ছিলনা তা হল দলগত সংহতি, এবং অবস্থা অনুযায়ী খেলার সামর্থ। অথচ জয়লাভ করতে হলে ওই দুটি গুণ একান্ত প্রয়োজন। আজ যখন পিছন দিকে ফিরে তাকাই, আমি বেশ বুঝতে পারি যে আমাদের তথাকথিত ব্যর্থতার মূলে ছিল, আমাদের ক্রিকেট দক্ষতার কোন ত্রুটি নয়, ছিল আমাদের মধ্যে ক্রিকেট মানসিকতার অভাব। ক্রিকেট হল রূপকথার তেপান্তরের মাঠ, সেখানে পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে দুঃসাহসিক অভিযান, সেই অভিযানে লাভক্ষতি চিন্তা করে সাবধানে পা ফেলে চলবে ভারতীয়দের মানসিক গঠন ছিল তার একান্ত প্রতিকূল।

সংবাদপত্রে বিরূপ মন্তব্য যাই বার হোক না কেন, ওদেশের জনতা আমাদের খেলা দেখে আনন্দ পেয়েছে, চূড়ান্ত ফলাফল কি হল তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে আমাদের খেলার বিচার যাঁরা করেন তাঁরা সে দেশের খামখেয়ালী আবহাওয়ার কথাটা কখনোই ধরে না। অধিকাংশ খেলা হয়েছে প্রায় অন্ধকার পরিবেশে ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে যার ফলে নিশ্চিত জয়লাভে আমরা বঞ্চিত হয়েছি বহুবার।

সব সমালোচকের মতেই সি কে নাইডু ১৯৩২ তুলনায় পড়তি। অথচ আমি তাঁকে প্রথম সরকারী ম্যাচেই দুর্ধর্ষ খেলতে দেখেছি। উস্টার্সের বিরুদ্ধে খেলায় বোলিংকে যথেচ্ছ পিটিয়েছেন, দেখে দর্শকরা আনন্দ পেয়েছে, জার্ডিন তাঁকে বলেছেন ডান হাতের উলি। ঠ্যাটা উলি'র মত নাইডুও ক্রিকেটের সবরকম মারে সিদ্ধহস্ত। অমর সিং-এর ব্যাটিং দেখে জনতা উল্লাসে ফেটে পড়েছে, আর মার্চেণ্ট ম্যাচের পর ম্যাচ সমানভাবে খেলেছেন। উইকেটকীপার হিসেবে হিণ্ডেলকার, প্রথম শ্রেণীর বলে প্রতিভাত ও স্বীকৃত হয়েছিলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে প্রথম টেষ্টের পর থেকে তিনি চোখ নিয়ে কষ্ট পেয়েছেন। ইয়র্ক-শায়ার ম্যাচের আগে পর্যন্ত নটি খেলায় অংশগ্রহণ করে ২৪ জনকে আউট করে ছিলেন হিণ্ডেলকার। তার মধ্যে ছ জনকে নিয়েছিলেন অক্সফোর্ডের খেলায় আর মিডলসেক্সের খেলায় সাতজনকে। অক্সফোর্ডের কিম্পটনকে যেভাবে আউট করেছিলেন তা কখনো ভোলার নয়। ব্যানার্জীর বলে অনবদ্য লেগগ্লান্স করেছেন কিম্পটন্, কিন্তু উইকেটকীপার আগে থেকেই বুঝে নিয়েছিলেন কি ধরণের মার হবে এবং অনেকখানি দূরত্ব সামলে নিয়েও ক্যাচটি ধরে ফেরেছিলেন।

আমাদের এযুগের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ফাষ্ট বোলার সম্পর্কে ত্রাস সর্বজনবিদিত। কিন্তু সেবার আমরা ইংল্যাণ্ডের ফাষ্ট বোলারদের নির্ভয়ে খেলেছি, ব্যর্থ হয়েছি বরং স্পিন বোলিং-এর বিরুদ্ধে। একথা জার্ডিন সমেত সব সমালোচকই স্বীকার করেছেন। নরম উইকেটে খেলতে আমরা একেবারেই অনভ্যস্ত, কাজেই ওই জাতীয় উইকেটে যখন খেলতে হয়েছে আমরা বিপর্যয় ঠেকাতে পারিনি।

আমাদের ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতার মূলে ছিল ইংল্যাণ্ডের উইকেট সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা। এবং প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট মানসিকতার অভাব। সেই সঙ্গে আমাদের বোলিং-এ বৈচিত্রের এবং একাগ্রতার অভাব ইংল্যাণ্ডের ব্যাটসম্যানদের চেপে রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল। ভালো বোলিং বলতে নিসার ও অমর সিং। খুবই ভালো, তবে অমর সিং তখন কোলন ক্লাবে পেশাদার, কাজেই তাঁকে আমরা কখনো কখনো পেতাম। শুঁটে ব্যানার্জী ব্যাটিং-এ যতখানি সার্থকতা দেখাতে পেরেছিলেন, বোলিং-এ ততটা পারেননি। সি কে-র বোলিং সার্থকতা ছিল সীমিত। অমরনাথ খুবই ভালো বল করছিলেন, কিন্তু প্রথম টেষ্টের আগেই তাঁকে দেশে ফেরৎ পাঠানো হল। দলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য সি এস কে আনা হল, তাঁর শুরুও হল আশাপ্রদ, কিন্তু তারপর আর তাঁর বোলিং তেমন কার্যকরী হয়নি। জার্ডিন মন্তব্য করেছিলেন যে একজন সঠিক লক্ষ্যে বোলিং করতে দক্ষ ন্যাটা বোলার অবশ্যই দলের শক্তি-বৃদ্ধিতে সহায়তা করতো। ন্যাটা বোলার হিসাবেই মূলত দলে আমার ঠাঁই হয়েছিল, কিন্তু কেন যেন আমার বোলার-সত্তার অকালমৃত্যু ততদিনে প্রকট হয়ে পড়েছে।

এক বিষয়ে কিন্তু আমাদের ভারতীয় দল ১৯৩২ সালের সফরকারী দলের

চেয়েও দক্ষ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিল এবং তা ফিল্ডিং-এ। ১৯৩২-এ লাল সিংকে বলা হয়েছিল : সম্ভবত দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ফীল্ডার। ১৯৩৬ দুনিয়ার না হলেও আমার ফিল্ডিং সারা সফরে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছিল।

রাণ যাই উঠুক না কেন, আমাদের ব্যাটিং-এর কলাকৌশল, চাতুর্য ও সৌকর্য সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিল। কিন্তু তার মধ্যেও ত্রুটি ছিল। অমরনাথের ড্রাইভ ও কাট মারের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন জার্ডিন্ তার অফ-সাইড বলে অকারণ খোঁচা মারার স্বভাবকে নিন্দা করেছিলেন।

ব্যক্তিগত রাণের হিসেব কিন্তু হতাশাব্যঞ্জক ছিলনা, প্রথম কটি ম্যাচে সি কে করলেন ৪৪ ও ৮, ৮৩ ও ২৯, ৭৩ ও ৬৮ এবং ৭৬, উজীর প্রথম প্রকাশেই ৮৫ করলেন কেম্ব্রিজের বিরুদ্ধে এবং তৃতীয় ম্যাচে ডারহামসের বিরুদ্ধে ১৫০ মিনিটে ১৩৯ রাণ করলেন। তাঁর অফ-ড্রাইভগুলি দর্শকদের বিমুগ্ধ করেছিল। সমারসেটের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের ফলো-অন ইনিংসে মার্চেণ্ট করলেন ১৫১। পরবর্তী ম্যাচে নর্দাণ্টসের বিরুদ্ধে অমরনাথের অপরাজিত ১১৪ ও লিস্টার্সের বিরুদ্ধে বাকা জিলানির ১১৩। কিন্তু শেষোক্ত খেলায় শ্রেষ্ঠ গৌরব হরণ করলেন নিসার, জিলানির সঙ্গে শেষ উইকেট জুড়িতে ৮৫ রাণ যোগে সহায়তা করে। শেষ উইকেট জুড়িতে আরো একবার দেখিয়েছিলেন নিসার যেবার রামস্বামীর সঙ্গে মিলে যোগ হয়েছিল ৮৪ রাণ। প্রথম টেস্টের পরবর্তী সেই খেলায় লাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে রামস্বামী ১২৭ রাণ করে অপরাজিত ছিলেন। অষ্টম ম্যাচে এসেক্সের বিরুদ্ধে অমরনাথ অন্য কোন ব্যাটসম্যানের কাছে তেমন কোন সহযোগিতা না পেয়েও, প্রতি ইনিংসে শতরাণ করলেন। প্রথম দিনে মধ্যাহ্নভোজের বিরতির সময় শতরাণ থেকে মাত্র তিন রাণ পিছিয়ে থেকে অনন্য কৃতিত্ব লাভে সামান্যের জন্য বঞ্চিত হলেন।

একদিনের চ্যারিটি ম্যাচটি ড্র করে পরের খেলায় উস্টার্সের সঙ্গে আমরা সামান্যর জন্য জিততে পারলাম না। প্রথম ইনিংসে আমরা ১৯ রানে এগিয়ে। শেষ ইনিংসে জয়ের জন্য ওদের চাই ১৩২ কিন্তু ১১ রাণেই চারজন আউট, তখন নিসারের বোলিংএর হিসেব ৩·৫ ওভার, ৩ মেডেন, ২ রাণে ৩ উইকেট। সপ্তম উইকেট পড়লো ৬২তে। কিন্তু ততক্ষণে নিসার ক্লান্ত, হিউম্যান এসে দৃঢ় হাতে ব্যাট ধরে ওদের বাঁচিয়ে দিলেন।

তের নম্বর ইংরেজদের পক্ষে অপয়া, আমরা কিন্তু তের নম্বর খেলাতেই প্রথম জয় লাভ করলাম। কিন্তু তার আগেও বেশ কয়েকবার জেতার কাছাকাছি

এসেছিলাম। দ্বিতীয় খেলায় অক্সফোর্ডের বিরুদ্ধে জয়ের জন্য মাত্র ৪৫ রাণ চাই, হাতে উইকেট আছে পাঁচটি। কিন্তু ততক্ষণে ভেজা পিচে রোদের টান ধরেছে। কাজেই খুব সাবধানে উইকেট বাঁচিয়ে জয়ের আশা বিসর্জন দিয়ে খেলতে হল। চতুর্থ ম্যাচে ভারত নয় উইকেটে ৪০৫ করে নর্দাণ্টসকে ফলো-অন করিয়েছিল। মার্চেণ্ট ক্লার্কের এক ওভারে ২, ৩ ও ৪ করে এলবি-র আবেদন মাত্র প্যাভিলিয়ানের দিকে রওনা দিতে তাঁকে ডেকে আনা হয়েছিল।

আমার ভাগ্য প্রথম সুপ্রসন্ন। যে কোন ক্রিকেটারের কল্পনার স্বর্গরাজ্য লর্ডস মাঠে এম সি সির বিরুদ্ধে আমার ৪৭ই ছিল দলের সর্বোচ্চ রাণ। পরের বার যখন লর্ডস-এ খেলতে এলাম মিডেলসেক্সের বিরুদ্ধে, আমার দ্বিতীয় ইনিংসের ৪৩ই ছিল সবচেয়ে বেশি, দুখানা ছয় ও তিনখানা চার মেরেছিলাম আমি। রবিনস-এর স্পিন বোলিং-এ আমাদের অবস্থা কহিল; অমরনাথের বলে ওরা কাবু। জিততে মাত্র ৯৬ রাণ চাই, এই অবস্থায়ও মিডলসেক্স মাত্র চার উইকেটে জিতলো।

লর্ডস মাঠে বার বার তৃতীয় বারে আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল, মাইনর কাউণ্টিজের বিরুদ্ধে পিটিয়ে ১৩২ রাণ করলাম। কাগজে আমার কড়া ড্রাইভ ও লেগসাইডে পুলগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বার হল, আঠারটি বাউণ্ডারি সমেত ওই খেলায় নাকি একবারের জন্য ভুল ব্যাটচালনা করিনি। মার্চেণ্টের সঙ্গে আমার ওপেনিং তখনও সুদূর পরাহত। কিন্তু হিণ্ডেলকার আউট হতে আমি মার্চেণ্টের সঙ্গে যোগ দিয়ে দুজনে মিলে ১৪০ মিনিটে ১১৫ যোগ করলাম। মাত্র পাঁচ রাণের জন্য শতরাণে বঞ্চিত হলেন মার্চেণ্ট। এক ইনিংস ও ৭৯ রাণে জিতলাম আমরা। প্রথম ইনিংসের সি এস-এর বোলিং-এ ওদের ফলো অন করতে হল, দ্বিতীয় ইনিংসে নিসার আর অমরসিং দুইয়ে মিলেই ওদের সবাইকে নামিয়ে দিল মাত্র ৪২ রাণে। সি এম সদ্য ইংল্যাণ্ডে এসে প্রথম খেলতে নেমেছে, সেই খেলায় আমার প্রথম সেঞ্চুরি। সি এস-এর দাবি ওর আগমনেই আমার ভাগ্য খুলেছে, প্রিয়বন্ধুর দাবি প্রসন্নচিত্তে মেনে নিলাম। এই খেলাতেই আমি সিংহলী ক্রিকেটার এফ সি ডেসারামকে প্রথম দেখলাম, মাইনর কাউণ্টিগুলির প্রতিযোগিতায় যার মোট রাণ সেবার ৯০৪, সর্বোচ্চ রান ১৮২ আর গড়রান ৯০.৪০। আমাদের বিরুদ্ধে তিনি অনবদ্য খেলে এগারটি চারের সাহায্যে ৮৫ রান করলেন ১৫৫ মিনিটে, তাঁর প্রথম পঞ্চাশ রান করতে

লেগেছিল ৪৫ মিনিট, নিসারের বলে এক ওভারে ১২ রান নিয়েছিলেন, সেই অনবদ্য ইনিংসে ছেদ পড়লো যখন অমর সিং-এর বলে একটা হুক মারতে গিয়ে সময়ের হিসেবটা একটু বেঠিক হয়ে গেল।

এর আগে কেম্ব্রিজের পক্ষে আমাদেরই জাহাঙ্গীর খান শেল হানলেন, ২২ রান চার উইকেট নিয়ে। মাত্র ১৬১ তে ইনিংস খতম, তাও উজীর আলি ৮৫ করেছিলেন বলে। তৃতীয় দিনে বৃষ্টির ফলে ড্র হয়ে গেল খেলা।

কাউন্টি চ্যাম্পিয়ান ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে ভেজা পিচে আমাদেরই আগে ব্যাট করতে হল। মাত্র ২২ রানে ছজন ফেরত। এলেন সি কে, অমিতবিক্রমে উইকেট বাঁচিয়ে চললেন ১৪১ মিনিট ধরে, সেটুকু সহযোগিতা আমিই দিলাম। দুজনে জুড়িতে ৫০ রান যোগ করলাম, নাইডু একা করলেন ৪১, সেই ইনিংস পরাজয়ের খেলার দ্বিতীয় ইনিংসেও যা রান তা সি কে-র (৩০) ও আমার (২৯)। মাত্র ৯৮ রানে ইনিংস শেষ।

কেলিংটন ওভালে প্রথম আবির্ভাবেই আমি ১৪: করলাম অবশ্য দ্বিতীয় ইনিংসে, গোভারকে প্রচুর মেরেছিলাম সেদিন। সে খেলায় সারের বিরুদ্ধে আমার ব্যাটিং প্রসঙ্গে টাইমস্ পত্রিকা লিখলে: মুশতাফ আলি প্রথম থেকেই বোলিংকে আক্রমণ করলেন কল্পনা দিয়ে ও শক্তি দিয়ে, তাঁর অনবদ্য পদচালনার সঙ্গে মিলেছিল বলটি যথাস্থানে মারার দক্ষতা। প্রথম ৫০ রাণ তুললেন প্রায় এক ঘন্টার মধ্যে, গোভার প্রমুখ নামকরা বোলারের খ্যাতি সেদিনের মত ধূলিসাৎ করে দিয়ে। যখন ১৭: রানে প্রথম উইকেট পড়লো তার মধ্যে ৭২ রাণই মুশতাফের। এর পর ক্যাচ বিহাইও কোন মতে বেঁচে গিয়ে সাবধানে খেলতে লাগলেন। শতরাণ পূর্ণ হতেই তাঁর পদক্ষেপে ফিরে এল নৃত্য চপল ভঙ্গী, আর তাঁর পূর্বদিনের ছন্দময় বিচিত্র স্ট্রোকগুলিও আবার দেখা গেল। অফ ড্রাইভগুলির টাইমিং ছিল আদর্শ স্থানীয়। আর অনের মারে বলকে তিনি যেমন ইচ্ছে পাঠিয়েছেন।' এই মন্তব্যে নিশ্চয়ই প্রমাণ মেলে যে আমার বিরুদ্ধে দায়িত্ব জ্ঞান হীন বেপরোয়া খেলার অভিযোগ একেবারেই অলীক।

হিণ্ডেলকারের সঙ্গে সফরের নতুন জুড়ি রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করলাম দ্বিতীয় উইকেটে ২১৭ রান যোগ করে। প্রথম ইংনিসে ২২৬ রান পিছিয়ে থেকেও আমরা যখন দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ার করি তখন আমরা ১৯৫ রান এগিয়ে, পাঁচজন ব্যাটসম্যান তখনো অক্ষত। নিসারের মত ওদের গোভারও শেষ

শেষ উইকেটে খেলায় পারদর্শিতা দেখালেন, পার্কারের সঙ্গে মিলে যোগ করলেন ১১৭ রান।

প্রথম টেষ্টের আগে আমাদের রাজদর্শনে বার্মিংহাম প্রাসাদে ডাক পড়লো। টেষ্ট ম্যাচের প্রথম দিনে লর্ডস মাঠে এসে সম্রাট উভয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন করেন। এই চিরকেলে প্রথা এবার রক্ষা করা গেল না, কারণ পিতা সম্রাট পঞ্চম জর্জের মৃত্যুতে রাজা অষ্টম এডোয়ার্ড (পরের বছর অভিষেকের আগেই বিবাহ প্রসঙ্গে পার্লামেণ্টের সঙ্গে মতভেদের ফলে তিনি সিংহাসন তথা ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করেন) তখন শোক পালন করছেন। তাই তিনি লর্ডসে আসবেন না, আমরাই দেখা দিতে তাঁর প্রাসাদে গেলাম।

রাজা শোকগ্রস্ত বলে আমাদের কালো স্যুট, কালো টাই ও ফিকে নীল রঙের পাগড়ী পরতে হল। ফৌজী পোশাক পরিহিত রাজা যেমন সুদর্শন তেমনি আকর্ষনীয় তাঁর ব্যক্তিত্ব, মধুর তাঁর ব্যবহার।

পরপর দুখানি শত রান করেও টেষ্ট খেলতে এসে কিন্তু আমাকে একেবারেই শূন্য হাতে প্যাভিলিয়ানে ফিরতে হল। ঐতিহাসিক লর্ডস মাঠেই হল আমার জীবনে প্রথম শত রান এবং প্রথম শূন্য।

টেষ্টের পর ল্যাঙ্কাশায়ার ম্যাচ খেলে আমাদের ডাবলিন যাত্রা। সে ম্যাচে আমি খেলিনি ঘুরে ফিরে ছবির মত সাজানো ঝকমকে শহরটাকে দেখে বেড়িয়েছি। ডাবলিন যাত্রার বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা ছিল আইরিশ ফ্রি স্টেটের রাষ্ট্রপতিই মন ডিভ্যালেরা একই জাহাজে আমাদের সহযাত্রী। আইরিশ স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কুড়ি'র দশকে ডি ভ্যালেরা বিদ্রোহী ভারতে মহাসম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন, বড়দের মুখে সে যুগের গল্প আমার শোনা ছিল। তাই তারই সঙ্গে একই জাহাজে সহযাত্রী হতে বিশেষ উত্তেজিত বোধ করলাম।

ডাবলিনের খেলায় জয় লাভ করে ফিরতি জাহাজে বসে জাহাঙ্গীর খান একটি কাহিনী বললেন। আমাদের প্রথম টেষ্টের ঠিক পরে ওই মাঠেই এম সি সি বনাম কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের দলের হয়ে বল করছেন জাহাঙ্গীর, বলটি লাগলো একটি উড়ন্ত চড়ুই পাখীর গায়ে। ব্যাটসম্যান পীয়ার্স বলটি ব্যাট দিয়ে রুখলেন। সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা ধপ করে স্ট্যাম্পের মাথায় পড়লো, যদিচ বেল ছিটকালো না। পড়লো

আর কি? একটা মরা চড়ুই। পরবর্তীকালে সেই বলটির গায়ে পাখীটির খোলস সেঁটে সেটিকে সযত্নে স্মৃতি ফলক হিসেবে রাখা হয়েছে লর্ডস্-এ।

টেষ্টের আগের খেলাটি লাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে অমীমাংসিত ছিল। টেষ্টের ঠিক পরেই ফিরতি খেলায় ল্যাঙ্কাশায়ারকে আমরা ৮৪ রানে হারালাম। ১৯০৯-এর পরে ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রথম পরাজয়। দুই ইনিংসেই ওপেনিং ব্যাটসম্যান মার্চেন্ট শেষ অবধি নট আউট। প্রথম ইনিংসে দলের ২৭১ মধ্যে তিনি একাই করলেন ১৩৫, দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৭। দলের অধিনায়ক মহারাজকুমার তখন রাজার কাছ থেকে নাইট খেতাব আনতে লণ্ডন গিয়েছেন। তাই অধিনায়কত্ব করলেন সি, কে, দুইনিংসেই শূন্য রান করার ব্যর্থতা ঢাকলেন মারাত্মক বোলিং করে। ল্যাঙ্কাশায়ার যখন দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নামে জয়ের জন্য তাদের লক্ষ্য ১৯৯ রান। কিন্তু সি, কে -র বোলিং এ (৪৬ রানে ৬ উইঃ) ওদের দল ১২৪ রানেই কাৎ হয়ে গেল।

ওল্ডট্রাফোর্ড মাঠে দ্বিতীয় টেষ্টের আগে পর্যন্ত আমার ভাগ্যেই ভাঁটা পড়েই রইল। দ্বিতীয় টেষ্টের পর উইম্বলডনে টেনিস দেখবার নিমন্ত্রণ জুটলো। কী সবুজের সমারোহ সেখানে। তাছাড়া রূপে রঙে, ফ্যাশানের বিচিত্র বাহার। লন টেনিসে চিরস্মরণীয়, ফ্রেড পেরি, বানি আন, ভন ক্র্যামকে হিউসকে-একোটেও খেলতে দেখলাম।

পরবর্তী সামাজিক নিমন্ত্রণ ওয়েম্ব্লেি মাঠে আর্সেনাম-বনাম-খোফি এফ এ কাপ ফাইনাল খেলাটি দেখবার জন্য। মাথায় পাগড়ী পরে যেতে হল সবাইকে। লোকে লোকারণ্য। দুপক্ষের সমর্থক গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। যে যার প্রিয় দলে জামার রঙের তেকোনা টুপিতে মাথা ঢেকে হাতে করে ছোট ছোট কাগজের দলীয় পতাকা নাড়ছে। জনতার অর্ধেক সুকেশা মহিলা, উৎসাহের উদ্দীপনায় তারা পুরুষদের চেয়ে কম যায় না। আমাদের পাগড়ীগুলি প্রবেশ মাত্রই দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। একদল উঠে দাঁড়িয়ে গান ধরলো যার অর্থ ওরা ভাল মানুষের দল।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেষ্টের মাঝে খেলাগুলির মধ্যে বার্মিংহামে ওয়ারউইক-শায়ারের বিরুদ্ধে আমাদের শুরু ভালই হয়েছিল। আমির ইলাজির বলে ওরা ১৮১ তে আউট। দিলওয়ার ইনিংস সূচনা করেও অপরাজিত

রইলেন ১০১ রানে, তার পরেই সি-কে-র ৩৬। তবু বৃষ্টির জন্ম মীমাংসা হলনা খেলার। আমি অবশ্য খেলিনি সে ম্যাচ।

তৃতীয় টেষ্টের পরবর্তী খেলায় হ্যাম্পাশায়ারকে মাত্র দুরানে হারালাম আমরা, প্রথম ইনিংসে ৪৬ রানে পিছিয়ে থেকেও। দ্বিতীয় ইনিংসেও ৯৯ রানে ন উইকেট পড়ে গেল, তারপর শুটে ব্যানার্জী ও সি-এস ৫০ মিনিটে ১০০ রান যোগ করলেন। ওদের দ্বিতীও ইনিংসে জয়ের লক্ষ্য ১৫৪। কিন্তু সি কে প্রথম ইনিংসে ৯১ রানে পাঁচ উইকেটের সার্থক উপসংহার করলেন ৬৮ রানে চার উইকেট নিয়ে যার ফলে ৫৯ রানে ওদের আধা দল খতম, তারপর টেনে নিয়েও ১৫১ তে সব শেষ।

পরের ম্যাচে সামেসক্সের সঙ্গে আমাদের আট উইকেটে পরাজয়। তবু নিজস্ব ১২২ রান করে দিলাওয়ার যেটুকু মুখ রক্ষা করলেন। প্রতিযোগিতা মূলক খেলা এইটি শেষ। তারপর চারটি ক্রিকেট উৎসব, উৎসবের শেষ খেলায় লেভসন-গাওয়ারের বিরুদ্ধে আমার হাজার রান পূর্ণ হল। গোভার দুশ উইকেটের ব্যাগ ভরলেন।

রানের হিসেব করে খেলিনি কখনো। কিন্তু হিসেব রেখেছিলেন আমাদের স্কোরার ও মালপত্র রক্ষক ফার্গি। নিউজীল্যাণ্ডে জন্ম, স্থায়ী বাস অস্ট্রেলিয়ায়। বিল ফার্গুসন জীবনে ৬৬টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে ওই দায়িত্ব পালন করেছেন। হাসিখুশী কর্মঠ একটা সার্ব্বজনীন প্রীতি ঠিকরে পড়ছে তাঁর সমস্ত চলাফেরা কথাবার্তা, আচার আচরণ থেকে। কীথ মিলার তাঁর এক স্মৃতিচারণ গ্রন্থে ফার্গিকে পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছেন।

খেলার দিন সকালে আমরা সবাই তখন মাঠমুখো, হেঁটে হেঁটেই চলেছি। আধ পথে ফার্গি হঠাৎ আমায় থামিয়ে মুখ কাছে এনে একান্তে জানালেন, আর ৭৮ হলেই আমার হাজার রান পূর্ণ হবে।

জীবনে এই প্রথম নিজের রান সম্বন্ধে সচেতন হয়ে মাঠে নামলাম। লেভসন-গাওয়ারের দলের প্রথম ইনিংসে রান হল ২২৫। আমি প্রথম দিনে ২৬ রান করে, পরের দিন ৭৩ রান যোগ করে শতরান পূর্ণ করে তার পরও ১৪৭ পর্যন্ত এগোলাম। মোট সময় নিলাম তিন ঘণ্টারও কম। পত্রিকাগুলি আমার ড্রাইভিং, হুকিং ও কাটিং-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো। প্রথম ইনিংসে ১০৮ রানে এগিয়ে রইলাম আমরা। দ্বিতীয় ইনিংসে আমাদের হাতে সময় ১৪০ মিনিট জয় লক্ষ্য ২২২। প্রথম শত রান উঠলো হুহু করে,

মনে হল লক্ষ্যে পৌছানো অসম্ভব নয়। কিন্তু ৭৪ রান করে টাউনশেন্ডের বলে এলবি হলাম আমি, জয়ের লক্ষ্যে এগুনোও শ্লথ হয়ে গেল।

স্কারবোরো ম্যাচেই ইংল্যাণ্ড ক্রিকেট মরশুমের শেষ খেলা। এর আগেই ভেরিটির ২১৬ উইকেট হয়ে গেছে, গোভার প্রথম ইনিংসে আমাকে সমেত তিনটি উইকেট নিয়ে ১৯৭টি পেলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে আমি ওকে বঞ্চিত করলাম। তবু দুঃখ হল, আহা অমন কৃতি বোলার, পূর্ণ কৃতিত্ব পাওয়া উচিত তার। গোভারের দুশ উইকেট অবশ্য পূর্ণ হল। তবে আমি আগাগোড়া ওকে এমন পিটিয়েছি যে মোট হিসেবের গড়পড়তা গুনতির বারোটা বেজে গেছে। পরবর্তী অস্ট্রেলিয়ান সফরে ইংল্যাণ্ড দলে গোভারের যে স্থান হয়নি, তার জন্য তিনি আমাকেই দায়ী করেছিলেন সরাসরি মন্তব্যে।

ভারতীয় জিমখানার বিরুদ্ধে দুদিনের খেলায় সফর শেষ। এ সফরে ভারতীয় ক্রিকেটের পক্ষে সার্থকতা ও ব্যর্থতার মিশ্রণে, বিশেষ করে এর প্রভাব হয়েছিল সুদূর প্রসারী। আমার নিজের কথা দিয়ে সফর প্রয়াস শেষ করা কারো কারো কাছে অশালীন মনে হতে পারে। কিন্তু আমার জীবনে ওই সফর যে পরিবর্তন ঘটিয়েছে তা উপেক্ষার নয়, শুধু ব্যক্তি ক্ষেত্রেই নয়, ভারতীয় ক্রিকেটের সামগ্রিক ক্ষেত্রেও আমি যখন ইংল্যাণ্ড রওনা হই তখন চলনসই ব্যাটসম্যান, চতুর ফিল্ড ও শ্লো ন্যাটা বোলার। ইংল্যাণ্ডে এক মরশুম আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল, আমি একেবারে নতুন মানুষ হয়ে ফিরলাম। ইংল্যাণ্ডের পরিবেশে, উন্নততর নৈপুন্য দেখে ও প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলে অনেক কিছু জানবার ও শিক্ষার সুযোগ আমার কাজে লাগলো। দলের মধ্যেই আমিই ছিলাম তরুণতম, সেই আমি ওপেনিং ব্যাট হিসেবে বিজয় মার্চেন্টের যোগ্যতম সহযোগী বলে প্রতিষ্ঠা পেলাম এবং এর পর থেকে সবচেয়ে দর্শনীয় ও জনপ্রিয় ব্যাটসম্যান বলে স্বীকৃত হলাম। আমার নতুন জীবনে উত্তরণের পূর্ণতা এসেছিল দ্বিতীয় টেষ্টে ওল্ড ট্রাফোর্ডের মাঠে।

তেরো

ওল্ড ট্রাফোর্ডের সেই দিনটি

ভিজে জ্যাবজেবে ম্যাঞ্চেষ্টারে আমাদের দ্বিতীয় টেষ্ট খেলাটি অনেককাল মানুষের মনে গাঁথা হয়ে থাকবে, কারণ ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠের ঐ খেলাটিতে ক্রিকেটের একটি রৌদ্রকরোজ্জ্বল অধ্যায় লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

এবার আমার নিজের বেলায়, ওই খেলার দ্বিতীয় দিনটি ১৯৩৬ সালের ২৭ জুলাই সোমবার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন নিঃসন্দেহে। জীবনের প্রথম টেষ্ট সেঞ্চুরী করেছিলাম সেই দিনে, কিন্তু তার জন্য নয়। সেদিন আমি মনের শখ মিটিয়ে ব্যাটিং করতে পেরেছিলাম, ইংল্যাণ্ডে শ্রেষ্ঠ বোলিং এর উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে সেই বোলিংকে অতি সাধারণ স্তরে নামিয়ে দিতে পেরেছিলাম।

খেলার ঠিক আগের দিনের আলোচনায় সি. বি. ফ্রাই লিখলেন: "ভারতীয় খেলোয়াড়দের দক্ষতা সম্বন্ধে অবহিত যে কেউ নামের তালিকা অনুধাবণ করলেই কৌশলী এবং উজ্জ্বল প্রত্যাশা পোষন করতে পারবেন, তার মধ্যে প্রকৃত মনীষার সন্ধানও মিলবে। ভারতীয়দের প্রয়োজন শুধু অনুকূল পরিবেশ, কনকনে শীত ও জল চপ্‌চপে আবহাওয়া না থাকলেই হল। অতি দ্রুত পিচে খেলে ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ দলকে হারাবে এমন আশা ওরা অবশ্যই রাখে না। কিন্তু প্রতিযোগিতা ছাড়াও ক্রিকেটের অন্য একটা দিক আছে। সহজাত সুকুমার শিল্পকলা মণ্ডিত খেলা দেখিয়ে আনন্দ দেবার দক্ষতা ও প্রবনতা যে ভারতীয় খেলোয়াড়দের রয়েছে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা তা জেনেছি। আজকের খেলাটিতে যদি তারা নিছক আনন্দ পাবার ও স্বকীয় চরিত্র প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে অংশ গ্রহণ করে তবেই বিজ্ঞতার পরিচয় দেবে।"

সত্যি ভারতীয় খেলোয়াড়রা ক্রিকেটের কোন স্বর্গে আরোহণ করতে পারে, ফ্রাই তা জানতেন, ম্যাচ জেতার রূঢ় সংগ্রামে নয়, ক্রিকেট ব্যাটে বীনার মূর্চ্ছনা প্রকাশের দক্ষতায় অথবা সেটিকে যাদুদণ্ডে পরিণত করে ভোজ্ক দেখাতে তারা সক্ষম। ইংল্যাণ্ডকে হারাবে এমন দম্ভ তাদের ছিল না, কিন্তু

কোণঠাসা করে রাখবার মত কামানের গোলা তাদের অধিকারে ছিল। কনকনে শীত বা জল চপচপে পরিবেশে তারা জর্জর হয়নি, মনোমত পরিবেশ পেয়ে রঞ্জির সখা ও সহযোগী ফ্রাই-এর প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পেরেছিল।

"খেলার প্রথম দিনে ওল্ড ট্রাফোর্ডের মাঠে তেমন জনসমাগম হয়নি," ডি আর জার্ডিন লিখলেন "ওই টেষ্ট কেন্দ্রটি স্বরূপে প্রকাশিত হয়নি"। ভূত-পূর্ব ইংল্যাণ্ড অধিনায়ক এর কারন দেখিয়ে বলেছেন সে বছর ল্যাঙ্কাশায়ারে দলের শোচনীয় রেকর্ড আর দুঃসহ ভিজে আবহাওয়ার জন্য লোকে ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে আসবার অভ্যাসই হারিয়ে ফেলেছিল। তাছাড়া সেদিন ল্যাঙ্কাশায়ার লীগ ক্রিকেটেও বড় খেলা ছিল। কন্সটান্টাইনের দল নেলসন বনাম মাটিওন্সের দল এ ব্রমলি খেলাটির আকর্ষনেই বোধ হয় অনেকে টেষ্ট খেলা দেখতে আসেনি, এমন মন্তব্য করেছিলেন জার্ডিন।

তবে অন্য সব ছেড়ে টেষ্ট দেখতে যারা এসেছিলেন, তাদের অনুশোচনা করতে হয়নি। সূচনা অবশ্য আমাদের শুভ হয়নি। টসে জিতে আমাদের অধিনায়ক সহজ সুন্দর উইকেটে ইনিংস সূচনা করতে মার্চেন্টকে ও আমাকে পাঠালেন। আমাদের দুজনের প্রথম জুড়িতে খেলবার প্রথম প্রয়াসে মাত্র ১৮ রান তুলতে সক্ষম হয়েছিল। গোভারের বলে তিন রান করার পর মার্চেন্টের ক্যাচ ফেলা হল, আমার ফাঁড়া কাটলো ছ রানে। তার জন্য ইংল্যাণ্ডের বিশেষ ক্ষতি হয়নি। ক্ষতি হয়েছিল গোভারের। বেচারি জীবনের প্রথম টেষ্ট ম্যাচে ৩৫ ওভার বল করে একটিও উইকেট পেলেন না।

আমি অদ্ভুত ভাবে রান আউট হলাম। মার্চেন্ট গোভারকে সোজা ড্রাইভ মারতেই বলটা আমার ব্যাটে লাগলো। স্বভাবমত আমি ওপাশে হিটের সঙ্গে সঙ্গে রানের জন্য ক্রীজ থেকে বেরিয়ে গিয়েছি, আমার ব্যাটে লেগে বল ছিটকে গেল মিড-অনে ফ্যাক-এর হাতে, ফ্যাক খটাং করে স্টাম্পে মেরে দিতেই আমার আয়ু খতম। একান্ত দুর্ভাগ্য বলে অধিকাংশ সংবাদ পত্র মন্তব্য করেছিল। ম্যার্চেন্টকে অতি ক্ষিপ্রতা সহকারে হ্যামণ্ড ক্যাচ নিলেন। চতুর্থ উইকেট যখন পড়লো, মোট রান ১০০, পরিস্থিতি মোটেই সুখের নয়। উজীর আলি ও রামস্বামী দৃঢ়তা সহকারে ৬১ রান যোগ করলেন। কিন্তু তারপর ল্যাজের দিকের খেলোয়াড়দের ব্যর্থতায় ২০৩ এ ইনিংস শেষ।

দর্শকদের ক্ষতিপূরণ হল ইংল্যাণ্ডের ব্যাটিং দেখে। মাত্র বার রানে

গিম্বলেট নিসারের বলে বোল্ড হলেও তারপর শক্ত হাতে হাল ধরলেন হ্যামণ্ড। কি অনবদ্য খেলা, যেন কোন প্রয়াস নেই, অথচ বল ছুটছে এদিকে ওদিকে। দলের রান ২৭৩-এ উঠিয়ে এবং নিজে ১৮৭ করে সি কে নু বলে বোল্ড হলেন হ্যামণ্ড। অ্যাশেষ-এর লড়াই-এঅস্ট্রেলিয়া যাত্রার প্রাক্কালে ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানের ফর্ম ফিরে পাওয়ায় সকলেই আনন্দিত হল।

১৯০ মিনিটে ১৮৭ রান, তার মধ্যে ফ্যাগ (৩৯) -এর সঙ্গে দ্বিতীয় জুড়িতে উঠলো ১৩৪, মাত্র ৯৫ মিনিটের খেলায়। টেষ্টে নবাগত টি এন ওয়ার্দিটন মাধুর্য না দেখালেও দৃঢ়তা দেখিয়ে হামণ্ডের সঙ্গে জুড়িতে ১২৭ রান তুললেন। অবশ্য দুজনের ক্রীড়াশৈলিতে অনেক তফাৎ, একজনের হাত থেকে বের হল 'সহজ ছন্দ, অন্যের হাতে শ্রম সাধ্য গদ্য'।

স্নো হাউস্টাফ আর একবার প্রমান দিলেন যে ইংল্যাণ্ডের উঠতি খেলোয়াড়দের মধ্যে তারই সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। প্রথম দিনের শেষে তাঁর রান ৫০, ওয়ার্দিটনের ৮১। পরদিন ছরান যোগ করেই ওয়ার্দিটন আউট, মোট ৭৫ মিনিটের খেলায় ৯৬ রান করলেন হাউস্টাফ। ব্যাটিং-এর মহোৎসব তারপরও সমানে চললো। অষ্টম উইকেটে রবিনস ও ভেরিটি ৭০ মিনিটে ১৩৯ রান যোগ করলেন। আট উইকেটে ৫৭১ রান করে ইনিংস ডিক্লেয়ার করতে আমাদের নাজেহালী বোলারেরা বেধড়ক মারের হাত থেকে পরিত্রাণ পেল। সওয়া ছঘণ্টার খেলায় ঘণ্টায় গড়ে ৯১ রান।

২৬৮ রানের ঘাটতি পুরোনো আর এভারেষ্ট শৃঙ্গে আরোহণ একই কথা। কিন্তু তার জন্য আমরা মুষড়ে পড়িনি। ক্রিকেটে দায়িত্বজ্ঞান বর্জিত নাবালক শিশু বলে বর্ণিত আমরা এভারেষ্টে উঠবার স্বপ্ন কেনই বা দেখব না? মার্চেন্ট যখন অ্যালেন-এর বোলিং-এর মুখোমুখী হলেন অচিরেই প্রমাণ করলেন যে ব্যাটিং-এর প্রাধান্য ঠিকই বজায় থাকবে। আমিও মার্চেন্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চললাম। আত্মবিশ্বাস ভরা ও বোলিংকে গ্রাহ্য না করা স্ট্রোক খেলে বিশ মিনিটে ২৫ রান তুললাম আমরা। গোভারের বলে আমার একটি কভার ড্রাইভ সম্বন্ধে লেখা হল 'যেন ঘাসের গা বেয়ে একটা আলোর রশ্মি ছুটে চলে গেল।'

মাত্র ৪০ মিনিটে ৫০ রান পূর্ণ হয়ে গেল। 'কোন কোন কাটের ফেনিল উচ্ছলতা,' সংবাদপত্রের মত আমার মনে নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল, নইলে অ্যালেনের বল পিটোবার জন্য ক্রীজ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে মিস করলাম কেন?

মার্চেণ্ট এগিয়ে এসে আমাকে সাবধান করে দিলেন। তাঁর নিজের স্ট্রোক আমার চেয়ে অনেক বেশী সুবিচারসম্পন্ন, প্রতিটি মার অনবদ্য, শান্ত চিত্তে দৃঢ় উদ্দেশ্য চালিত। এক সময় মনে হল ইংল্যাণ্ড আক্রমণ বিভাগ একেবারেই দিশেহারা, উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে চলেছে, কেউ কারো সহযোগিতা পাচ্ছে না। একঘণ্টা পার হতে ইনিংসের প্রথম ওভার এল ভেরিটির হাত থেকে। ডাকোয়ার্থ মাঝে মাঝে উচ্চ কণ্ঠে আউটের আবেদন জানিয়েও দলের মধ্যে নৈতিক বল জাগাতে ব্যর্থ হলেন। অ্যালেন এর এক ওভারে আমি ১৫ রান নিলাম, সবচেয়ে বেশী দর্শক-উল্লাস জাগছিল আমার হুক ও পুল স্ট্রোকে। আমার সূক্ষ্ম কব্জি চালনা প্রসঙ্গে মন্তব্য হল, ওর হাতে নিশ্চয়ই বল-বেয়ারিং কব্জি আছে।

পাঁচজন বোলার খেটে খেটে হিমশিম খাওয়ার পরে এবার বল দেওয়া হল হ্যামণ্ডকে, সুন্দর লেংথ রক্ষা করে চললেন তিনি। ওদিকে ভেরিটিকে পরপর দুটি চার মেরে আমি আমার নিজস্ব ৫০ রান পূর্ণ করলাম, আর ৮০ মিনিটে দলের রান ১০০ উঠলো। ক্রিকেটের ফেনিল সুরা ততক্ষণে আমার মন নেশায় ভরে দিয়েছে, এমন কি স্থির বুদ্ধি মার্চেণ্ট পর্যন্ত একটাও মারবার বল ছেড়ে দিতে নারাজ। ইংল্যাণ্ডের দলের খেলোয়াড়রা রানের বন্যা রুখতে না পেরে বিব্রত, কিন্তু আমাদের খেলা তাঁরা পূর্ণ ভাবেই উপভোগ করেছিলেন। তাদের চেষ্টা ছিল যদি কোন বোলার একটা বে-রান বা মেডন ওভার পেতে পারেন। ভরসা হ্যামণ্ডের ওপরই বেশী। অ্যালেন বলের বেগ যত বাড়ান আর বল অফ্‌স্টাম্পের বাইরে পড়ে, তত জোরে লেগে টেনে এনে আমি চারের পর চার হাঁকড়িয়ে চলি।

মার্চেণ্টকে কথা দিয়েছিলাম আবেগ সংযত করে খেলবো। কিন্তু তার মধ্যেও মাঝে মাঝে লোভ দমন করতে পারছিলাম না। নব্বুই-এর মুখোমুখি এসেছি, এমন সময় হ্যামণ্ড এগিয়ে এসে আমায় বললেন: একটু সাম্‌লে খেল বাপু, আগে শতরান পূর্ণ করে নাও'। দিনের খেলা শেষ হবার মিনিট কয় আগেই আমার শতরান পূর্ণ হল। সমগ্র জীবন যেন একটি দিনের মধ্যে জমাট বেঁধে গেল। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে টেষ্ট সেঞ্চুরী করতে পারায় আমার জীবনের পরমতম উচ্চাকাঙ্খা তো পূর্ণ হলই, ভারতীয় ক্রিকেটেও প্রবল প্রেরণা সঞ্চারিত হল। আমি দম্ভ প্রকাশের অপবাদ সহ্য করেও না বলে পারছি না যে ইংল্যাণ্ডে যাঁরা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটারদের উন্নততম নৈপুণ্যের অনেক

খেলা দেখেছেন, তাঁদেরও মধ্যে আজ পর্যন্ত আমার সেদিনের খেলার সৌন্দর্য সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত আলোচনা চলে। খেলা যখন সেদিনের মত শেষ হল, তখনও আমরা দুজন আউট না হয়ে আছি। আমার রান ১০৬, মার্চেণ্টের ৭৯।

প্যাভিলিয়ানে ফিরে আসবার পথে সারাক্ষণ হাততালি, সমগ্র জনতা দাঁড়িয়ে উঠে অভিনন্দন জানিয়েছে। অনেকেই ড্রেসিং রুমে এসে আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন ; সি বি ফ্রাই, স্যর পেলহাম ওয়ার্নার, জ্যাক হব্স, ডি আর জার্ডিন। ক্রিকেটের দেবতারাই যেন আমায় আশীর্বাদ জানাতে সশরীরে মর্তে নেমে এসেছেন। "তোমার এই ইনিংসে দেখলে রঞ্জি সবচেয়ে খুশী হতেন," বললেন ফ্রাই। হবস বললেন : 'একদিন আমি ইডেন গার্ডেনস-এ বোলিং-এর জন্য তোমাকে পুরস্কার দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমার আজকের ব্যাটিং-এর জন্য যে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার আমি দিলাম তোমাকে, তা হল আমার মনের অপরিসীম আনন্দ।

মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি ওল্ড ট্রাফোর্ডের অতি বৃদ্ধ মালী এগিয়ে এল আমার দিকে, আমার হাতে তুলে দিল একটা ছ পেনি মুদ্রা, কি সব যেন খোদাই করে লেখা রয়েছে তার মধ্যে। বললে আমার মনোহরণ ব্যাটিং দেখে ও যে আনন্দ পেয়েছে তার জন্য ওটি উপহার দিচ্ছে সে আমাকে। মুখময় প্রসন্নতা বিকশিত করে সে জানালো যে আরো দুজনকে সে অনুরূপ উপহার দিয়েছে, তাঁদের একজন কুমার শ্রী দলীপ সিংজী, অপরজন ডন ব্র্যাডম্যান। একজন অতি সাধারণ মানুষ, ক্রিকেট ভালবাসতো, ছিল প্রকৃত গুণগ্রাহী, তার মনে একদিনের রসোচ্ছ্বাস জাগিয়েছিলাম বলে একটি সাধারণ উপহারে অসাধারণদের সঙ্গে একসূত্রে সে গেঁথে দিয়ে গেছে আমায়, সেই স্মারকটি আজও সযত্নে ও সগর্বে রক্ষা করে চলেছি।

পরে অবশ্য অনেকের অভিনন্দন পেয়েছিলাম। তবে প্রথম জানিয়েছিলেন মার্চেণ্ট প্যাভিলিয়ানে ফিরবার পথে। দলের অধিনায়ক মহারাজকুমার সঙ্গে সঙ্গে একটি সোনার হাতঘড়ি উপহার দিলেন। কিন্তু আমার কৃত্যে সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছিলেন সি কে নাইডু। অব্যক্ত ভাষায় তাঁর বক্তব্য আমি বুঝতে পারছিলাম : আমি জানতাম তুমি পারবে। পরদিন সমগ্র ব্রিটেনের সব সংবাদ পত্র ঐক্যতানে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো। ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে খ্যাত ক্রিকেটার নেভিল কার্ডাস লিখলেন :

"এই খেলার সর্বশেষ হাসিটুকু বোধ হয় ভারতীয়দেরই প্রাপ্য। আজ (পরের দিন এবং তিনদিনের খেলার শেষ দিন) এমন কিছুই ঘটতে পারে না যা বিনা উইকেটে ১৯০ রানের কৌতুককে ছাপিয়ে যেতে পারবে"। আমার সম্পর্কে তিনি লিখলেন: মাঝে মাঝে মুশতাখের খেলায় মনীষী সুলভ কল্পনা শক্তির স্পর্শ পাওয়া গেছে। একটা কমনীয়তাও সহজ সৌন্দর্য তাঁর শক্তিকে গোপন করে রেখেছিল, জ্বলন্ত চোখও খরনখর সম্পন্ন আরণ্য। সৌন্দর্য যেভাবে শ্বাপদের মসৃণ চিক্কনতার আড়ালে গোপন থাকে।'

সারা রাত ধরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। তার দলে ইংল্যাণ্ডের স্পিন বোলার ভেরিটি ও রবিন্‌স্ পরদিন খেলা আরম্ভ হতেই পিচকে জীবন্ত করে তুললেন। মার্চেণ্টের পরামর্শে এবং নিরাপদে খেলবার স্বকীয় সিদ্ধান্তে সাবধানে খেলা শুরু করলাম এবং অচিরেই দুশ ছাড়িয়ে গেলাম। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ইনিংস সূচনাকারী দুই ব্যাটসম্যানে মিলে দুশো রান তোলার প্রথম কৃতিত্ব আমাদের। মাত্র তিন রান যোগ হতেই আমাদের প্রথম ইনিংসের মোট রান সংখ্যা ধরে ফেললাম আমরা, কিন্তু তার পরই জুড়ি গেল ভেঙ্গে আমার এক প্রচণ্ড শটে বোলার রবিনস-এর হাতে শেঁটে গেল। আগের দিনের ১০৬ রানের সঙ্গে ততক্ষণে আর মাত্র ছ রান যোগ হয়েছে আমার।

আমার নিজের শত রান পুরেছে বলে যারপর নাই খুশীতে ভরে আছে মন, তবু দুশ্চিন্তা রইল মার্চেণ্টের শত রান পুরবে তো। সি কের আগেই এলেন রামস্বামী। ক্রিকেট তখনকার মত নীরব নিষ্প্রাণ। শত রান পুরোবার দুশ্চিন্তার ফলে ১২ রান সংগ্রহ করতে একঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন মার্চেণ্ট। তাঁর ৯২র মাথায় স্লিপে ক্যাচ দিলেন। তবু শত রান পুরলো, সওয়া তিন ঘণ্টা খেলার ফসল। ওপেনিং ব্যাটসম্যান দুজনেই দুখানা সেঞ্চুরি। কোন বিদেশী ব্যাটসম্যানের পক্ষে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে সে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বহু বছর পরে, ১৯৬৪ সালে, যখন ওল্ড ট্রাফোর্ডের মাঠেই লরি (১০৫) ও সিম্পসন (১১১) রান করলেন। আমাদের ২০৩ রানে প্রথম জুড়ি রেকর্ডও লরী-সিম্পসনই ভেঙেছেন এই সেদিন, অ্যাডিলেডের মাঠে ২৪৪ করেছেন ওরা।

রামস্বামী ও উজীর আলি আউট হতেই একত্র হলেন সি কে ও অমর সিং, খেলার রস টগবগিয়ে উঠলো, ৪০ মিনিটে যোগ হল ৭৫ রান। খেলা যখন আলোর স্বল্পতার জন্য অসময়ে সাঙ্গ হল তখন আমাদের রান উঠেছে পাঁচ উইকেটে ৩৯০। অতএব দ্বিতীয় টেষ্ট অমীমাংসিত।

ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে 'ক্রিকেটার' মন্তব্য করলেন :

আলোর স্বল্পতাই হয়তো গতকাল ভারতকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, এক্ষেত্রে প্রকৃতি যোগ্যতর সাহসী দলের পক্ষ নিয়েছিল বলা যায়। এই খেলায় ভাগ্য দেবী মোটামুটি ভারতীয়দের প্রতিই প্রসন্নতা দেখিয়েছেন। তাদের ব্যাটসম্যানেরা দ্বিতীয় দিনে প্রমাণ দিয়েছেন শুকনো উইকেটে কি উৎকর্ষ তাঁরা দেখাতে পারেন। তবু তিন দিনের মধ্যে যে দুবার কিছুক্ষণ মাটির নীচে আর্দ্রতা ছিল সেই সময়টুকু ভারতীয়দেরই ব্যাট করতে হয়েছে। তিনি আরো বললেন : এই খেলায় ভারতীয় ব্যাটিং ক্রিকেটের সৌন্দর্যময় সত্তাকে প্রাণ ভরে অঞ্জলি দিয়েছে, ক্রিকেটের শিল্প সত্তাকে, তার স্বকীয়তাকে। ওদের মধ্যে কি করে রঞ্জির উদ্ভব হয় তা আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি। ওই দলের দক্ষ ব্যাটসম্যানেরা প্রত্যেকেই কোন না কোন সময় এমন স্ট্রোক দেখিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছেন যে স্ট্রোক পাশ্চাত্য জগতের বিজ্ঞান সম্পন্ন সুবিচারনিষ্ঠ ছন্দ বিহীন খেলায় কখনো সম্ভব হয় না।'

মার্চেন্ট সম্বন্ধে তিনি লিখলেন : পদ্ধতি বিচারে তিনি ভারতের ইয়োরোপীয় খেলোয়াড়। কি সুসংগঠিত তাঁর খেলা, প্রতিটি স্ট্রোক ভেবে চিন্তে মারেন, স্বতোৎসারিত স্ট্রোকে খেলেন না। উইকেটের চারদিকে জোরের সঙ্গে বল পাঠান, কিন্তু বোলিং-এর উপর প্রভুত্বে জোরে বোলিং-এর দাসত্ব করেন না। কোন বল কোন দিকে মারবেন নিমেষে তা বিজ্ঞতা সহকারে স্থির করেন, আবেগের দ্বারা চালিত হন না। তাঁর খেলায় আন্তর্জাতিক উৎকর্ষের ছাপ স্পষ্ট, যে ধরণের ব্যাটসম্যানকে দিয়ে অষ্ট্রেলিয়ার বা ইংল্যাণ্ডের ইনিংসের দৃঢ় ভিত্তি রচনা করা চলে। কেবল দৃঢ়তাই নয় সে খেলায় সুপরিকল্পিত কৌশল, এবং তা স্বকীয়তায় বিশিষ্ট। অন্য পত্রিকায় মন্তব্য ছিল : মার্চেন্ট যদি ইংরেজ হতেন তবে নির্বাচক সমিতির কঠিনতম সমস্যা সমাধান হয়ে যেত। সে সমস্যা অষ্ট্রেলিয়ান সফরের জন্য এক নম্বর ব্যাটসম্যান নির্বাচন, সে ব্যাটসম্যান কেবল নিরাপদ রক্ষণাত্মক খেলায় দক্ষ হলে চলবে না, বিপক্ষের বোলিং-এর সঙ্গে ঠিকমত মোকাবিলা করবে। তৃতীয় এক সমালোচকের মতে মার্চেন্টের প্রতিটি মার এমন সুপরিমিত, একেবারে মাপা মার, 'লক্ষ্য করলে হয়তো দেখা যাবে তাঁর পকেট থেকে মাপের ইঞ্চিকাঠের মাথাটা উঁকি মারছে'। অপূর্ব খেলেও ভারতীয়রা কেন ম্যাচ জিততে পারছে না এই প্রসঙ্গে 'ক্রিকেটার' এক স্মরণীয় মন্তব্য

করলেন, বললেন 'এই সর্বাধিক মাধুর্যমণ্ডিত খেলাটিতে উৎকর্ষ পরিমাপের জন্ম অন্য কোন পদ্ধতি বার করা উচিত, স্কোর বোর্ডটা ভারবাহী গর্দভ বিশেষ'।

'ক্রিকেট ম্যাচের নিষ্পত্তি যদি স্কোর বোর্ডের অঙ্ক দিয়ে না হত, যে কটি মুহূর্তে কল্পনাকে মুক্তপথ বিহঙ্গের মত স্বাধীন বিচরণের সুযোগ পায়, তাই দিয়ে হত, তা হলে ভারতীয়রা নিম্নমানের ক্রিকেটার বলে গণ্য হত না। ক্রিকেটে যে জিনিসটির একান্ত অভাব রয়েছে তাই এনে দিয়েছে ভারতীয়রা। অসাধারণ মনীষী না হলে কোন ইংরেজের পক্ষে ক্রিকেটকে সেই গুনে মণ্ডিত করা সম্ভব নয়। এক ধরণের স্বতোৎসারিত রূপ, দেহ ও ব্যাট চালনায় দ্রুতান্বিত রেখা ও ছন্দ, কব্জির সুক্ষ্ম কৌশলে হঠাৎ সৌন্দর্য সৃষ্টি ও আনন্দ বিচ্ছুরণ, হিসেব কষা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যা হয় না। হাজার হাজার দর্শকের আনন্দ বিধান করেছে এমন একটি খেলা ওল্ড ট্রাফোর্ডে বহুদিন যাবৎ দেখা যায়নি। ভারতীয়রা নিজেরাই শুধু শিল্পী নন, অন্যের মধ্যে শিল্পীসত্বা জাগিয়ে তুলতেও তাঁরা সক্ষম। সোমবার ইংল্যাণ্ড যা ব্যাটিং করেছে, মনে হয় তাদের কৃষ্ণাঙ্গ বিপক্ষীয়দের কাছ থেকে কল্পনা শক্তি আহরণ করে খেলেছে।'

পরবর্তী একটি সমীক্ষায় তিনি লিখলেন: আগামী শনিবার ল্যাঙ্কাশায়ার বনাম ইয়র্কশায়ার খেলাটি ওল্ড ট্রাফোর্ডকে সুবুদ্ধির জগতে ফিরিয়ে আনবে। ভারতীয়রা আমাদের অনেক উর্ধে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, পাঠিয়ে দিয়েছিল, যেন ম্যাজিক কার্পেটে বসিয়ে এবং সৌন্দর্যের জগতে পৌছে দিয়েছিল। মুশতাক আলি ও অমর সিং ভুল পাঠ্য পুস্তক মেনে চলেছেন, বহুদিন পূর্বে লেখা ও ছাপা এবং পোকা পড়া বই মেনে খেলেছেন তাঁরা। যে যুগের বই ওটা সে যুগে ব্যাটসম্যানেরা বুকতোলা ব্যাটিং করা কি কঠিন ও জটিল ব্যাপার, যে বলটা দেখে মনে হয় সোজাসুজি চলে আসছে তার মধ্যে দোলা ও ঘুর্ণির কত সুক্ষ্ম প্যাচ যে রয়েছে তাও সে যুগের ব্যাটসম্যানদের অগোচর ছিল।'

'সোমবার অপরাহ্নে মার্চেণ্ট ও মুশতাক যখন ব্যাট করতে নামেন, তাঁরা জানেন ভারত কি মারাত্মক পিছিয়ে আছে, দাঁড়িয়ে আছে পরাজয়ের মুখোমুখী। খেলাটি হয়েছিল প্রচলিত এবং সবার জানা অনু...রে, যে আইনে দশটি অনুচ্ছেদে লেখা আছে ব্যাটসম্যান কি ভাবে আউট হতে পারে। মুশতাক, মার্চেণ্ট, অমরসিং, রামস্বামী, সি কে নাইডু সাংঘাতিক বিরূপ পরিবেশে ব্যাট করেছেন, উদ্ধত ব্যাটসম্যানদের ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ বোলারদের সামনে থেকে

ছুটিয়ে দেবার জন্য এক ডজন নতুন আইন সম্পর্কে অবহিত হয়েই যেন খেলেছেন তাঁরা। ব্যাটসম্যানেরা যদি সবসময়ই উইকেটের নিরাপদ পাদদেশে দাঁড়িয়ে বলটাকে অতি সাবধানে ঠেকা ও ঠেলাই শুধু দিতেন, তাহলে ক্রিকেট খেলাটি সিডনি, বম্বে, ট্রিনিদাদ, কেপটাউন প্রভৃতি দূর দূরান্তরে কোনদিন ছড়িয়ে পড়তো না'।

এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা যে আমরা পেয়েছিলাম তাও আমাদের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানকে বাদ দিয়ে। ব্যাটে বলে এবং ফিল্ডিং-এ অমর নাথের কৃতিত্ব তখন সকলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করছে, সেই অমর নাথ প্রথম টেষ্ট খেলার সময় জাহাজে করে ভারতে, ফিরে চলেছেন। সে বিষয় আমি পরে আলোচনা করবো।

আমার নিজের কথা ভেবে আমি ম্যাঞ্চেস্টারের দ্বিতীয় টেষ্টই প্রথমে আলোচনা করেছি। এবার আসি প্রথম টেষ্টে।

লর্ডস মাঠে প্রথম টেষ্টে এবং ওভাল মাঠে তৃতীয় টেষ্টে আমরা ৯' উইকেটে পরাজিত হয়েছি, কিন্তু কোথাও বে-ইজ্জত হইনি। দুটি খেলাতেই মাঝে মাঝে আমাদের গর্ব করবার মত অবস্থা ঘটেছে অনেকবার।

প্রথম টেস্টের প্রাক্কালে ডি, আর জার্ডিন লিখলেন, "কাউন্টির বিরুদ্ধে খেলা দিয়ে যাঁরা ভারতীয় দলের মূল্যায়ন করবেন, তাঁদের হয়তো শেষ পর্যন্ত বিস্ময়বরণ করতে হবে। দলীপসিংজী ও পতৌদীর নবাব যদি ওদের দলে থাকতেন তবে শক্তির বিচারে ওদেরই রাবার জেতার কথা। টেস্টের আগে ওরা সেরা খেলোয়াড়দের বিশ্রাম দিয়েছেন তাছাড়া অমর সিং, জাহাঙ্গীরখান ও দিলাওয়ার হোসেনকে ওরা পাচ্ছেন, কাজেই ইংল্যাণ্ডের নির্বাচক সমিতি যেন দল গঠনে পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রলোভন বোধ না করেন।" টেস্ট ম্যাচ ও লর্ডস সম্পর্কে ভারতীয়দের অকারণ ভীতিগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই, মন্তব্য করলেন জার্ডিন এবং সেই সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের জনগণের মনোভাবের নিন্দা করলেন, তিনি বললেন, নতুন এল বি আইন জোর করে ভারতীয়দের উপর চাপানো হয়েছে, হয় মেনে নাও, না হলে আসতে হবে না, এই মনোভাব খুবই অন্যায়। যে উদার মানসিকতার সঙ্গে ভারতীয়রা আমাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রস্তাবে রাজি হয়েছে, তার জন্য আমাদের বরং কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত।"

পতৌদীর নবাবের দলভুক্তি জার্ডিনের কল্পনা প্রসূত কিছু নয়। ভারতে

থাকতেই অধিনায়ক পদে নির্বাচন থেকে তিনি সরে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু তিনি দলভুক্ত হতে পারেন এমন শোনা গিয়েছিল। ২৫ জুন তারিখে রয়টারের রিপোর্টে বলা হল, "পতৌদীর নবাব ইংল্যাণ্ডে এসে পৌঁছানো মাত্রই তাঁকে ভারতীয় দলভুক্ত করার চেষ্টা হবে এবং সেই কারণেই আজও দলের নাম ঘোষণা করা হয়নি, অথচ খেলাটি পরশু হবে। কথা হচ্ছে বোধ হয় সি, কে, নায়ডুকে টেস্টে অধিনায়ক নিয়োগ করা হবে।"

নবাবের ব্যাপারটি কি হল আমি জানি না, তবে নায়ডু টেস্টে অধিনায়ক হবেন এই কল্পনা যে একেবারে ভিত্তিহীন তা সবারই জানা আছে। বস্তুত মার্চেন্ট যখন দলপতি মহারাজকুমার ও ম্যানেজার ব্রিটেন-জোনস-এর কাছে নায়ডুকে টেস্টের অধিনায়ক নিয়োগের জন্য খোলাখুলি প্রস্তাব করেন, তখন থেকে দলের মধ্যে মন কষাকষি আরো বেড়ে যায়।

পতৌদীকে নেওয়া হোক আর নাই হোক, এমন কি গৃহাভিমুখীন অমরনাথকে বাদ দিয়ে যে দল ভারতের পক্ষে নামানো সম্ভব হয়েছিল, শক্তিতে তা ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সমানে যুঝবার যোগ্য।

আগের রাত সারাক্ষণ বৃষ্টি হয়েছে। উইকেট বেশ নরম, সেই অবস্থায় অ্যালেন টসে জিতে আমাদের ব্যাট করতে পাঠালেন। মার্চেন্ট ও হিণ্ডেলকার যখন ইনিংস সূচনা করলেন তখন মাঠে প্রচুর জনসমাগম না থাকলেও উদ্দীপনার অভাব নেই।

কনকনে শীতে আমাদের আঙুলগুলি অসাড় হয়ে আছে, দুটো সয়েটার গায়ে দিয়েও ঠকঠক করে কাঁপছি। ভেরিটিকে অনবদ্য গ্লাইড মারলেন মার্চেন্ট। ৬২ মিনিটের খেলায় ৫১ রান উঠলো। এরপর ১১ রান যোগ হতেই মার্চেন্টকে বিদায় নিতে হল, বোল্ড আউট। এবার আমার পালা। মাত্র দশ দিন আগে এই মাঠেই মাইনর কাউন্টিজের বিরুদ্ধে আমার খেলার কথা মনে পড়তেই উদ্বুদ্ধ হলাম। কিন্তু ওভারের শেষ বলেই ফাইন লেগে মারতে গিয়ে ব্যাকোয়ার্ড শর্ট লেগে ল্যাংগ্রিজের হাতে ধরা পড়লাম, একেবারে শূন্য হাতেই ফিরে যেতে হল।

মন খুব খারাপ হয়ে গেল, তবু মনে আশা রাখলাম, আর সবাই ভালো খেলে দলের মর্যাদা যদি রক্ষিত হয়। কিন্তু পরবর্তী তিন ওভারের মধ্যে হিণ্ডেলকার ও নাইডু আউট হয়ে গেলেন। বিপর্যয় আর রোধ করা গেল না। মাত্র ১৪৭ রান সব শেষ হয়ে গেল।

ইনিংসের গোড়ার দিকে ইংল্যাণ্ডও ভয়ে ভয়েই খেললো। উইকেটের ততক্ষণে অনেক উন্নতি হয়েছে। অমর সিং অনবদ্য লেংথে বল ফেলছেন, তাছাড়াও দুদিকে দুলিয়ে ছাড়ছেন বল, মাত্র ১৩ ওভারে নয় রান দিয়ে চারটি উইকেট পেলেন তিনি। মাত্র ৪২ রানে ইংল্যাণ্ডের অর্ধেক ব্যাটসম্যান প্যাভিলিয়ানে ফেরত। দুই ন্যাটা ব্যাটসম্যান লেল্যাণ্ড ও লাংগ্রিজ মিলে কিছু রান তুললেন, তবু দিবাশেষে দেখা খেলা তখনও প্রথম ইনিংসে ১৫ রানের ঘাটতি রয়েছে, যদিও হাতে তিনটি উইকেট।

পরদিন প্রবল বর্ষণের ফলে অপরাহ্নের আগে কোন খেলা সম্ভব হল না। জার্ডিনের বর্ণনামত "দুপুর নাগাত লর্ডস মাঠের বিধ্বস্ত চেহারা, এখানে সেখানে ফেল্ট ও ম্যাটিং-এর তালি মারা রয়েছে জল শুকোবার চেষ্টায়।" সারা সকাল বৃষ্টি হয়েছে। ব্যাটসম্যান ও বোলারদের পদক্ষেপের স্থানটুকুই শুধু ঢেকে রাখা হয়েছিল।

আমাদের সকলেরই বসে বসে ক্লান্তি এসে গেছে, কিছুই ভালো লাগছেনা। ইংল্যাণ্ডে আমরা সবে এসেছি, বলার মত গল্প কিছু নেই, যাদের আছে তাদেরও তা বলার উৎসাহ নেই। আর কথার রসে মজিয়ে রাখার এমন কেউ ছিল না আমাদের মধ্যে।

শেষ পর্যন্ত খেলা আরম্ভ হল, উনিশটি বলে নব পতম, যোগ হল মাত্র দুরান শেষ ব্যাটসম্যান ডাকোয়ার্থ যখন ক্যাচ আউট হলেন ইংল্যাণ্ড তখনো ১৩ রান আমাদের থেকে পিছিয়ে আছে।

হিণ্ডেলকার দেখতে ছোট খাটো মানুষটি কিন্তু মনে সিংহের বল, নইলে সারাক্ষণ উইকেট কীপিং করার পরেই ভাঙা আঙুল নিয়ে ব্যাটিং করতে যাওয়া কি ভাবে সম্ভব হয়। দ্বিতীয় দিনে ল্যাংগ্রিজের একটা মার ওর আঙুলে ছিটকে গিয়ে আঘাত করেছিল, কিন্তু তার জন্য একটু কালও কর্তব্য থেকে সরে দাঁড়াননি হিণ্ডেলকার।

মাঠের জল শুকিয়ে নেবার নকল পদ্ধতি সম্পর্কিত যে নতুন আইন তা নিয়ে মতভেদের ফলে অনেক সময় কেটে গেল। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হবার আগে এই প্রথম ইংল্যাণ্ড কম্বলের সাহায্যে উইকেটের জল শুষে নেবার ব্যবস্থা। সে উইকেটে আমাদের কি হাল হবে অনুমান করতে পারছিলাম। বলটা পিচ পড়ে ছিটকে যাচ্ছিল এদিকে ওদিকে। কখনো অল্প উঁচুতে, কখনো বা বেশ উঁচুতে উঠছিল। এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে ডাকোয়ার্থ

কোন রান হবার আগেই আমাদের প্রথম জুড়ি ভেঙ্গে দিলেন। অ্যালেনের একটা লেগে সাইডের বল তাড়া করলেন মার্চেন্ট, আর সঙ্গে সঙ্গে ডাকোয়ার্থ বাঁদিকে গজ দুই ঝাঁপিয়ে পড়ে মাটি থেকে বলটা লুফে নিলেন। এর পর আঠার রানের মাথায় নতুন এলবি আইনে আমি আউট হলাম। ইংল্যাণ্ডের বোলার অধিনায়ক নরম মাটিতে বলের গতি বাড়িয়ে নিয়ে আমাদের যথেষ্ট বিব্রত করলেন, প্রথম আট ওভারে তাঁরই বলে আমাদের চার উইকেট পড়ে গেল। এত বড় ধাক্কা আর আমরা সামলাতে পারলাম না। বৃষ্টির জন্য অল্পক্ষণ খেলা বন্ধ রইল কিন্তু তারপরেই মাত্র ৯৩ রানে সব শেষ হয়ে গেল। তিন ন্যাটা খেলোয়াড় মিলে যবনিকা ফেললেন, প্যালিয়া ভেরিটির বল মিড-অফে মারতেই লেঙ্গ্যাণ্ড ক্যাচ ধরলেন।

পিচের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনাও আমাদেরই মতনই হল, মিচেল নিশারের বলে মার্চেন্টের হাতে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে যখন ধরা পড়লেন, তখনো কোন রান ওঠেনি। অমর সিং-এর বলে লিম্বলেটকে তিনবার মিস করার পরে টেস্টে নবাগত টার্ণবুলকে নিয়ে লিম্বলেটই ন'উইকেটে ম্যাচ জিতে দিলেন।

ওভালের তৃতীয় টেষ্টে বৃষ্টিতে নয় ঝড়ে পড়ে গেলাম আমরা, সে ঝড় অবশ্য হ্যামণ্ড ব্যাট দিয়ে তুলেছিলেন, অবশ্য তাঁর ২১৭ রাণের মধ্যে কিছু উঠেছিল আমাদেরই ভুলত্রুটির ফলে। অমর সিং-এর অভিযোগ ছিল তার বলে তিন রানের মাথায় হ্যামণ্ড যে ক্যাচ তুলেছিলেন, সি কে তা ফেলে দিয়েছিলেন, কিন্তু সে অভিযোগ অমূলক কারণ শর্ট স্কোয়ার লেগে ফিল্ডিংরত নাইডুকে সে বল ধরতে হলে তাঁর রবারের বাহু থাকার দরকার ছিল, যাতে তা টেনে অনেক লম্বা করে নেওয়া যায়। ৯৬ রানের মাথায় হ্যামণ্ড সত্যি ক্যাচ তুলেছিলেন, কিন্তু ডীপ স্কোয়ার লেগে উজীর আলির চোখে রোদ পড়ায় ক্যাচটি তিনি ধরতে পারেন নি।

হ্যামণ্ড সহজ ও সাবলীলভাবে ক্রিকেট প্রচলিত সব রকম স্ট্রোক খেলে চললেন। অন-সাইডের খেলায় অসামান্য দক্ষতা দেখালেন, লং-অনে ড্রাইভ করলেন অনেকগুলি, ফাইন লেগের মারে অপূর্ব সময় জ্ঞানের পরিচয় দিলেন। হ্যামণ্ডের সঙ্গে সহযোগিতা করলেন ওয়ার্দিংটন। স্কোয়ার কাট, ড্রাইভ পুল, দু'জনের মারে মারে আমরা ছত্রখান। এই দুজনে মিলে চতুর্থ জুড়িতে ২৬৬ রান যোগ করলেন।

৪০০ রানের মাথায় তৃতীয় নতুন বল নেওয়া হল, এবার ওদের দুজনকেই সরাসরি বোল্ড করলেন নিসার। ওয়ার্দিংটনের নিজস্ব রান হল ১২৮। এই সময় ৯ ওভার বল করে নিসার ৪৬ রানের বিনিময়ে চারটি উইকেট নিয়েছেন। ফলে ৪ উইকেটে ৪২২ রান থেকে ৪৭৯ এ আট উইকেট হয়ে গেল। দিলওয়ার হোসেন তিন টেস্টে আমাদের দলের তৃতীয় উইকেট কীপার, অসাধ্যসাধন করলেন, অত বেশি রান সত্ত্বেও একটিও রান গললো না তাঁর হাত দিয়ে।

পরদিন নিষ্কলঙ্ক নীল আকাশে সোনার সূর্য দীপ্তিমান। শুরুতেই অ্যালেন ইনিংসের শেষ ঘোষণা করলেন। অ্যালেন ও ভোস-এর বলে মার্চেণ্ট ও আমি ইনিংস সূচনা করলাম। আমি প্রথম থেকেই অভ্যাস মত মেরে খেলতে লাগলাম। অ্যালেনের প্রথম ওভারের শেষ বলটি চারে পাঠালাম। অতি সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে পুল, হুক ও ড্রাইভ মেরে চললাম। প্রথম ২০ মিনিটে আমার ২৬ রান উঠে গেল তার মধ্যে ছ খানাই বাউণ্ডারি। শান্ত সমাহিত সাবধানী মার্চেণ্ট তখনকার মত রান তোলার ভার আমাকেই ছেড়ে দিয়েছিলেন।

ভেরিটির একটা ফুল টস লং অন সীমান্তে পাঠিয়ে মার্চেণ্ট দলের রান ৬০ তুলে দিলেন, পুরো ৬০ মিনিটের খেলায়। মার্চেণ্ট ধীর, স্থির কিন্তু আবেগ-প্রবণ আমি তেড়ে তেড়ে বল মারতে লাগলাম, কিন্তু ফিল্ডিং এমন কড়া যে এক এক রানের বেশি নিতে পারি না।

দ্রুত রান উঠছে, ব্যাটিং বোলিংকে কব্জায় এনে ফেলেছে। ওল্ড ট্রাফোর্ডের স্মৃতি বোধ ভয় জাগালো অ্যালেনের মনে। সহযোগিদের সঙ্গে মাঠের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা করে এবার অ্যালেন দুপাশে দুই স্লিপার দিয়ে আক্রমণ রচনা করলেন। সিমন ও ভেরিটির বলে আমিও ভেবে চিন্তে ব্যাট চালানো শুরু করলাম। তবু আমার নিজস্ব ৫০ রান উঠলো। ইংরেজ ক্রিকেট দর্শকরা করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করলো আমায়।

বেশিক্ষণ শান্তভাবে ব্যাট করা আমার স্বভাবে নেই। ভেরিটিকে তেড়ে মারতে গেলাম। একটা লেগব্রেক মারতে লাফিয়ে গিয়েই ব্যর্থ হলাম এবং তার জন্য চরম মূল্যই দিতে হল। ১৯৫০-৫১ সালে কমনওয়েলথ দলের ম্যানেজার জর্জ জাকোয়ার্থ কানপুরে আমায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, কিভাবে ওভালে তাঁর চতুর স্টাম্পিং-এর ফলেই আমি সেবারে দ্বিতীয় টেস্ট সেঞ্চুরি

থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম। এরপর ডাকোয়ার্থ যখন দিলওয়ারকের স্টাম্প করেন, আমাদের ইনিংসের পতন সেখানেই শুরু।

২৪৯ রান পিছিয়ে থাকার ফলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামতে হল। এবারও আমরা ইংল্যাণ্ড দলের ফাস্ট বোলিং-এর সঙ্গে টক্কর দিয়ে ব্যাট করেছি। অন সাইডে জোরালো স্ট্রোক আমার স্বাভাবিক খেলা। যেভাবে খেলতে লাগলাম, ভোসের তীব্রগতি বল আমার কাছে শ্লথ মনে হল, আর অ্যালেন তো উল্টে পাল্টেও কোনমতে সামাল দিতে পারছিলেন না। দুজন খেলোয়াড় কিছু জিমন্যাষ্টিক কসরতের শেষে হ্যামণ্ড ক্যাচ ধরে আমাকে আউট করলেন। অল্প পরেই যখন সুদূর লং-অনে মার্চেন্ট ক্যাচ আউট হলেন, দুর্ভাগ্য ঘনায়িত হল। চতুর্থ উইকেট পতনের পর যখন সি, কে এলেন, ইনিংস পরাজয় এড়াতে তখনো আমাদের ৯০ রান দরকার। অ্যালেনের একটা বাম্পার পুল করতে গিয়ে বুকে প্রবল চোট খেলেন সি, কে।

ওঃ বলে তিনি তখন বসে পড়লেন। তাঁর সে আর্তনাদ সারা মাঠময় শোনা গেল। কিন্তু কোন আঘাত গ্রাহ্য করবার মানুষ ছিলেন না তিনি। সঙ্গে সঙ্গে উঠে ব্যাট ধরলেন, আর কী বীরত্বপূর্ণ খেলাই যে খেললেন। ১৯২৬ সাল থেকে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা, অনেক মহনীয় ইনিংস তাঁকে খেলতে দেখেছি কিন্তু সেদিনের ৮১ রানের তুলনা পাইনি।

আঘাত লাগার পরই যেন নাইডু বীরত্বে পরিপূর্ণ উদ্ভাসিত হন এবং চিকিৎসকদের নির্দেশ গ্রাহ্য না করেই খেলেন। তাঁর এই চরিত্র চিরদিনের। একবার ইউ পির ফাষ্ট বোলারের বলে নাকে আঘাত পেয়ে ইন্দোরে চোখ ধাঁধানো মন মজানো সেঞ্চুরি করেছিলেন। একবার বম্বেতে রঞ্জি ট্রফি ফাইনালে দাতু ফাদকারের বাম্পারে তাঁর দুটো দাঁত পড়ে গেল। দরদর করে রক্ত পড়ছে, সেই অবস্থায় ডাক্তারের বারণ সত্ত্বেও তিনি খেলে চললেন এবং ৬৬ রান করলেন। নাইডুর বীরসত্তার এমন প্রকাশ অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি।

ওভাল টেষ্টের ৮১ রানে নাইডুর পক্ষে সফরের সহস্র রান পূর্ণ হল এবং দলের পক্ষে ইনিংস পরাজয় এড়ানো সম্ভব হল। ইংল্যাণ্ড ৯ উইকেটে জিতলো বটে, তবে তাদের দ্বিতীয়বার ব্যাট করতে নামতে হয়েছিল, এই আমাদের সান্ত্বনা।

যে দিন থেকে ক্রিকেট খেলছি সেদিন থেকেই ফিল্ডিং-এর গুরুত্ব সম্পর্কে

আমি সচেতন। ইংল্যাণ্ড যে আমাদের ছ দুবার ন' উইকেটে হারালো, তা কেবল ব্যাটসম্যানদের কৃতিত্বে সম্ভব হয়নি, অনবদ্য ফিল্ডিং-এ বোলারদের পূর্ণ সহায়তা করেছে দলের প্রত্যেকে।

৩৭ বছর আগেকার ঘটনার স্মৃতি ম্লান হয়ে গেছে, পুরানো কথা মনে করতে হলে স্মৃতি জাগাতে অনেক বেগ পেতে হয়, পুরানো সংবাদপত্রের সাহায্যও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু ওল্ড ট্রাফোর্ডে সেই দিনটির প্রতিটি ঘটনা আজও স্মৃতির পটে জ্বল জ্বল করছে, চিরদিনের বৃষ্টি প্যাচপেচে ম্যাঞ্চেস্টারের সেই বিশেষ দিনটির মতই ঝকমকে হয়ে আছে। ১৯৬৩ সালে মার্চেন্ট তার রচিত দলীপ সম্পর্কিত বইখানা আমাকে উপহার দেবার সময় তাতে লিখেছিলেন : আমার পার্টনারশিপের দলীপ-কে। সেই দিনটির কথা তিনিও যে ভুলতে পারেন নি তাই এতে প্রমান।

চৌদ্দ

সফর সমীক্ষা

১৯৩৬ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ইংল্যাণ্ড সফরের কথা মনে হলেই অনেক অপ্রিয় বিষয় বড় হয়ে দেখা দেয়। দলের মধ্যে বিচিত্র টানা পোড়েন এবং দলগত মনোভাবও প্রয়াসের অভাবেই আমাদের দলের সঠিক নৈপুণ্য প্রকাশ পায়নি। দলের মধ্যে দুর্ধর্ষ ক্রিকেটারের অভাব ছিল না, অনেক সময় তারা খেলার মাঠে বিপর্যয় রোধে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু দলগত সংহতি রক্ষার কাজে যথার্থ প্রভাব খাটাতে পারেন নি তাঁরা।

আসলে আমরা কোন সুসংবদ্ধ দল ছিলাম না, এমন কি ক্রিকেট সম্পর্কে নিষ্ঠাবান স্বাধীনচেতা সাহসী ব্যক্তি সমষ্টিও ছিলাম না। ভারতের বাইরে সফর করবার সময় দলের প্রত্যেককেও কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত নীতি মেনে চলতে হয়। কিন্তু সেবারে পরস্পরের প্রতি হীন চিত্ত খোঁচাখুচির প্রবণতা এমন পর্যায়ে উঠেছিল যে দলীয় শৃঙ্খলা এবং শালীনতাবোধ জাহান্নামে গিয়েছিল। কেউ তা মেনে চলার প্রয়োজনও বোধ করেনি। বর্ষীয়ান খেলোয়াড়দের চাপ দিয়ে অনেক বিবৃতিতে স্বাক্ষর আদায় করা হয়েছিল এবং দলের মর্যাদার কথা ভেবে স্বেচ্ছায়ও স্বাক্ষর দিয়েছিলেন অনেকে দলগত সংহতি ঘোষণা করে।

কিন্তু একথা কারো অজানা ছিল না যে দল, উপদল ও প্রতি দলে বিভক্ত আমাদের মধ্যে তীব্র বিরোধ চলছিল, ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত বিভেদ বলে যদিও তাকে চিত্রিত করার চেষ্টা হয়েছে, দলাদলিতে আসলে ছিল ব্যক্তিগত আনুগত্য নিয়ে।

ক্রিকেট ছাড়া আর কারো প্রতি আনুগত্যের ধার ধারেন না, এমন চরিত্রের মানুষ যে আমাদের মধ্যে ছিলেন না তা নয়, কিন্তু যাদের হাতে কর্তৃত্ব, ক্রিকেটের প্রতি আনুগত্য দেখাতে গিয়ে তাঁদের অসন্তোষ উৎপাদন করলে, ক্রিকেটের দেবতা তার পক্ষ সমর্থনে এগিয়ে আসবেন না। সি কে নাইডু, উজীর আলি ও এল পি জয় এর মর্যাদাবোধ এত তীব্র ছিল যে কোন দল বা ব্যক্তি বিশেষের কাছে মাথা নিচু করানো যেত না তাঁদের। একান্তরে সি কে-কে ঘিরেই একটা শক্তিশালী উপদল গড়ে তোলা হয়েছিল। বরং নাইডুকে লক্ষ্য করে উপদল গঠনের উশকানি দেওয়া হয়েছিল এমন কথা বলাই সমীচিন।

গোলমালটা মূলত পেকেছিল ১৯৩২ সালে যখন নাইডুকে টেষ্ট ম্যাচে অধিনায়কত্বের ভার দেওয়া হয়েছিল, যে মহারাজ সফরের অধিনায়ক এবং যে কুমার সহাধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরা নিজেরাই সরে দাঁড়িয়ে ছিলেন টেষ্ট থেকে। পরবর্তী সিরিজে জার্ডিন চালিত ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে নাইডু সরাসরি অধিনায়ক নির্বাচিত হন। কাজেই ভারতীয় টেষ্ট দলে নাইডুর অধিনায়কত্ব প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হয়ে গেছে, বিশেষ করে জনগণের বিবেচনায় তিনি জাতীয় অধিনায়ক।

তা হোক, সি কে নাইডু রাজামহারাজা ছিলেন না নিতান্তই সাধারণ ঘরের ছেলে অথচ তখন পর্যন্ত ক্রিকেটে, ভারতে তো বটেই ইংল্যাণ্ডে পর্যন্ত, নীলরক্তের প্রবল আধিপত্য। ক্রিকেট সম্পর্কে কিছু উৎসাহ ও নড়াচড়া আছে এমন রাজা ও রাজকুমারের ভারতে তখন ছড়াছড়ি। আর ক্রিকেটের কতৃত্ব যাঁদের হাতে ছিল তাঁদের ধারণা ভারতীয় দলে সংহতি ও শৃঙ্খলাবোধ বজায় রাখতে হলে নেতৃত্ব কোন রাজামহারাজের হাতে থাকাই প্রয়োজন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে যে সমাজতন্ত্রে ঘোষিত আদর্শ সত্বেও গ্রহণ করেও এ যুগের ক্রিকেটেও রাজামহারাজ-কুমার-নবাবের নেতৃত্বের সাধিকার দীর্ঘকাল স্বীকৃত ছিল। পতৌদীর পরলোকগত নবাব যে মহান ক্রিকেটার ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, কিন্তু ১৯৪৬ সালের ইংল্যাণ্ড

সফরকারী ভারতীয় দলের অধিনায়ক পদে মার্চেন্টদের বাদ দিয়ে তাঁকে অধিনায়ক করার কোন যুক্তি ছিল না। অমরনাথ এবং পরে হাজারেকে যখন জাতীয় দলের অধিনায়ক করা হয় তখন রাজ মহারাজ ক্রিকেট খেলোয়াড়ের চূড়ান্ত দুর্ভিক্ষ।

১৯৫৯ সফরে সবাইকে বিস্মিত করে ডি কে গায়কোয়াড়কে অধিনায়ক নির্বাচিত করা হয়েছিল। অনেক কষ্টে যুক্তি যা খুঁজে পাওয়া গেল, তা হল গায়কোয়োড় পদবীর জোরে তিনি তদানিন্তন ক্রিকেট বোর্ড সভাপতি বরোদার গায়কোয়াড়ের রাজবংশ সম্পর্কিত হতেও পারেন। বরোদার গায়কোয়াড় স্বয়ং হলেন দলের ম্যানেজার। এর পরই নবাব অধিনায়ক পতৌদীর মনসুর আলি। ব্যক্তিগত যোগ্যতার অভাব ছিল না তার মধ্যে। চমৎকার খেলোয়াড়, অধিনায়ক হিসেবেও অপরিসীম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবু আমি বলবো যে চাঁদু বোরদের দাবি অস্বীকার করে তাঁকে যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজে সহাধিনায়ক ও পরে অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়েছিল, তার মূলে ছিল নির্বাচক মণ্ডলীর ও বোর্ড কর্তৃপক্ষের রাজা-নবাব সম্পর্কে দুর্বলতা।

সি কে নাইডু অধিনায়ক হিসেবে অধিষ্ঠিত, তাঁকে অনেক কষ্টে অপসারিত করার পরের ভয় ছিল কি জানি জনগনের অতি প্রিয় ওই ক্রিকেট সম্রাট যদি কোন মতে ফিরে আসেন। তা যাতে না হতে পারে, প্রাণপণ প্রয়াস চালানো হল, যতজন সম্ভব ক্রিকেটারের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব যাতে সৃষ্টির প্রয়াস চললো।

তরুণ খেলোয়াড়দের সি কে নাইডু থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা হয়েছিল জ্যাক রাইডার চালিত অস্ট্রেলিয়ান দলের ভারত সফরের সময়। সেই দলাদলির আগুনে ইন্ধন জোগানো হল পরবর্তী ইংল্যাণ্ড সফরে। এই কাজে অধিনায়ক ও ম্যানেজার যে কতটা সক্রিয় ছিলেন তা সঠিক বলতে পারবো না, তবে দুজনের যুগ্ম প্রয়াসে নিসার, দিলওয়ার হোসেন, বাকা জিলানি খান ও প্যালিয়াকে সি কে নাইডুর বিরুদ্ধে দলে টানা হয়েছিল। দরাজ হাতে মহারাজকুমার মহার্ঘ উপহার বিতরণ করে আরো অনেককে দলে টানতে পেরেছিলেন এবং তার মধ্যে কতকগুলি উপদলও তৈরী করেছিলেন।

১৯৩২-র নজিরে এবারেও টেষ্ট ম্যাচে সি কে-কে অধিনায়ক করা হোক মার্চেন্টের এই সরাসরি প্রস্তাবের ফলে নাইডু ভীতি বেড়ে গিয়েছিল।

আজ আমি কথাটা নিঃসঙ্কোচে ফাঁস করে দিতে পারি যে দলের একজন কর্তাব্যক্তি ম্যাঞ্চেস্টার টেষ্টের দ্বিতীয় ইনিংসে আমায় উশকানি দিয়েছিলেন আমি যেন মার্চেন্টকে রান আউট করে দি। আমাকে বোঝানো হয়েছিল মার্চেন্ট নাকি আমায় প্রথম ইনিংসে রান আউট করিয়ে ছিলেন, অতএব মরদ হিসেবে আমার বদলা নেওয়া উচিত। ইনিংস সূচনা করতে যাবার সময় ওই নির্দেশের কথা মার্চেন্টকে বলেছিলাম। চেষ্টা করে দেখো, হেসে জবাব করেছিলেন মার্চেন্ট। আজ আমার ভাবতেও ভয় লাগে যদি কোন দুর্বল মুহূর্তে ওদের প্ররোচনায় পড়ে যেতাম, ভারতীয় ক্রিকেটে উজ্জ্বলতম অধ্যায়টি আর রচনা হত না তা হলে। ক্ষমতার লড়াই যখন কারো কারো চূড়ান্ত জয়লাভে শেষ হয়ে গিয়েছিল, আর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধের তীব্রতাও কমে গিয়েছিল, সেই সময় তাঁরা আমাকে দেওয়া ওই কু-উপদেশের জন্য বিবেকের দংশন ভোগ করেছিলেন কিনা আজ তা বলতে পারবো না।

সফরদলের অধিনায়কের অনুপস্থিতিতে নাইডু যে অধিনায়কত্বের প্রশ্নে অগ্রগণ্য, এই বোধ থেকে মহারাজকুমার সাধ্যমত প্রতিটি ম্যাচে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বস্তুত সব কটি খেলাতেই তিনি উপস্থিত ছিলেন, কখনো বিশ্রাম নেবার কথা চিন্তা করেননি। সম্রাটের কাছ থেকে নাইটহুডের খেতাব স্বহস্তে গ্রহণের প্রয়োজনে একটি ম্যাচ থেকে মাত্র সরেছিলেন।

কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে ভারতীয় দলের সবচেয়ে বড় জয় হয়েছিল সি. কে নাইডুর অধিনায়কতায়'। মহারাজকুমার তখন রাজসন্দর্শন উপলক্ষ্যে ম্যাচে অনুপস্থিত। পরবর্তী ডার্বিশায়ারের বিরুদ্ধেও সি. কে অধিনায়ক। খেলাটিতে অবশ্য জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি হয়নি, দ্বিতীয় টেস্টের ঠিক আগে মহারাজকুমার ফিরে আসেন আর সেই থেকে একটি খেলাতেও অনুপস্থিত থাকেননি। শেষ দিকে জুলিয়ান ক্যাহনের দলের ও ভারতীয় জিমখানা দলের বিরুদ্ধে অবশ্য মহারাজকুমার অংশগ্রহণ করেননি তবে এই দুটি খেলার অধিনায়ক হবার কোন আশঙ্কা সি. কের ছিলনা, তৃতীয় টেষ্টে আহত হবার পর বাকি সাতটি খেলার মাত্র দুটিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সি. কে নাইডুকে পোষাক বদলের ঘরে সবার সামনে অপমান করার সর্ত পূরণ করেই বাকাজিলানী খান তৃতীয় টেস্ট দলে স্থান পেয়েছিল বলে ব্যাপক ধারণা ছিল। খেলোয়াড়দের নামের তালিকা যখন ঘোষিত হয় সেখানে এগারজনের একজন হিসেবে শুঁটে ব্যানার্জীর উল্লেখ ছিল, আর দ্বাদশ ব্যক্তি

ছিলেন বাকা জিলানি। কিন্তু খেলার সময় দেখা গেল বাকা জিলানি দলভুক্ত আর ব্যানার্জী দ্বাদশ ব্যক্তি। ব্যানার্জীর প্রতি প্রথম টেস্টেও অনুরূপ অবিচার হয়েছিল। দলভুক্ত হওয়া সত্বেও তাকে শেষ পর্যন্ত পালিয়ার সঙ্গে ঠাঁই বদল করে বার নম্বর হতে হয়েছিল। তবে পালিয়া মহারাজকুমারের কোন সর্ত পালন করেছিলেন কিনা আমি সঠিক বলতে পারবো না। আর ব্যানার্জী সি. কে অনুরক্তদের মধ্যে ছিলেন কিনা তাও আমি জানিনা।

যখন তখন টীম বদল এবং ব্যাটিং অর্ডার বদলের রেওয়াজ চালু হয়ে গিয়েছিল! কার কোন উদ্ভট কল্পনায় সফরে আমাদের কোষাধ্যক্ষ এস এম হাদী-কে ওভাল টেস্টে দ্বাদশ ব্যক্তি করা হল এবং সেই অজুহাতে টেস্ট খেলার স্মারক নিদর্শনগুলি দেওয়া হল। দলের অধিকাংশ সদস্যই এই ব্যবস্থায় বিরক্ত বোধ করেছিলেন। এই ধরণের ঘটনা সফরে হামেশাই ঘটেছে। নির্বাচিত খেলোয়াড় এবং ব্যাটিং অর্ডার বদল করার কি উদ্দেশ্য ছিল আমার পক্ষে তা অনুমাণ করা সহজ ছিলনা। তবে খেলার প্রয়োজনে বা দলীয় স্বার্থে যে তা করা হত না এই ধারণা অনেকেরই ছিল। বস্তুত ব্যাটসম্যান মাঠে নামবে বলে প্যাড বেঁধে বসে আছে অথচ তার বদলে অন্যকে নামানো হচ্ছে, এমন ব্যবস্থাতেই অমরনাথের ধৈর্যের বাঁধ টুটে গিয়েছিল। অমরনাথ পর্ব কিন্তু ইংল্যাণ্ডেই শেষ হয়নি, সফর শেষ হওয়ার পর দীর্ঘকাল তার জের চলেছিল। টেস্ট ম্যাচ প্রথম খেলতে নেমেই বম্বেতে যখন সেঞ্চুরী করেন অমরনাথ, সেই থেকে ভারতীয় মহলে তাঁর প্রবল জনপ্রিয়তা। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডের প্রতিটি খেলায় তাঁর কৃতিত্বের সীমা ছিলনা, দলের শ্রেষ্ঠ চৌকষ খেলোয়াড়ই শুধু নয়, যে কোন বিচারে তিনি প্রথম শ্রেণীর চৌকষ খেলোয়াড় বলে বিবেচিত ছিলেন। অমন একজন খেলোয়াড়কে টেষ্ট ম্যাচের ঠিক আগে জাহাজবন্দী করে দেশে ফেরত পাঠানোতে সকলের মনে দারুণ আঘাত লেগেছিল।

অধিনায়কের কৃত্যে অসংলগ্নতার অন্ত ছিলনা এবং ব্যাটিং অর্ডার ছিল একান্তই দুর্বোধ্য। ব্যাটসম্যান হিসাবে দুনম্বর থেকে চারনম্বর চালাচালি চলছিল অমরনাথকে নিয়ে, হঠাৎ মাইনর কাউন্টিজের বিরুদ্ধে তাকে ছনম্বরে ঠেলে দেওয়া হল। অমরনাথের ধৈর্যে চরম আঘাত লেগেছিল পরে ব্যাট করতে দেওয়া হয়েছিল বলে নয়, তাঁকে প্যাড বেঁধে তৈরি থাকতে বলেও একের পর এক অন্য খেলোয়াড়কে ব্যাট করতে পাঠানো হচ্ছিল। অমরনাথকে

আমি যা জেনেছি সে আবেগপ্রবণ. অন্তর প্রীতির রসে পুষ্ট, কিন্তু রাগও অল্পেই হয়। ভালোবেসে জড়িয়ে ধরতে যেমন সময় লাগেনা, ঘুষি বাগিয়ে তেড়ে আসতেও তাই, কৌশল করে কিভাবে মিষ্টতার মুখোস রেখে চলতে হয়, তার ধার ধারতেন না তিনি, তাছাড়া যৌবনসুলভ এবং আত্মবিশ্বাসজাত স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য চেপে রাখতে পারতেননা তিনি, অধিনায়ক ও ম্যানেজারের সামনে যদি বিরক্তি প্রকাশ নাও করতেন. দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে গুপ্তচরবৃত্তি চালু হয়ে গিয়েছিল; যার ·মাথা কাটতে হবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সংগ্রহের ব্যবস্থা ঠিকই ছিল। আমি মুখ বন্ধ করেই চলেছি বটে, তবে চোখ ও কান সব সময় খোলা রাখতাম। স্যর হোরেস গর্ডন যাই বলে থাকেননা কেন দলের মধ্যে সম্প্রদায়গত বা জাতিগত কোন বিসংবাদ ছিলনা, তবে কোন বিসংবাদ নেই বলে যে মাঝে মাঝে প্রচার করা হত তাও নির্জলা মিথ্যা, নেহাৎই একটা ছলনা, ভব্যতার মুখোশ। রবিবাসরীয় পত্রিকাগুলির অনেকেরই ভব্যতা রক্ষার দায় ছিলনা। তারা গোপন কথা ফাঁস করে দিয়ে লিখলো যে "ম্যানেজার ও অধিনায়কের যথেচ্ছাচারে অধিকাংশ খেলোয়াড়ই জর্জরিত। দলের সদস্যদের মধ্যে এমন মনোভাব রয়েছে যে সি' কে. নাইডু বা উজীর আলিরই টেস্টে অধিনায়কতা করা উচিত। ভারতীয় ছাত্র ইউনিয়ানে ভারতীয়দের নিত্যকার জমায়েতে এই ধরণের আলোচনা চলে।"

১৯এ জুন। মাইনর কাউন্টিজের খেলার শেষে যখন শুনলাম যে শৃখলাভঙ্গ ও উদ্ধত ব্যবহারের জন্য অমরনাথকে দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে, আমরা সবাই হতবাক্। তার বেশি কিন্তু জানার আমাদের অধিকার ছিলনা আর কোনরকম ঔৎসুক্য প্রকাশও শৃঙ্খলাভঙ্গ বলে বিবেচিত। অমরনাথের প্রতি শাস্তির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাকি খেলোয়াড়দের শাসন। পরদিন সংবাদ-পত্রে যা পড়লাম. তা হল: এরপর যা করবার ভারতের ক্রিকেট বোর্ড করবেন. এর চেয়ে বেশি কিছু ম্যানেজার বা অধিনায়ক বলতে নারাজ।" রয়টার জানালো যে অধিনায়ক ও ম্যানেজারের প্রতি অশোভন আচরণের জন্য অমরনাথকে একাধিকবার সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, অশালীন আচরণের জন্য তিরস্কৃত হয়ে অমরনাথ নাকি বলেছিলেন যেহেতু তাঁকে বাদ দিয়ে টীম চলতে পারে না, তাই কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই নেওয়া যেতে পারবেনা তাঁর বিরুদ্ধে। রয়টার আরো জানালো যে গোলমালের সূত্রপাত তিনসপ্তাহ আগেই হয়েছিল। ভারতগামী জাহাজ এসে ধরতে সাদাম্পটনে

রয়টারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে অমরনাথ নাকি বলেছিলেন: প্যাড পরতে বলার পর আমাকে চার ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়েছিল মাইনর কাউন্টিজের খেলায়। আমি স্বীকার করছি যে আমি উত্তেজিত হয়েছিলাম এবং পোষাক ঘরে ফিরে গিয়ে হাতের ব্যাটটাকে কোণের দিকে ছুড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু অধিনায়ককে কিছুই বলিনি বা করিনি আমি। যা কিছু বলেছি তা দলের কোন কোন সহযোগী খেলোয়াড়কে।"

"গতকাল অপরাহ্নে ছটায় আমাকে ম্যানেজার দেশে ফিরে যাবার হুকুম জারি করলেন। আমি আর একবার সদাচারের সুযোগ চাইলে, ম্যানেজার জানালেন যে দলের অধিকাংশ সদস্যের সিদ্ধান্ত বদলাবার ক্ষমতা তাঁর নেই। দলের অধিকাংশ সদস্যের সিদ্ধান্ত কথাটা কিন্তু সর্বৈব মিথ্যা। আমাকে থাকতে দিন বলে সানুনয় আবেদন জানালাম। অধিনায়ক মেনে নিলেন তবে সর্ত হল যে ভবিষ্যতে ওই ধরণের কোন কথা আর বলা চলবেনা, আমিও রাজি হলাম। আজ সকালে আমাকে অধিনায়কের ঘরে ডেকে নিয়ে যাওয়া হল। যেখানে মহারাজকুমার ব্রিটেন জোনস-এর সঙ্গে শলাপরামর্শ করে জানালেন যে সিদ্ধান্তের পরিবর্তন সম্ভব নয়। রয়টার প্রচারিত অমরনাথের বক্তব্যে আরো ছিল: বোঝা যাচ্ছে ভারতে প্রেরিত লিখিত রিপোর্টে জানানো হচ্ছে যে আমি এবং দলের আরো কেউ কেউ দল পরিচালনা পদ্ধতি অনুমোদন করতে চাইছিনা। ওরা বোধ হয় আমার ওপরই দোষ চাপাচ্ছে। আমি বোর্ড অব কণ্ট্রোলের কাছে কোন চিঠি পাঠাইনি। ভারত থেকে সি এস নাইডুকে আনানো হয়েছে বলে দলের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে একথাও সত্য নয় (এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা পরে):

এর পরেও অমরনাথ বলেন, এই ব্যাপারে আমার কোন দোষ নেই। দেশে ফিরে যেতে আমি নারাজ নই, কিন্তু দেশের মানুষ কি ভাববে আমার সম্বন্ধে? টীমের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবো এই আগ্রহ নিয়েই এসেছিলাম। দেশে ফিরেই বোর্ডের সভাপতি ভুপালের নবাবের সঙ্গে দেখা করে সম্পুর্ণ কাহিনী তাকে জানাবো।"

দ্য ষ্টার পত্রিকা লিখলে, জাহাজ ধরবার ট্রেনের রিজার্ভ কামরায় উপবিষ্ট বিষাদক্লিষ্ট অমরনাথ ওয়াটারলু ষ্টেশনে ষ্টার-এর প্রতিনিধিকে বলেছেন:

আমার বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য ও উপরওয়ালার নির্দেশ অগ্রাহ্য করার অভিযোগ আনা হয়েছে। কিন্তু কারো প্রতি কোনো অশালীন আচরণ করবার উদ্দেশ্য

কখনো ছিলনা আমার। কিছুদিন ধরে দলে বিশৃঙ্খলা চলছিল এইসব তারই পরিণতি। লর্ডস মাঠে আমাকে যে ভাবে ব্যাটিং করতে পাঠানো হয়েছিল তাতে আমি ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। তবু প্রাণ দিয়েই খেলেছিলাম। ফিরে এসে ক্লান্ত দেহ ও বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে প্যাড ছুঁড়ে ফেলেছিলাম। অধিনায়ককে বলেছিলাম, ওভাবে আমি আমি খেলতে পারবোনা। গত রাত্রে ম্যানেজার ও অধিনায়কের বৈঠকে আমাকে দেশে ফেরত পাঠাবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। দলের সব সদস্য নাকি কাগজে সই দিয়ে আমার ঔদ্ধত্যের কথা জানিয়েছে, কিন্তু সব খেলোয়াড়ই আমার বিরুদ্ধে আমি তা মনে করিনা।"

অমরনাথ ঠিক কথাই বলেছিলেন। সব খেলোয়াড়ই তাঁর বিরুদ্ধে ছিলেন না. যদিচ বিবৃতিতে সবারই সই আদায় করা হয়েছিল, যারা কোন দলে উপদলে নেই, তাদের সই করতে বাধ্য করা হয়েছিল, তবে সব বিবৃতিই যে উশকানির ফল বা অভিসন্ধিমূলক ছিল, তা নয়। পাঁচদিন বাদে সি কে উজীর আলি ও জয় যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, সেটা তাঁরা বিবেকের তাগিদে ক্রিকেট প্রীতির বশে ও দেশের সুনাম রক্ষার জন্যই তা করেছিলেন বলে আমার বিশ্বাস। বিবৃতিতে সত্যকথা হয়তো বলা হয়নি, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের মাটিতে বসে নিজেদের ভিতরকার নোংরামি যাতে খুলে দেখানো না হয়, তাই উদ্দেশ্য ছিল। সেই বিবৃতিতে বলা হয়েছিল: ভারতীয় ক্রিকেটের স্বার্থে আমরা দলের কজন বর্ষীয়ান খেলোয়াড় অধিনায়কের ওপর পূর্ণ আস্থা ঘোষণা করছি এবং আভ্যন্তরীণ দলগুলির গুজব অস্বীকার করছি।"

সব খেলোয়াড় অমরনাথের বিপক্ষে না থাকলেও, খেলোয়াড়দের মধ্যে তাঁর বন্ধুসংখ্যাও নগণ্য ছিল। তা না হলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় এতটুকু বিক্ষোভ প্রকাশ পেলনা কেন? নিশ্চয়ই কোন বদলা বা শাস্তির ভয়েই সবাই চুপ করে ছিলনা। আমি নিশ্চিত বলতে পারি যে দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়েরই মনোভাব অমরনাথের অনুকূল ছিল না। যদি হত তাহলে কাহিনীর পরিণতি অন্যরকম হত। ব্যক্তিগতভাবে অমরনাথ সম্পর্কে যার যা মনোভাব থাকুক অথবা তার নির্বাসনদণ্ড যিনি যে ভাবেই নিয়ে থাকুন, সকলেই একটি বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে অমরনাথের ব্যাপারটায় ভারতীয় ক্রিকেট পরিচালনা ব্যাপারে কোন আভ্যন্তরীণ গূঢ় ব্যাধিরই লক্ষণ মাত্র। দলীয় স্বার্থে এবং ভারতীয় ক্রিকেটের কল্যাণ সেই ব্যাধির নিঃশেষ চিকিৎসা ও মূলোৎপাটন কর্তব্য এ বিষয়েও কোন মতভেদ ছিল না। অমরনাথ

চালান হয়ে যাবার পর ভারতীয় খেলোয়াড়রা একযোগে মিলিত হয়ে কতকগুলি দাবি ধ্বনিত করেছিল এমন ঘটনা কোনদিন আমার গোচরে আসেনি, কিন্তু 'সাণ্ডে ডেসপ্যাচ' পত্রিকায় ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিম্নলিখিত দাবিগুলি প্রকাশিত হয়েছিল :

(১) কর্ণেল সি কে নাইডু কিংবা উজির আলিকে অধিনায়ক করা হোক।

(২) অধিনায়ক দলনির্বাচনে এবং খেলার কৌশল নির্ধারণে দলের সকলের সঙ্গে অবশ্যই পরামর্শ করবেন।

(৩) দলের প্রবীণ সদস্যদের প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে। ফোটো তোলার সময় জয়কে বসবার আসন দেওয়া হয়নি।

(৪) কোন খেলোয়াড়ই অধিনায়কের কাছ থেকে বিশেষ ব্যবহার পাবেন না।

এই দাবিগুলি সূত্রবদ্ধ করতে খেলোয়াড়েরা মিলিত হয়েছিল কিনা আমি জানিনা। তবে ওই ধরণের ব্যবস্থা অধিকাংশ খেলোয়াড়েরই কাম্য ছিল। এই প্রসঙ্গে সভা ডাকার মত সাহস যদি কেউ দেখাতে পারতেন, সেখানে ওই ধরণের দাবি যে সহজেই অনুমোদন লাভ করতো, এ. বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। সাণ্ডে ডেসপ্যাচে প্রকাশিত দাবিগুলি অধিকাংশ খেলোয়াড়েরই মনোগত অভিপ্রায়। তবে বিশেষ নির্দেশ পালনের মূল্য হিসাবে বিশেষ পক্ষপাত ব্যবহার যে দুচারজন পেতেন, তাদের কথা আলাদা।

দেশে ফিরে ক্রিকেট বোর্ড প্রেসিডেন্টের কাছে অমরনাথ নিজের বক্তব্য পেশ করতে পারার আগেই মেজর বৃটেন জোন্‌স্ ভূপালের নবাবের কাছে অমরনাথের উদ্ধত ব্যবহারের খবর তারযোগে জানিয়ে দিলেন। দলের কিছু সদস্যের কাছ থেকে ম্যানেজার তার বিবৃতির সমর্থন সই-ও করিয়ে নিয়েছিলেন। সে বিবৃতিতে বাস্তবিকপক্ষে কারা সই করেছিলেন আজ পর্যন্ত আমি তা জানতে পারিনি। ম্যানেজার লিখেছিলেন আগাগোড়া শোচনীয় ব্যবহার, দলের মধ্যে অব্যক্ত ক্ষতিকর প্রভাব।" সংবাদপত্রের মতে প্রকাশিত বোর্ড সভাপতির প্রতিক্রিয়া ছিল : "স্থানস্থিত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বোর্ডের হস্তক্ষেপের কেনন কথাই উঠতে পারেনা।"

পরে যা জেনেছি, ভূপালের নবাব, হয়তো অমর নাথকে আবার ইংল্যাণ্ডে পাঠাবার কথা ভাবছিলেন, কিন্তু অপর দিকে রাশ টানবার জন্য ছিলেন

ভাইসরয় প্রাসাদের কট্টর অফিসার ফৌজী মেজাজের মেজর ব্রিটেন-জোনস্, শৃঙ্খলাভঙ্গ সহ্য করবেন না এই ছিল যাঁর পণ, যাঁর অভিধানে 'ক্ষমা' কথাটির কোন অস্তিত্বই নেই।

ব্রিটেন-জোনস তাঁর ভূতপূর্ব প্রভু লর্ড উইলিংডনের কাছ থেকে কোন নির্দেশ পেয়েছিলেন কিনা বলতে পারবো না, তবে সম্রাটের ভারতীয় রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলা কঠোর হস্তে রক্ষা করে চলার গুরুত্ব সম্পর্কে সদা সচেতন। সেই ভূতপূর্ব বড়লাট বাহাদুর সারের এক ভোজ সভায় অকারণে অমরনাথ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তীব্র কটূক্তি করেন। ভোজনান্তিক ভাষণে তিনি বলেন যে ম্যানেজারের মাধ্যমে তিনি আগাগোড়াই ঘটনাবলী সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ ভাবে অবহিত এবং স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন যে সব কিছু জেনে শুনে আমার বিশ্বাস হয়েছে যে বিশিষ্ট খেলোয়াড়টি সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত ম্যানেজার গ্রহণ করছেন তা খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছে।'

অতএব ভারতীয় বোর্ড ম্যানেজার ও ক্যাপ্টেনকে চটাতে রাজী হয়নি। এবং এই সম্পর্কে টাইমস পত্রিকা ব্রিটেন জোনসের একটি বিবৃতি প্রকাশ করে. বিবৃতিটি ম্যানেজার ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে আমাদের ফিরতি খেলার সময় লিভারপুলে বসে দিয়েছিলেন। ভারতের ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড থেকে অনুরোধ এসেছিল অমরনাথ যদি কিছু সর্ত মেনে চলে তবে তাঁকে ফেরত পাঠানো ম্যানেজার ও অধিনায়ক অনুমোদন করবেন কিনা। অনুরোধটা তেমন জোরালো কিছু ছিল না ; কোন চাপ না দিয়েই আমাদের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল এবং আমাদের সিদ্ধান্ত'র খবরদারি করার কোন ইচ্ছে যে বোর্ডের নেই সে কথাও জানানো হয়েছিল। বোর্ডের পরিস্থিতি অনুধাবন করে আমরা মত দিয়েছি যে বোর্ড যদি অমরনাথকে ফেরত পাঠাতে চায় আমরা তা মেনে নেব।' অবশ্য তাঁকে খোলাখুলি মার্জনা ভিক্ষা করতে হবে এবং ভবিষ্যৎ সদ্ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।'

ওই বিবৃতির সঙ্গে স্বকীয় মন্তব্যে টাইমস জানালে যে অমরনাথের ফিরে আসা এখনো অনিশ্চিত। মেজর ব্রিটেন-জোনস বললেন. তিনি যে দ্বিতীয় তার বার্তা ভারত থেকে পেয়েছেন তাতে জানানো হয়েছে যে অমর নাথ সম্বন্ধে বোর্ড এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। তিনি আরো জানালেন যে তাঁরাও বোর্ডের সিদ্ধান্তের প্রত্যাশায় রয়েছেন।

আমরা তখন দ্বিতীয় টেষ্টের কিছু আগে ডার্বিশায়ারের বিরুদ্ধে খেলছি,

সেই সময় বোম্বে থেকে প্রেরিত রয়টারের যে সংবাদ ইংল্যাণ্ডের পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হল তাতেই জানা গেল যে অমর নাথের ফিরে আসার প্রসঙ্গে যবনিকা পড়ে গেছে। সংবাদটি নিম্নরূপ ঃ

ভারতীয় ক্রিকেটার এল অমরনাথকে যে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে ভারতে ফেরত পাঠানো হয়েছিল তিনি আরেকবার ইংল্যাণ্ডে আসছেন না, কারণ অধিনায়ক ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমার ও ম্যানেজার মেজর ব্রিটেন-জোনস অমরনাথকে পুনরায় ইংল্যাণ্ডে পাঠানো অবাঞ্ছিত বলে মনে করেন। ভূপালের নবাব জানিয়েছেন যে ব্যক্তিগত ও গোপন অনুসন্ধানের পরে তিনি ভারতীয় দলের অধিনায়ক এবং ম্যানেজারের কাছে জানতে চান, অমর নাথকে পুনরায় ইংল্যাণ্ডে পাঠানো তাঁরা অনুমোদন করবেন কিনা। তাঁরা সর্ত্তসাপেক্ষ মত করায় বোর্ড অমর নাথকে ফেরত পাঠানোর কথা চিন্তা করছিল এমন সময় অধিনায়ক ও ম্যানেজার জানালেন যে অমর নাথকে প্রত্যাবর্তন তাঁরা অবাঞ্ছিত বিবেচনা করছেন এবং সেই কারণে ওই প্রসঙ্গে ইতি টেনে দেওয়া হয়েছে।'

ইংল্যাণ্ডে মহারাজকুমারের প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হল ঃ 'প্রথমে ম্যানেজার ও আমি অমরনাথকে ফেরত নিতে রাজি হয়েছিলাম, কিন্তু পরে গভীরতর বিবেচনায় আমরা মত পরিবর্তন করি ও সেই মর্মে বোর্ডকে জানিয়েছি'।

অমরনাথ অধ্যায় সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য বোর্ড যে পরে মাননীয় বিচারপতি বি বোমণ্টকে নিয়ে একজনের কমিটি গঠন করেছিলেন, তার যৌক্তিকতা আমি কোনদিন মেনে নিতে পারিনি। কমিটি বিষয়টি বাস্তবিক পক্ষে ধামাচাপা দিয়েছিল, ক্রিকেট সম্পর্কে মহারাজকুমারের বিশেষ জ্ঞান নেই আর প্ররোচনার মুখে তরুণ অমরনাথের পক্ষে সংযম রক্ষা করা সম্ভব হয়নি, এই অবান্তর আলোচনাতেই কমিটি রিপোর্টের পাতা ভরিয়েছিল। বোর্ডের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার জন্য বোর্ড অথবা বোর্ডের সভাপতি অনুসন্ধান করলেই সমীচিন হত। ভূপালের নবাব এমনিতে সাহসী ও ন্যায়বান পুরুষ হয়েও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে চেয়েছিলেন বলেই আমার ধারণা।

মোটের উপর খেলার মাঠে দল পরিচালনায় অনেক ত্রুটি ছিল। ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলি হামেশাই অনুরূপ মত প্রকাশ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ

স্টসম্যান পত্রিকায় এম সি সি-র খেলা প্রসঙ্গে ই ভি সিউয়েল-এর মন্তব্য উল্লেখ্য ঃ' পাহাড়ের দিক থেকে তার বাঁ কাধের উপর প্রবহমান বায়ু সহযোগে বল করে নিসার ৪০ মিনিট কাল সত্যিকার ফাস্ট বোলিং করেন। আরো বেশী সময় যে তিনি বল করেননি, সেটা তাঁর দোষ নয়, কারণ এমসিসির রান যখন দুই উইকেটে ২৯ তখন মহারাজকুমার তাঁকে সরিয়ে নেন এবং আক্রমণে আরো ক্ষতি করে আধঘন্টা তাঁকে বিশ্রাম দেন। অধিনায়কের এই ভুলের ফলে এম সি সি খেলার গতি অনুকূলে নিয়ে আসে।'

একটা ভুল ধারণা চালু হয়ে আছে যে অমর নাথের বদলি হিসেবেই সি-এস নাইডুকে আনানো হয়েছিল। দিল্লী থেকে ৪ঠা জুন প্রচারিত সংবাদে বলা হয়েছিল যে সি-এস নাইডু ৯ই জুন বিমান যোগে রওনা হয়ে ১৬ই জুন লণ্ডন পৌছবেন। অথচ এই সংবাদ প্রকাশের ঠিক আগেই ম্যানেজার ব্রিটেন-জোনস দলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য সি এস নাইডুকে আনানোর প্রস্তাব হয়েছে সে কথা সরাসরি অস্বীকার করেন।

অমরনাথকে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় ১৯ জুন মাইনর কাউন্টিজ খেলার শেষে। আর সি এস ইংল্যাণ্ডে পৌছন ১৫ই জুন এবং মাইনর কাউন্টিজ ম্যাচে অংশ গ্রহণ করেন। ভারতীয় দলের বোলিং-এ বৈচিত্র নেই বলে সমালোচকেরা একযোগে মত প্রকাশ করেন। তারই জন্য বোধ হয় অধিনায়ক ও ম্যানেজার একজন ধীর গতি বোলারকে আনানো সমীচিন মনে করেছিলেন। আমাদের কর্তাব্যক্তিদের অব্যবস্থাচিত্তের মস্ত প্রমাণ এই যে সমালোচকরা যখন দলে একজন বাঁয়া স্পিন বোলারের প্রয়োজন ঘোষণা করছেন ওরা সেই সময় একজন ডানহাতি বোলারকে আনালেন। ব্যক্তিগত ভাবে আমি অবশ্য সি এস আসাতে খুবই খুশি হয়েছিলাম। সি এস আমার প্রিয়তম বন্ধু, সে দলে নির্বাচিত না হওয়াতে আমি নিজের নির্বাচনের আনন্দ পুরোপুরি অনুভব করতে পারিনি।

১৯৩৬-এর-দলের চেয়ে শক্তিশালী দল কখনো ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেনি। তবু অধিকাংশ খেলাতেই তারা ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ রোজই দলের ভিতর গোলমাল চলছিল এবং তাতেই শক্তিক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল।

সব কিছু গোলমালের চূড়ান্ত দায়িত্ব ম্যানেজারের উপরেই আরোপ করতে হয়। কড়া আমলাতান্ত্রিক ঐতিহ্য বজায় রেখে তিনি কারো সাথেই

মেলামেশা করতেন না, কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলা দূরের কথা, কাছে যেতেই সাহস পেতনা। দলের সঙ্গে তাঁকে প্রায়শই দেখাও যেতনা।

অমরনাথ সম্পর্কিত ঘটনাবলীর জন্তও সব দোষ তাঁরই। কোন ব্যবহারিক কৌশল কি মন বোঝাবুঝির ধার ধারতেন না ভদ্রলোক, তাঁর সংকল্প ছিল শুধু দলের মধ্যে কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষা করা। তিনি দুনিয়াকে দেখাতে চাইতেন যে বিভিন্ন জাতি ধর্মের ১৬ জন ভারতীয় বিদেশে ক্রিকেট খেলতে গিয়েও ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলতে পারে না! আমি ভাল করেই জানি যে অন্যান্য দেশের সফরকারী ক্রিকেট দলেও অনুরূপ অনৈক্য অনেক সময়েই থাকে, কিন্তু তাদের মাথায় যাঁরা থাকেন তাঁদের সুকৌশলী ব্যবস্থাপনায় সব কিছু সামলে নেওয়া হয়, জনসাধারণ ও সংবাদপত্র অন্তর্বিরোধ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারে না। ভারতীয় ক্রিকেট দলের ১৯৩৬ ইংল্যাণ্ড সফর সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলা যায় যে ব্রিটিশ কূটনীতিই অত্যন্ত হীনতার সঙ্গে সেখানে খাটানো হয়েছিল।

কোন বিতর্কের অবকাশ না দিয়েই আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে প্রথম টেষ্টে আমাদের দুরবস্থা দলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন অদৃশ্য শক্তির দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল। ২৭ জুলাই তারিখে আমরা যখন লর্ডস মাঠে নামছি তখন অমরনাথ মহাসাগরে ভাসমান বিষণ্ণ মনে ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় তিনি ভারতে ফিরে চলেছেন।

পনের

ঘরে ফিরে এলাম

আমার প্রথম ইংল্যাণ্ড সফর নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। দলের এবং আমার দুই-এর পক্ষে ওই ঘটনাবহুল সফরের গুরুত্ব অপরিসীম, তাই বাকসংযম সম্ভব হয়নি। যে অভিজ্ঞতা আমি সেবার ইংল্যাণ্ডে সংগ্রহ করেছি, আমার সমগ্র জীবনে তার সুফল অপরিসীম। ইংল্যাণ্ডে আমার কৃত্যের ভিত্তির উপরেই গড়ে উঠেছে আমার পরবর্তী জীবন।

অভিজ্ঞতার কথা বলতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ইংল্যাণ্ডে ভালো

ক্রিকেট খেলার অনুকূল পরিবেশ, তা না হলে ওই দেশেই আপনা থেকে ক্রিকেটের জন্ম ও বৃদ্ধি ঘটতো না। অন্যান্য ক্রিকেট মুলুকে তার চারা এনে পুঁতে তাকে লালন করতে হয়েছে, তবেই পরিবেশ তার বিকাশে সাহায্য করেছে।

স্বভাবজাত উইকেট, গুণগ্রাহী অথচ শৃঙ্খলাবোধ সম্পন্ন দর্শকমণ্ডলী, অতি উচ্চ পর্যায়ের আম্পায়ারিং—ইংল্যাণ্ডে প্রত্যেক ক্রিকেট খেলোয়াড়কে পূর্ণ বিকাশে সাহায্য করে।

প্রতি খেলায় দর্শকবৃন্দ এত সুশৃঙ্খল যে খেলার মাঠে পুলিশ মোতায়েন করার প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে বড় খেলায় অগণিত পুলিশ সমাবেশ। কর্তৃপক্ষও দর্শক সংখ্যা এমন ভাবে সীমিত রাখেন, যাতে মাঠের সীমারেখা উপচিয়ে মানুষ মাঠের অংশ বিশেষ দখল করতে বাধ্য হয়না। এখানে পুলিশ প্রানান্ত করেও অতি উৎসাহী দর্শকদের সীমারেখার বাইরে নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারে না।

আম্পায়ারিং-এর কোন ত্রুটি ইংল্যাণ্ডে চোখে পড়েনি। আম্পায়ারিং সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকলে খেলোয়াড় নিঃশঙ্ক হতে পারে এবং তার খেলা স্বভাবতই খুলে যায়। ইংল্যাণ্ডে যে সব আম্পায়ার দেখেছি তাঁদের মধ্যে ফ্র্যাঙ্ক চেষ্টার-এর স্মৃতি সবচেয়ে সযত্নে ধারণ করে আছি। সৎ চরিত্র ও কঠোর ন্যায় নিষ্ঠার জোরে চেষ্টার ক্রিকেট আম্পায়ারিং-এ উপকথায় পরিণত হয়েছেন। যে কোন সঙ্কট সময়ে তাঁর মধ্যে অনবদ্য মানসিক ভারসাম্য লক্ষ্য করেছি।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের আম্পায়ারদের সম্পর্কে অনুরূপ প্রশংসাবাদ আমি করতে পারছি না। আম্পায়ারের ভুল সিদ্ধান্তের বলি আমাকে অনেকবার হতে হয়েছে। মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়, কিন্তু প্রায়শ ভুল হলেই সংশয়ের অবকাশ ঘটে। রিচি বেনো-র অস্ট্রেলিয়ান দল যখন ১৯৫৯-৬০ সালে ভারত সফর করে, তাদের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ টেষ্টের এক সঙ্কট সময়ে রামচাঁদ আম্পায়ারের অসহনীয় ভুলে আউট বলে ঘোষিত হয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ানরাও তাতে বিশেষ বিব্রত বোধ করেছিল। আম্পায়ারিং-এর উন্নতি বিধানে প্রধান প্রয়োজন পূর্বতন খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে আম্পায়ার নির্বাচন; তাঁদের কার্যকরী অভিজ্ঞতাও থাকা দরকার।

ইংল্যাণ্ড আমাকে ভালোবেসেছিল, আমাকে অর্থাৎ আমার খেলাকে।

এই ভালোবাসার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত আমার সারাজীবনের খেলার সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব জনৈক ইংল্যাণ্ডবাসীর কাছ থেকে আমি পেয়েছি। সেই প্রবল শীতের দেশে অজস্র ক্রিকেট রসিকের প্রীতির সূর্যালোক আমার মধ্যে প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছে। তাছাড়া বোদ্ধা ও সমালোচকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাদও আন্তরিকতায় ভরা ছিল। নেভিল কার্ডাস লিখেছিলেন: 'কোন ক্রিকেটার এমন কি কোন ক্রিকেট মনীষা পর্যন্ত মুশতাক আলির অনুরূপ খেলা দেখাতে পারতেন না'। এ মন্তব্য আমার বিশিষ্ট ইনিংস প্রসঙ্গে বলা হয়নি, সফরান্তে সামগ্রিক আলোচনা প্রসঙ্গেই কার্ডস ওই কয়টি কথা লিখেছিলেন। সারের খেলায় আমি মাত্র ১৮ রান করে আউট হয়ে যেতে ব্রায়ান স্টুয়ার্ট লিখলেন: 'মুশতাখ আলির সূচনা বীরোচিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খরগোশের মত সহজ শিকার হয়ে গেলেন'। ওই একই ইনিংস সম্পর্কে দ্য ফিল্ড পত্রিকা লিখলে: 'মুশতাখ আলির ব্যাটিং খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল, মাত্র ১৮ রানের খেলায় যে আনন্দ তিনি দিয়েছেন, ৫০ রান করে অনেক খেলোয়াড় তা দিতে পারেন না।'

ওই পত্রিকাই ওল্ড ট্রাফোর্ডের খেলা প্রসঙ্গে লিখেছিল: মুশতাখ আলি যে ধরণের প্রাণবন্ত ও শিল্পময় খেলা দেখিয়েছেন, বহুদিন ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে তা দেখা যায়নি। যেন কোন জাদুপুরীর জানলা খুলে দিয়ে তিনি আমাদের তাঁর স্বদেশের আলোর কণা প্রত্যক্ষ করালেন।

সাধারণ দর্শক বিশেষ করে কিশোর ও তরুণদের আমি খুবই প্রিয় ছিলাম, যেখানেই গিয়েছি কলকণ্ঠ অভিনন্দন পেয়েছি এবং স্বাক্ষর-শিকারীরা আমায় ঘিরে ধরেছে। আজ পর্যন্ত, প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে দীর্ঘ কাল আগে অবসর নেওয়া সত্ত্বেও, আমি কোন ক্রিকেট মাঠে হাজির হলেই অগণিত মানুষ আমার কাছে স্বাক্ষর চাইত। এবং সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাট হাতে ধরে বিজলী চমকানো মারের সাহায্যে কিছু দ্রুত রান তোলার পরেই আমি সবচেয়ে আনন্দ পাই স্বাক্ষর শিকারীদের আকাঙ্খাপূরণে। শুভানুধ্যায়ী সুহৃৎ আমার জনতাপরিবৃত অবস্থা দেখে স্বাক্ষর দানে বিরত হবার উপদেশ দিয়ে থাকেন; কিন্তু তাদের উপদেশ আমি মানতে পারিনা। কারণ আমর নিজের বিচারে যারা আমার হস্তলিপি সংগ্রহ করে তাদের সেই সম্মান প্রদর্শনের মর্যাদা রক্ষা আমার অবশ্য কর্তব্য।

বিচ্ছেদ সব অবস্থাতেই বেদনাদায়ক। দেশে রওনা হবার দিন যতই

এগিয়ে এল মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠ্‌লো। এই ক্রিকেট পরিবেশ, অগণিত গুণগ্রাহী বন্ধুর দল সব কিছু পিছনে ফেলে চলে যেতে হবে। ছমাস দেশ ছেড়ে সবাইকে ছেড়ে রয়েছি, অসুস্থ মাকে রেখে এসেছি বাড়িতে। এতদিন খেলার উন্মাদনায় বাড়ির কথা মনের এককোণে সরে ছিল। এখন খেলার অবসানে বাড়ির জন্য মন আকুল হয়ে উঠলো। অপ্রত্যাশিত সার্থকতায় মন আমার কানায় কানায় ভরা। সেই ভরা মন নিয়ে সার্থকতার ডালি মায়ের পায়ে নিবেদন করতে চাই। কয়েক হাজার মাইল দূরে বসে তিনি আমার জন্য নিয়ত প্রার্থনা করেছেন, আশীর্বাদ করেছেন, তারই জোরে আমি কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছি। তার সুফল তো মায়েরই প্রাপ্য। সব ছেলের কাছে তার বাপ মা অতুলনীয়, তবু আমি বলবো আমার জীবনের সব কিছুই তাঁদের চেষ্টা, উৎসাহ ও শুভেচ্ছারই বলে সম্ভব হয়েছে। বাবা মা, ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে পুনর্মিলনের আগ্রহ নিয়ে যাত্রার দিনটির প্রতীক্ষা করতে থাকলাম।

যেদিন রওনা হওয়ার কথা, দেখলাম অধিনায়ক মহারাজকুমার আমাদের অনাথকরে ছেড়ে চলে গেছেন, কারণ তিনি ফিরেছেন বিমানে। আর বৃটিশ ম্যানেজার স্বদেশেই রয়ে গেলেন কিছুদিনের জন্য। ডোভার ও প্যারিস হয়ে এসে যেদিন মার্সাই-এ এস এস ভাইসরয় অব ইণ্ডিয়া জাহাজে উঠবো, তখন সি কে নাইডুর জরুরী ডাক পেলেন নিউ ইয়র্কে হোলকারের কাছ থেকে।

অতএব অভিভাবকহীন হয়েই আমরা বারটি বৈচিত্রহীন দিন জাহাজে ভাসলাম। দিগন্তে ভারতের রেখা দেখেই মন নেচে উঠলো, বুকভরে ভারতের বায়ু নিঃশ্বাস নিলাম। জাহাজ ঘাটে কিছু সংখ্যক লোক আমাদের স্বাগত জানালো। তিনদিন বাদে ইন্দোরের পরিচিত জনতার সঙ্গে পথ চলছি। কদিনের মধ্যেই উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে এল, ইংল্যাণ্ড সফর স্মৃতিতে পর্যবসিত হল।

বলা বাহুল্য দশবছর বাদে দ্বিতীয় ইংল্যাণ্ড সফরে প্রথমবারের উত্তেজনা বোধ করেনি। চেনা মানুষ আর চেনা জায়গাই শুধু সন্ধান করেছি। তাছাড়া প্রথম সফরে আমি একুশ বছরের তরুণ, পরের দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষদিকে এবং যুদ্ধোত্তর কয়েক বছর কাল পর্যন্ত স্বদেশে খুবই ভালো খেলা সত্ত্বেও ১৯৪৮-এর সফরে আমি ১৯৩৬-এর সার্থকতার কাছাকাছি পৌছতে পারিনি।

ইংল্যাণ্ড সফরেই আমি নিজেকে গড়ার ভিত্তিভূমি অর্জন করলাম। এবার আমার দেশের লোককে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেবার দায়িত্ব, ইংল্যাণ্ডে যা করেছি এবং সে দেশের মানুষ আমাকে নিয়ে যা উচ্ছ্বাস করেছে, তা হঠাৎ আলোর ঝলকানি নয়।

ক্রিকেটের দক্ষতা বিকাশ ও প্রকাশের সুযোগ ততদিনে ভারতে অনেক বেড়ে গেছে। বোম্বাই-এর পঞ্চদলীয় প্রতিযোগিতা তো রয়েছেই, তাছাড়া রঞ্জি ট্রফির জাতীয় প্রতিযোগিতাও দৃঢ়মূল হয়েছে। এখন থেকে আমার লক্ষ্য হল জাতীয় প্রতিযোগিতার পূর্ণ প্রসারে অংশগ্রহণ করা, আর তারই সাহায্যে নিজের পূর্ণবিকাশ সাধন।

ষোল
ওপেনিং ব্যাট

খুবই বিস্ময়ের কথা আমাদের দলপতি মহারাজকুমার ব্যাটিং অর্ডার সম্পর্কে যে অস্থিরমতিত্ব দেখিয়েছিলেন সব সময়—তাতে মস্ত এক সুফল ফলেছিল। কারণ তারি ফলে ভারতের শ্রেষ্ঠ ওপেনিং জুড়ি ব্যাটসম্যানের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে,—আমি ও বিজয় মার্চেণ্ট।

অতীতে আমাকে পঞ্চদলীয় প্রতিযোগিতায় ইংনিস সূচনা করতে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু ব্যাটিং-এ ওইটিই যে আমার নিজস্ব স্থান, এমন প্রসঙ্গ কখনো উঠেনি। ১৯৩৫-৩৬ সালে রঞ্জি ট্রফির যে কটি খেলায় অংশগ্রহণ করেছি, কোনটিতেই আমার দলের ইনিংস সূচনা করতে আমার ডাক পড়েনি।

১৯৩০ সালে আমি তখন পর্যন্ত শুধুই বোলার, ব্যাটসম্যান হিসেবে না আছে আমার আত্মবিশ্বাস। না থাকলেও কারো না কারো কিছুটা বিশ্বাস আমার উপর জেগেছিল, নইলে হবস—সাটক্লিফ সমেত ভিজিয়ানাগ্রামের দলের পক্ষে এলাহাবাদ দলের বিরুদ্ধে আমাকে কেন পাঠানো হল সি কে'র সঙ্গে ওপেনিং ব্যাট হিসেবে! বিশ্বাস আমি রক্ষা করেছিলাম ৫৩ রান করে, সি কে কিন্তু ২১ করেই আউট গিয়েছিলেন।

সেই অভিজ্ঞতা থেকেই কিনা জানিনা অধিনায়ক হিসেবে সি কেই

আমাকে পাঠিয়েছিলেন জার্ডিন চালিত ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে কলকাতা ইডেনগার্ডেন মাঠে অনুষ্ঠিত আমার জীবনের সর্বপ্রথম টেষ্টে ভারতের হয়ে দ্বিতীয় ইনিংস ওপেন করতে, সঙ্গে ছিলেন নাওমল। মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত তৃতীয় টেষ্টেও তাই ঘটেছিল।

ব্যাটিংএর সূচনায় ধৈর্য দরকার, তার অভাব আমার মধ্যে বরাবর। তবু যে দ্রোণাচার্যের মত গুরু সি কে আমাকে বারবার ইনিংস সূচনার সুযোগ দিয়েছিলেন কিছু সম্ভাবনা বুঝেছিলেন নিশ্চয়ই। জ্যাক রাইডারের অষ্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বেসরকারী টেষ্টে সি কে আমাকে উজীর আলির সঙ্গে প্রথম জুড়ি হিসাবে উইকেটে পাঠিয়েছিলেন। মাদ্রাজে চতুর্থ বেসরকারী টেষ্টে অধিনায়ক উজির আলিও সি কে-র পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। বাংলার কার্তিক বসু ও আমি ইনিংস ওপেন করেছিলাম।

এতদসত্ত্বেও আমার কোনদিন মনে হয়নি আমাকে ভারতের ওপেনিং ব্যাট হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বেলা শেষে দ্বিতীয় ইনিংস সূচনার নানাদিক বিবেচনা করেই বোধ হয় আমাকে পাঠানো হয়েছিল। আলো যখন পড়ে আসছে, তখন ভালো ব্যাটসম্যানকে পাঠাবার ঝুঁকি না নিয়ে ফালতু ব্যাটসম্যানদের পাঠানো হয়তো বুদ্ধিমান অধিনায়কের সুবিবেচনা। অথবা আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি ও সঠিক পদচালনার ওপর সি কের হয়তো পূর্ণ আস্থা ছিল। যাই হোক না কেন, ইংল্যাণ্ড যাত্রার প্রাক্‌কালে আমি ঘুণাক্ষরেও নিজেকে ওপেনিং ব্যাটসম্যান বলে কল্পনা করিনি।

ইংল্যাণ্ড সফরের প্রথম সরকারী ম্যাচে পালিয়ার সঙ্গে আমাকেই ইনিংস সূচনা করতে পাঠানো হয়েছিল। পরবর্তী ম্যাচে আমি খেলিনি, ইনিংস সূচনা করেন শুঁটে ব্যানার্জী ও হিণ্ডেলকার। এর পর থেকে বেশিরভাগ খেলাতেই আমাকে পাঠানো হয়েছে হিণ্ডেলকারের সঙ্গে। হিণ্ডেলকারের অনুপস্থিতিতে আমার সাথী হয়েছেন পালিয়া। সর্বপ্রথম সূচনাতেই বোলারের সম্মুখীন আমাকে হতে হল লিষ্টার্সের খেলায়। ইয়র্কশায়ারের খেলায় ইনিংস সূচনা করলেন পালিয়া ও হিণ্ডেলকার, আমি আট নম্বরে খেললাম।

এর পর ডারহামসের বিরুদ্ধে দুদিনের খেলাটিতে একেবারে নতুন ব্যবস্থা। আমি, পালিয়া ও হিণ্ডলেকার সবাই টীমে রয়েছি তবু ইনিংস সূচনা করতে পাঠানো হল উজীর আলি ও মার্চেণ্টকে। যদিও মার্চেণ্ট ইতিপূর্বে প্রথম জুড়িতে কখনো নেমেছিল কিনা আমার সন্দেহ আছে, সারের বিরুদ্ধে খেলায় মার্চেণ্ট

একেবারে পয়লা ব্যাটসম্যান, সঙ্গী হিণ্ডলেকার। ঠিক এর পরের খেলা প্রথম টেষ্টে, সেখানেও অনুরূপ ব্যবস্থা। সারের মতন প্রথম টেষ্টেও আমি তিন নম্বরে খেলাম, তারপর যথাক্রমে সি কে, উজীর আলি ও পালিয়া। পয়লা ব্যাটসম্যান হিসেবে মার্চেণ্ট আমার চেয়ে বেশি সার্থকতা দেখালেন।

ল্যাঙ্কাশায়ারের খেলায় আরেক নতুন ওপেনিং জুড়ি, দিলওয়ার হোসেন ও এল পি জয়। পরবর্তী খেলায় উজির আলি ও মার্চেণ্ট, আর ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে ফিরতি খেলায় মার্চেণ্ট ও দিলওয়ার। এই খেলাতে বিজয় দুই ইনিংসেই শেষ পর্যন্ত অপরাজিত খেলে নিজেকে ভারতের শ্রেষ্ঠ ওপেনিং ব্যাটসম্যান রূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

যখন দ্বিতীয় টেষ্টে মার্চেণ্টের সঙ্গে আমাকে পাঠানো হল, সেই সর্ব প্রথম আমরা দুজনে মিলে ভারতীয় দলের ইনিংস সূচনার দায়িত্ব পেলাম, প্রথম ইনিংসে প্রথম জুড়িতে মাত্র ১৮ রান, কোন মতে সুবিধার বলা চলে না। কিন্তু দ্বিতীয় ইংনিংসে আমাদের অভাবনীয় সার্থকতায় আমরা দুজনে ভারতের আদর্শ ওপেনিং জুড়ি হিসেবে প্রতিভাত হলাম।

তা বলে সফরের বাকি সব খেলাগুলিতে আমরা দুজনে ইনিংস সূচনা করেছি, তা নয়। ওয়ারউইকশায়ারের বিরুদ্ধে সে দায়িত্ব পেলেন মার্চেণ্ট ও দিলাওয়ার। মার্চেণ্ট একরান করেই আউট হলেন, দিলাওয়ার ১০১ রান করে অপরাজিত রইলেন। ওই খেলায় আমি দলে ছিলাম না, তাই আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু গ্লস্টার্সের বিরুদ্ধে পরবর্তী খেলাটিতে আবার মার্চেণ্ট ও দিলাওয়ার, যথাক্রমে আট ও তিন করে দুজনেই আউট। আমাকে পাঠানো হল ছ'নম্বরে।

তৃতীয় টেষ্টে দ্বিতীয় টেষ্টের ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি। কিন্তু রঞ্জির নিজস্ব দল সাসেক্স কাউন্টির বিরুদ্ধে আবার ব্যবস্থা বদল। মার্চেণ্ট (৬২) ও দিলাওয়ার (১২২) সার্থক ইনিংস সূচনা করলেন! এতদিনে অধিনায়ক নিজেকে তিন নম্বরে তুলে এনেছেন! এ থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, সেঞ্চুরি করি আর যাই করি আমি পাকাপাকি ওপেনিং ব্যাট হিসেবে বিবেচিত নই। মার্চেণ্টের অনুপস্থিতিতে হিণ্ডেলকারের জুড়ি হিসেবেই যা আমাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

ভারতের মাটিতে লর্ড টেনিসনের দলের বিরুদ্ধে আমাদের পরবর্তী সীরিজে অধিনায়ক বিজয় মার্চেণ্ট নিজস্ব ধারায় চলেছেন। লাহোরের প্রথম বেসরকারি

টেষ্টে ইনিংস স্থচনা করতে তিনি হিণ্ডলেকারকে সাথী করে নিলেন, আমি গেলাম পাঁচ নম্বর। বম্বের দ্বিতীয় 'টেষ্টে'ও মার্চেণ্ট-হিণ্ডলেকার, আমি ছ নম্বর। কলকাতার তৃতীয় 'টেষ্টে' মার্চেণ্ট-হিণ্ডলেকার, আমি ছনম্বর। কলকাতার তৃতীয় 'টেষ্টে' হিণ্ডলেকার পয়লা ব্যাটসম্যান, আমি তাঁর সঙ্গী, মার্চেণ্ট নিজে খেললেন ছ নম্বর। মাদ্রাজের চতুর্থ টেষ্টে আমি দলে নেই, হিণ্ডলেকার ও শুঁটে ব্যানার্জী ইনিংস স্থচনা করলেন, মার্চেণ্ট গেলেন পাঁচ নম্বর। বম্বের পঞ্চম টেষ্টে আমি আবার দলভুক্ত এবং স্থচনায় হিণ্ডলেকারের সাথী, মার্চেণ্ট সেই পাঁচ নম্বরই।

পাঠকেরা কি ভাববেন জানিনা, আমার খুবই আশ্চর্য ঠেকেছে যে ইংল্যাণ্ড ১৯৩৬ সফরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেষ্টের পর মার্চেণ্ট ও আমি একত্রে কদাচিৎ ইনিংস স্থচনা করেছি।

১৯৪৫-এ অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস দলের বিরুদ্ধে প্রথম টেষ্টে তো আমার জায়গাই হয়নি। দ্বিতীয় টেষ্টে আমি তিন নম্বর ব্যাট করেছিলাম। পয়লা নম্বর মার্চেণ্ট এর সঙ্গে দু নম্বর ছিলেন মানকড। বোম্বের তৃতীয় টেষ্টে মার্চেণ্ট আবার দীর্ঘকাল পরে আমাকে ইনিংস স্থচনায় সাথী করে নিলেন।

১৯৪৬-এর ইংল্যাণ্ড সফরে মার্চেণ্ট প্রায় নিয়মিতভাবেই পয়লা নম্বর ব্যাট করেছেন এবং অধিকাংশ সময়েই আমি তাঁর সঙ্গী। তবে মানকড়, হাজারে, সোহোনি, আব্দুল হাফিজ সারভাতে ও অধিনায়ক পতৌদীর নবাব এঁরাও মাঝে মাঝে প্রথম জুড়িতে খেলেছেন।

প্রথম টেষ্টে আমি খেলিনি বলে মার্চেণ্টের সঙ্গে মানকড় দু নম্বর হয়েছিলেন। ওল্ড ট্রাফোর্ডেই আবার পুরানো কাহিনী পুনরাবৃত্তির আশায় আমরা আবার স্থচনায় সহযোগী হলাম। দুজনের জুড়িতে রান উঠলো ১২৪। সেই প্রেরণায় ওভালেও আমরা দুজনেই নামলাম, মাত্র ছ রানের জন্য শত রানের জুড়ি রানে বঞ্চিত হলাম। মার্চেণ্ট নিজস্ব সেঞ্চুরি করলেন, আমিও ৫০ পার হলাম, দুজনেই রান আউট।

১৯৪৭-৪৮ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে নির্বাচিত হয়েও আমার ও মার্চেণ্টের দুজনেরই যাওয়া হয়নি। এবং তারপর আমাদের টেষ্ট নির্বাচনই অনিশ্চিত হয়ে গেল। মার্চেণ্টকে স্বাস্থ্যের জন্য অধিকাংশ সরকারী ও বেসরকারী টেষ্ট থেকে সরে থাকতে হল, আর আমি নির্বাচকদের খেয়াল খুশির খপ্পরে পড়লাম, কখনো ডাক পাই, আবার অকারণে বাদ পড়ি।

রঞ্জি ট্রফির খেলায় মার্চেন্ট ও আমি দুদলে, কেউই প্রায় নিজের দলের হয়ে ইনিংস সূচনার দায়িত্ব বহন করিনি। মার্চেন্ট অধিকাংশ সময় পাঁচ নম্বর, আমি কখনো পাঁচ, কখনো ছয়। তবু ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে আমাদের সার্থকতার ফলে দেশে বিদেশে সর্বত্র আমরা আদর্শ ওপেনিং জুড়ি হিসেবে বিবেচিত হয়েছি যদিও নিয়মিত ওপেনিং ব্যাটসম্যানের দায়িত্ব বহন অধিকাংশ সময় হয়ে ওঠেনি, লক্ষ্য করার বিষয় যে ওপেনিং জুড়ি হিসাবে আমাদের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা একেবারে প্রথম প্রয়াসে ওল্ড ট্রাফোর্ডে ১৯৩৬ সালে। আমার চূড়ান্ত ব্যর্থতাও ওই ওল্ড ট্রাফোর্ডেই, ১৯৪৩ সালের দ্বিতীয় ইনিংসে এক রানও না উঠতেই জুড়ি ভেঙে গিয়েছিল।

স্বাধীন ভারতের মাটিতে প্রথম টেষ্ট খেলার সুযোগ পাই ১৯৪৮ সালে কলকাতায়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেষ্ট, সে বেলায় মার্চেন্ট ছিলেন না। কে সি ইব্রাহিমের সঙ্গে ইনিংস সূচনায় আমার নিজস্ব রান হয় প্রথম ইনিংসে ৫৪, দ্বিতীয় ইনিংসে বিজলী চমকানো ১০৬। পঞ্চাশের দশকে দুটি কমনওয়েথ দল ও এস-জে-ও-সি দলের বিরুদ্ধে বারকয়েক ইনিংস সূচনার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম।

বিধি বিড়ম্বনা। দেশে বিদেশে আমি ইনিংস সূচনাকারী ব্যাটসম্যান হিসেবে বিবেচিত ও স্বীকৃত হলাম। সারা জীবন, এবং অনেক ক্ষেত্রে সার্থকতাও লাভ করলাম ; কিন্তু সুযোগ তেমন মিললো না, কেন মিললো না, তা আমার জানার কথা নয়।

তবে যখনি সুযোগ পেয়েছি, ক্রিকেট, দর্শক সাধারণবৃন্দ ও দেশের প্রতি কর্তব্যে কখনো ত্রুটি করিনি। আজ ত্রিশ বৎসর ব্যাপী ক্রিকেট জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতে বসে ওইটি আমার একমাত্র সান্ত্বনা।

সতের

ইংল্যাণ্ডের প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন তরুণ দল

আমাদের ইংল্যাণ্ড সফরের ফলে সে দেশে ভারতীয় ক্রিকেট সম্পর্কে যে অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল তাতে উৎসাহ জাগলো, তাতে প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন তরুণদের পূর্ণ বিকাশে ভারতের ক্ষেত্র সহায়ক হবে। আর ভারতীয়

ক্রিকেটে তখন তরুণদের প্রচণ্ড আগ্রহ। ভালো দলের সঙ্গে খেলবার আগ্রহে দেশ তখন যে কোন দেশের ভালো খেলোয়াড় দলকে স্বাগত জানাতে আগ্রহী।

এমন সময় ভিক্টোরিয়া যুগের প্রখ্যাত কবি লর্ড টেনিসনের পৌত্র প্রখ্যাত ক্রিকেটার লর্ড টেনিসন প্রস্তাব করলেন, একটি শক্তিশালী দল নিয়ে ১৯৩৭-৩৮-এর শীতে ভারত সফর করবেন। দেশময় খেলোয়াড় ও সংগঠক মহলে এবং জনগণের মধ্যে উদ্দীপনা জেগে উঠলো।

লর্ড টেনিসনের খেলোয়াড় জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন অনেকদিন অতীত হয়েছে। ১৯১৩ সালে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট প্রথম প্রকাশেই সেঞ্চুরী করেছিলেন তিনি এবং সেই বছরই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পাঁচটি টেষ্টে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২১ সালে ডব্লু আর্মস্ট্রং-এর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া যখন ইংল্যাণ্ড সফরে আসে, টেষ্টে ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক নির্বাচিত হন লর্ড টেনিসন।

সফরটি বেসরকারী, যে সব তরুন খেলোয়াড় ইংল্যাণ্ডে সদ্য খ্যাতি অর্জন করেছেন তাদের নিয়ে গঠিত এই দল। জেমস ল্যাংগ্রিজ, টি এস ওয়ার্দিংটন, জো হাউস্তাস প্রত্যেকে ১৯৩৬-এর সফরে ভারতের বিরুদ্ধে খেলায় তাঁদের দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ব্যক্তিগত ভাবে আমার আগ্রহ ছিল আলফ গোভার সম্পর্কে, ইংল্যাণ্ড সফরে আমার সঙ্গে যে দ্বৈতযুদ্ধ চলেছিল, তারই পুনরাবৃত্তির জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। পরবর্তী কালে গোভার তরুণ প্রতিভাধরদের ক্রিকেট প্রশিক্ষণের জন্য একটি স্কুল করেছিলেন। ওই স্কুলের আদর্শ আমাদের দেশে অনুসরণ করা হলে এদেশে আগ্রহীদের শিখবার সুযোগ হতে পারে।

আমার নিজের ধারণা টেনিসনের দলে ভবিষ্যৎ ইংল্যাণ্ড দল অঙ্কুরিত হয়েছিল। নর্মাল ইয়ার্ডলে, বিল এডরিচ, পি এ গিব, আয়ান পেরলস, জর্জ পোপ ও এ ডব্লু ওয়েলার্ড সকলেই প্রতিভাধর ক্রিকেটার ছিলেন। এঁদের সকলেরই যে পূর্ণ বিকাশ ঘটেনি, সে দোষ তাঁদের নয়, কারণ দুবছর বাদেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হওয়াতে সব তছনছ হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধে ভেরিটির মৃত্যু ঘটেছিল, কিন্তু গোলাবারুদের আঘাতে প্রাণ না হারিয়েও অসংখ্য তরুণের জীবনের সব সম্ভাবনা নিঃশেষে বিনষ্ট হয়েছিল ওই যুদ্ধে। ওয়ালি হ্যামণ্ড দলভুক্ত না হওয়াতে এদেশে কিছুটা নৈরাশ্য জেগেছিল। আর একবার হ্যামণ্ডের

খেলা দেখার ও তাঁর বিরুদ্ধে খেলবার আগ্রহ আমারও প্রবল ছিল। তবু স্বীকার করতে বাধা নেই যে ও পক্ষে হ্যামণ্ড না আসার ফলেই দুই দলে কিছুটা সমতা রক্ষা হয়েছিল। লর্ড টেনিসনের দলের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ লাহোরে অনুষ্ঠিত প্রথম বে-সরকারী টেষ্টে। আমাদের সকলের আনন্দের কারণ হয়েছিল সব কটি টেষ্টের অধিনায়ক হিসেবে বিজয় মার্চেণ্টের মনোনয়ন। মনে হল আমাদের ক্রিকেট পরিচালকরা বুঝি শেষ পর্যন্ত রাজা-নবাব বাতিক থেকে মুক্ত হলেন। পরবর্তী ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে যে ওই মুক্তি একান্তই সাময়িক।

ব্যাটে-বলে সমতাযুক্ত দল নিয়েও ভারতীয় একাদশের শোচনীয় অবস্থা হল। কোন ব্যাটসম্যান কোন ইনিংসে ৫০ রাণ করতে পারেনি। আমি দুবারই গোভারের শিকার হলাম এবং মুখ্যত গোভারের বোলিং এর (১০৬ রাণে ১০ উইঃ) সাহায্যেই লর্ড টেনিসনের দল জয়ী হল। খেলাটিতে রাণ বেশি ওঠেনি, ইয়ার্ডলেই যা ৯৬ রাণ করেছিল। দ্বিতীয় দিনে খেলার মধ্যে ভূমিকম্পের ফলে সাংঘাতিক ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল, যদিও ভূমিকম্প তেমন সাংঘাতিক হয়নি। দুমিনিট মাত্র খেলা বন্ধ ছিল।

মাত্র দুদিন বাদেই আমি আবার ওদের বিরুদ্ধে নামলাম, এবার রাজপুতানা দলের হয়ে, আজমীড়ের মনোমোহন মেয়ো কলেজ মাঠে। দলনেতা ছিলেন ডুমারপুরের মহারাজওয়ালা, তরুণ বয়সেই তিনি ক্রিকেটে দক্ষতা দেখান, যদিও নিজের প্রকৃত যোগ্যতা সম্পর্কে তিনি মোটেই সচেতন ছিলেন না। দুই রাজকুমার মহীপালসিং ও রাজসিং ওই দলভুক্ত ছিলেন। দুজনেই কৃতী খেলোয়াড়। পরবর্তী কালে রাজসিং রঞ্জি ট্রফিতে রাজস্থান দলের নেতৃত্ব করেছেন এবং দলীপ ট্রফিতে কৃতিত্বের সঙ্গে খেলেছেন। হিণ্ডেলকারের সঙ্গে আমি ইনিংস সূচনা করি। দুজনে মিলে দ্রুত শতরাণ পার হয়ে যাই, গোভারকে আমি নির্মমভাবে পিটিয়েছি। নিজস্ব শতরানের আশা যখন প্রবল, সেই সময় আমি স্মিথের বলে এল বি হই, তবু এইটুকু সান্ত্বনা ছিল যে গোভারের বলে আউট হইনি। প্রথম ইনিংসে আমরা ২৫ রানে এগিয়ে ছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে কে কেশরীর দুর্দান্ত বোলিং-এ (৪১ রানে ৭ উই) টেনিসনের দল মাত্র ১১২ রাণে খতম হয়ে যায়। তা বলে আমরা ওদের চেয়ে ভালো খেলিনি দ্বিতীয় ইনিংসে, ৮৯ রান করে বিজয়ী অবশ্য হলাম আমরা কিন্তু আটটি উইকেট হারিয়ে, পোপ ২৭ রাণে পাঁচ উইকেট

নিলেন, এই জয়ে বোলার হিসেবে আমার সামান্ত অবদান ছিল। দীর্ঘ দিন পরে বল করবার সুযোগ পেয়ে আমি ছ ওভারে ২৮ রান দিয়ে জেমস ল্যাংগ্রিজকে (১৫) বোল্ড আউট করেছিলাম।

বম্বের দ্বিতীয় 'টেষ্ট' ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে। প্রথম বড় খেলাতে আমার জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা, ঝকমকে পরিবেশ, লোকে লোকারণ্য, সব রকম আরামের ব্যবস্থা, গণ্যমাগুদের সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের ও খেলোয়াড়দের বিশেষ ব্যবস্থা, বিলাস বহুল বসার ঘর, সাজঘর, প্রশস্ত বারান্দা আজকের দিনে ওই সবে এদেশের মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গেছে; কিন্তু সেদিন সব কিছুই ছিল অভিনব, তাই প্রবল উত্তেজনা বোধ করেছিলাম।

আজকাল ব্রেবোর্ণ উইকেট 'ব্যাটসম্যানের স্বর্গ' বলে পরিচিত। কিন্তু সেই খেলায় রান বেশি ওঠেনি। চার দিনে ৩৪ টি উইকেট পড়ে মোট রাণ হয়েছিল ৭২৩, গোভার (১৩৪ রানে ১০ উইঃ) ও ওয়েলার্ড (৯১ রানে ৭ উইকেট) টেনিসন দলের হয়ে বোলিংএ সাফল্য অর্জন করেন। উইকেট যে বোলারের পক্ষে নৈরাশ্যজনক এমন মনে হয়নি। শুঁটে ব্যানার্জী কোন নালিশ করেননি, যদিচ 'টেষ্ট' ম্যাচে তিনি ৬৩ রান দিয়ে মাত্র তিনটি উইকেট পান। বরং ব্রেবোর্ণ উইকেট সম্পর্কে তাঁর অনুকুল মনোভাবই ছিল স্বাভাবিক। মাত্র দুদিন আগে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম ক্রিকেট ম্যাচে সি, সি. আই-র পক্ষে বল করে তিনি ৮৯ রানে ছ উইকেট দখল করেন, অথচ সে ম্যাচে টেনিসন দল ৩৬৭ তোলে। সি সি আই ফলো-অন করেও কোন মতে পরাজয় এড়াতে পেরেছিল।

'টেষ্ট' ম্যাচে কিন্তু লর্ড টেনিসনের দল ছ উইকেটে জয়ী হল। ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামে খেলা হওয়া ছাড়া আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনাও ঘটলো সেখানে। এক তরুণ চৌকষ খেলোয়াড় বিনু মানকড় সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় দলের হয়ে খেললেন সেখানে। টেনিসন দলের বিরুদ্ধে মানকড়ের প্রথম প্রকাশ জ্যাম সাহেবের একাদশের পক্ষে, রণবীর সিংজীর সঙ্গে ইনিংস সূচনা করে তিনি ৬২ ও ৬৭ রাণ করেন। এরপর সি সি আই-র পক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি করেন ৫০। এই দুই খেলার ভিত্তিতেই তিনি দ্বিতীয় 'টেষ্ট' দলে অন্তর্ভুক্ত হন। তবে আমার মনে হয় পূর্ববর্তী (১৯৩৬-৩৭) রঞ্জি ট্রফিতে খেলার ভিত্তিতে তাঁকে প্রথম 'টেস্টে'ই মনোনয়ন করা উচিত ছিল। রঞ্জি প্রতিযোগিতায় মানকড়ের প্রথম প্রকাশ সিন্ধু প্রদেশের বিরুদ্ধে

খেলাটিতে, সেই খেলায় এক নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনি দুর্দান্ত ও দুঃসাহসী খেলায় ৮৬ রান করেছিলেন। তাছাড়া সেবারের সমগ্র রঞ্জি ট্রফিখেলায় আট ইনিংসে তাঁর মোট রাণ হয়েছিল ৩২১, প্রথম প্রকাশেই রঞ্জিট্রফি লাভ করলো নবনার. ফাইনালে বাংলাকে হারালো, সেই জয়েরও মূল স্থপতি মানকড়, এক ইনিংসে ১৮৫ করেছিলেন তিনি।

মানকড়কে কিন্তু 'টেষ্টে' ইনিংস সূচনা করতে পাঠানো হল না। অল্প রানে মার্চেণ্ট নিজে আউট হবার পর মানকড় তিন নম্বর এলেন। তবু মানকড়-এর ৩৮ই হল দলের প্রথম ইনিংসের মোট রান ১৫৩-র মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যক্তিগত রাণ। দ্বিতীয় ইনিংসে মানকড়ের ৮৮ রান বাদ দিলে ভারতীয় দলের ব্যাটিং-এ না ছিল প্রাণ, না ছিল বৈশিষ্ট্য বা সৌন্দর্য্য। আমিও খুব বাজে খেলেছিলাম।

প্রতিপক্ষ দলের খেলাও তেমন কিছু হল না। প্রথম ইনিংসে ১৯১ রানেই শেষ। ভারতীয় বোলাররা কেউ বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে না পারলেও ছ জন বোলার ভাগাভাগি করে উইকেট নিলেন। ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসে উঠলো ২০৮। প্রতিপক্ষের বিজয় লক্ষ্য ১৭১। ২০ রানে তিন উইকেট পড়ে গেল। কিন্তু তারপর এডরিচ (৮৬) ও ওয়াদিংটন (৪৯) দুজনে মিলেই ম্যাচ জিতে নিলেন।

এর পর লর্ড টেনিসন ও তাঁর দলের সম্মুখীন হলাম, আমার নিজস্ব শহর ইন্দোরে। সি কে নাইডুর নেতৃত্বে শক্তিশালী মধ্যভারত দল সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে খেললো। আমি ছোট ভাই ইশতিয়ারকে নিয়ে ইনিংস সূচনা করতে গিয়ে অল্প রানেই আউট হলাম। ইশতিয়ারের আত্মরক্ষামূলক সাবধানী খেলায় ভুলত্রুটি ছিল না। ফলে সে ভালো রান করলো ও অনেকক্ষণ খেললো। ভাণ্ডারকর, সি.কে. ও হাজারে—কেউ সুবিধা করতে পারলেন না। কিন্তু ক্ষুদ্রাকৃতি ভায়া ইশতিয়ারের সঙ্গে যোগ দিয়ে দুজনে মিলে ৫০ এর বেশি রান যোগ করলেন। খেলাও মনোজ্ঞ হল, ইশতিয়ারের সাবধানী মার, ভায়ার মার উদ্ধত। উদ্ধত ইশতিয়ার আউট হবার অল্প পরেই ইনিংসও শেষ হল। টেনিসনের দল ব্যাট করতে নেমে হাজারের বলে বিশেষ বিব্রত মনে হল। ওয়াদিংটনের ৬২ রান সত্বেও ওরা প্রথম ইনিংসে মাত্র এক রানে এগিয়ে রইল, দ্বিতীয় ইনিংসেও আমি পোপের বলে আউট হলাম, রান করলাম ২৮।৯ উইকেটে ১৮২ রান হতেই সি কে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

খেলা অমীমাংসিত রইল। এই উপলক্ষে যার খেলা আমার সব চাইতে মনে ধরেছিল ডালি কলেজের সেই ছাত্র ক্রিকেটার সরদার মহম্মদ খান কিন্তু পরবর্তী জীবনে কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি।

ইডেন গার্ডেনস-এর তৃতীয় 'টেষ্ট' ম্যাচে ভাগ্য আমার প্রতি প্রসন্ন হল। হিণ্ডেলেকারের সঙ্গে ইনিংস সূচনা করার দায়িত্ব পেলাম। ভারি আবহাওয়ায় বল যথেষ্ট সুইং করছিল, কিন্তু আমাকে দমাতে পারেনি। ২৪ রান হতেই হিণ্ডলেকার ফিরে গেলেন, এল ভিন্নু, দুজনে মিলে ১০৯ যোগ করলাম। এরপর এলেন অমরনাথ ততক্ষণে আমার হাত জমে গেছে। দুজনে মিলে যখন ৭৭ রান যোগ হয়েছে সেই সঙ্গে আমার নিজস্ব শতরাণ পূর্ণ, ইডেনে আমার প্রথম সেঞ্চুরি, কলকাতার দর্শকরা আনন্দে উদ্বেল। আমার ৯৯ উঠতেই গোভারকে বল দেওয়া হল। দক্ষিণ দিক থেকে বল করতে ছুটছেন গোভার, সূচীভেদ্য নীরবতা। স্লিপের ফাঁক দিয়ে কাট মেরে এক রান নিলাম আমি। বিপুল হর্ষধ্বনির রেশ মেলাতে না মেলাতে এবং মাত্র আর এক রাণ যোগ হতেই গোভারেরই বলে মিড-অনে ধরা পড়লাম। পুব দিকের দর্শকগণ থেকে মালা নিয়ে ছুটে এল এক তরুণ, সে আনন্দোজ্বল মুখ আজো চোখের সামনে ভাসছে।

৯৬ রান করে অমরনাথ ওয়ার্দিংটনের বলে কড়া ড্রাইভ মারলেন, কিন্তু হাউস্টাফ বাউণ্ডারি বাঁচিয়ে দিলেন, যোগ হল মাত্র একরান। পরের বলেই মার্চেন্ট আউট। আব্বাস খানকে সাথী করে অমর নাথ দিনের শেষ ওভারে নিজস্ব শতরান পূর্ণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মালা হাতে ছুটে এল সেই একই যুবক। অমর নাথেরও ওইটিই ইডেনে প্রথম সেঞ্চুরি। কলকাতার রসিক দর্শক তার মর্যাদা দানে ক্রুটি করলো না। আজও ভেবে পাইনি, কি ভেবে মালা দুটি সেই তরুণ সংগ্রহ করে রেখেছিল। ইডেনের ধারে কাছেও ফুলের মালা বিক্রি হত না সে যুগে, আজও বোধ হয় সেই অবস্থা।

পোপ, গোভার, ওয়েলার্ড, ল্যাংগ্রিজের মত বোলিং শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম দিনের শেষে আমাদের পাঁচ উইকেটে ৩১৩ রান হওয়াতে সকলেই পরিতৃপ্ত। পরদিন পোপ মারাত্মক বোলিং করলেন (৩৫ রানে ৫ উইঃ), যার ফলে আমাদের বাকি পাঁচ উইকেটে যোগ হল মাত্র ৩৭, তার মধ্যে ২১ রানই অমর নাথের।

নিসার ও অমর নাথ বলে তীব্র হলাহল ছাড়লেন, ৯৩ রান পিছিয়ে

ইনিংস শেষ করলো লর্ড টেনিসনের দল। দ্বিতীয় ইনিংসে দুপক্ষের সমান রাণ বা টাই, ১৯২। প্রথম ইনিংসের ৩৭ রানের ব্যবধানেই জয়ী হল ভারতীয় দল। দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনায় হিণ্ডলেকার ও আমি একশ'র বেশি রান তুলেছিলাম। ল্যাংগ্রিজের বাঁহাতের লেগব্রেক সঠিক লক্ষ্যে পড়ছিল, যেমন তার ফ্লাইট, তেমনি আঙুলে মোচড় দেওয়া স্পিন, ওয়েলার্ডের বোলিং-ছিল অনবদ্য, যদিচ ফিল্ডিং-এর ত্রুটির ফলে তিনি যথোচিত সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি। তবু মুখ্যত ওই দুজনের প্রয়াসেই মাত্র ১৯২ রানে আমাদের ইনিংস শেষ হয়ে গেল। আমাদের পক্ষে মানকড় ও অমর সিং মারাত্মক বোলিং করলেন। কলকাতা 'টেষ্টে' জয় লাভ করেও সীরিজে আমরা ১—২ ম্যাচে পিছিয়ে রইলাম।

খেলার পরে ক্রিকেট অ্যাসোশিয়েশান অব বেঙ্গল আয়োজিত ভোজসভায় সভাপতি আর বি ল্যাগডেন বাংলার খেলোয়াড়দের প্রতি নির্বাচকদের অবিচারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। মাত্র একজন সদস্য ও অধিনায়ক মিলে দল নির্বাচনের প্রচলিত প্রথারও সমালোচনা করলেন তিনি। কলকাতার পত্রপত্রিকাগুলিও ল্যাগডেনের সুরে সুর মেলালো, কার্তিক বসু ও কমল ভট্টাচার্য ভারতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত না হবার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করলো। আমি যতদূর জানি কার্তিক বসু দলভুক্ত ছিলেন, কিন্তু আগের রাত্রে বম্বে থেকে ফিরে তিনি অবসন্ন ছিলেন বলে খেলেননি। তাঁর ঠাঁই নিয়েছিলেন আব্বাস খাঁ। কমল ভট্টাচার্যকে আমি বরাবরই প্রথম শ্রেণীর চৌকষ ক্রিকেটার বলে গণ্য করেছি। বিদেশী দলগুলির বিরুদ্ধে ও রঞ্জি ট্রফির খেলায় তিনি বরাবরই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তবু কেন যে নির্বাচকরা বরাবরই চোখ বুঁজে থেকেছেন জানি না। তার জন্য বাংলা দেশে অন্তর্দাহ অনুভূত হলে, তার মধ্যে অন্যায় কিছু দেখিনা আমি।

সেই ভোজসভাটি আমার স্মৃতিপটে আজও সজীব, বিশেষ করে লর্ড টেনিসনের রসাল বক্তৃতা। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি একটি কাহিনীর উল্লেখ করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত এক টেষ্ট ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কলিনস চার ঘণ্টা ব্যাটিং করে মাত্র ত্রিশ রানে তখনো নট আউট। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক টেনিসন তাকে আউট করার জন্য নানা প্রচেষ্টা করছেন, এমন সময় জনতার ভিতর থেকে একজন চীৎকার করে উঠলো, তোমার ঠাকুর্দার একটা কবিতা ওকে পড়ে শোনালে এখনি ও মাঠ ছেড়ে পালাবে।

মাদ্রাজে চতুর্থ 'টেষ্ট'-এর ফলাফলে সমান সমান হয়ে গেল। ভারতীয় দল এক ইনিংস ও ছ রানে জিতে গেল সে ম্যাচ। সে জয়ের প্রধান কৃতিত্ব ভিনু মানকড়ের। সেঞ্চুরি করা ছাড়াও ১৮ রানে তিনটি উইকেট নিলেন ভিনু। অমর সিং ৩৮ রানে পাঁচ উইকেট নিলেন। ফলে ইংল্যাণ্ডকে ফলো-অন করতে হল। দ্বিতীয় ইনিংসেও ভিনু ও অমর সিং-এর যুগ্ম আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারলোনা টেনিসনের দল। কোন বিদেশী সফরকারী দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল এই প্রথম ইনিংস বিজয়ী হল।

অতবড় গৌরবে আমি কিন্তু অংশীদার হতে পারিনি। রঞ্জি ট্রফি খেলে কলকাতা থেকে ফেরার পথে জ্বর হয়েছিল আমার। নিসারও খেলতে পারেন নি সেই ম্যাচে। সুস্থ হয়ে পরবর্তী বম্বে 'টেষ্ট' খেললাম আমি। এই প্রথম বম্বেতে দুটি 'টেষ্ট' দেওয়া হল, অবশ্য বেসরকারী 'টেষ্ট'। এরপর বম্বেতে একই বারে দুটি সরকারী টেষ্টও খেলা হয়েছে (১৯৪৮-৪৯)। ক্রিকেট কেন্দ্র হিসেবে বম্বের অপরিসীম গুরুত্ব সত্ত্বেও সেখানে একই সিরিজের দুটি টেষ্ট পরবর্তী কালে আর সম্ভব হয়নি। স্বাধীন ভারতে দিল্লীতে টেষ্ট ম্যাচ আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। তাছাড়া সারা ভারতে ক্রিকেট আগ্রহের ব্যাপক প্রসারের ফলে টেষ্ট ম্যাচের দাবিদার সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে। বম্বের দ্বিতীয় ও সীরিজের পঞ্চম টেষ্টে লর্ড টেনিসন মাদ্রাজে পরাজয়ের পূর্ণ প্রতিশোধ নিলেন, মাদ্রাজের মত এখানেও তিন দিনেই খেল খতম।

খেলাটিতে বোলারদেরই আধিপত্য। টসে জিতেও লর্ড টেনিসনের দলের প্রথম ইনিংস ১৩০ রানে শেষ হল। প্রথম ইনিংসে আমরা মাত্র এক রানে এগিয়ে রইলাম, তাও ১০০ রানের নিচে নটি উইকেট পড়ে যাবার পর ১১ নম্বর ব্যাটসম্যান আমির ইলাহীর কৃতিত্বেই তা সম্ভব হয়েছিল। সে এক এলাহী কাণ্ড, দোহাত্তা মারের ঠেলায় ৩৮ রানে অপরাজিত।

টেনিসনের দল ২৮৮ তোলার পর ভারত আবার সেই ১৩১। দ্বিতীয় ইনিংসে আমি কোন রান না উঠতেই আউট, সেই সময় মানকড় এসে করলেন ৫৭, দশ নম্বর এসে হাজারে করলেন ১৬, আর এগার নম্বর আমির ইলাহী ১৪। এই বিপর্যয় ঘটালেন ওয়েলার্ড, মোট ১১৭ রানে নটি উইকেট নিলেন তিনি। আর ব্যাটিং-এ তিনি আমাদের চোখ কপালে তোলালেন। অমর সিং-এর বলে তাঁর ছয়ের বাড়ির জোড়া মার আমি জীবনে দেখিনি, বলটা মনে হলো যেন মহাশূন্যে বেরিয়ে গেছে, শেষ পর্যন্ত স্টেডিয়ামের ওপার থেকে সেটি উদ্ধার

হয়েছিল। সি কে নাইডুও অমন মার কখনো মেরেছেন কিনা সন্দেহ। ওয়েলার্ডের আর একটি মার-এর উল্লেখ করেছেন প্রখ্যাত ক্রিকেট লেখক হার্ভি ডে। সে মারে বল পড়েছিল একটি চলতি মাল গাড়ির উপর, সমারসেট দিয়ে চলছিল সেই ট্রেনটি। বলটি শেষ পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছিল বার্মিংহাম থেকে। জীবনে দুবার তিনি এক ওভারে পাঁচটি করে ছয়ের বাড়ি মেরেছেন, প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে যা আর কেউ কখনো পারেন নি। প্রথমবার ১৯৩৬ সালে নিজস্ব কাউন্টি সমারসেটের হয়ে ডার্বিশায়ারের টি এন আর্মস্ট্রং-এর বলে, এবং দুবছর পরে কেন্টের বিরুদ্ধে ফ্র্যাঙ্ক উলির বলে।

ইংল্যাণ্ডের প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণের দলের ওই সফরে উভয় দেশেরই ক্রিকেট উপকৃত হয়েছিল। লর্ড টেনিসনের মধ্যে জার্ডিনের কঠোর সংগ্রামী চরিত্রের সন্ধান পাইনি ; তিনি ছিলেন দিলখোলা হাসিখুশি মানুষ, অধিনায়ক হিসেবে সাহসী অথচ খেলোয়াড়ী মনোভাব সম্পন্ন। ১৯৪৬ সালে আমি যখন মহারাজা হোলকারের সঙ্গে ইংল্যণ্ড গিয়েছিলাম, রেসকোর্সে হঠাৎ ওয়েলার্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ। দেখামাত্র হেসে অভিনন্দন জানালেন আমাকে, কথাও হল কিছুক্ষণ। ১৯৫১ সালে তাঁর মৃত্যুতে ক্রিকেটে বাদশাহী চরিত্র হারিয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে আমিও বেদনা বোধ করেছি।

আমাদের পক্ষে ওই সফরের প্রধান ফলশ্রুতি ভিন্থু মানকড়ের অভ্যুদয়। লর্ড টেনিসন তাঁর সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তা সার্থক হয়েছে। বেসরকারী হলেও এই প্রথম ভারতীয় দল পাঁচটি টেষ্ট খেলার মর্যাদা পেল। রাইডারের অস্ট্রেলিয়ান দল খেলেছিল চারদিন করে চারটি ‘টেষ্ট’। এবারও চার দিন করে, তবে খেলা পাঁচটি।

আজকের পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণেও আনন্দ পাচ্ছি যে সে যুগে চারদিনব্যাপী ‘টেষ্ট’ গুলির কোনটিই অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়নি। কোনমতে পরাজয় এড়ানোর উদ্দেশ্যে নেতিমূলক কৌশল অবলম্বন কোন পক্ষই করেনি।

আঠারো

টেষ্টের অনুকল্প

আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সরাসরি সরকারী টেষ্টের মাধ্যমেই ক্রিকেটের বৃহত্তর জগতে প্রবেশ করতে পেরেছিলাম। আমার প্রবীণতর সহযোগিদের কিন্তু সে ভাগ্য হয়নি। ১৯৩২ সালের সর্ব প্রথম টেষ্টে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের সকলকেই প্রতিযোগিতামূলক খেলার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে হয়েছিল। অথচ রঞ্জি ট্রফির জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রবর্তন ভারতের মাটিতে প্রথম সরকারী টেষ্ট সীরিজের পরবর্তী ঘটনা।

তার আগে প্রায় দু দশক কাল ভারতের মধ্যেকার বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়গুলিকে নিয়ে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা প্রচলিত থেকেছে, যে সংকীর্ণ চেতনা নিয়ে দল ভাগ হত, আজকের দৃষ্টি নিয়ে তা কোন মতেই সমর্থন করা সম্ভব নয়। তবু বলবো সে দিন সেই সব খেলায় কোন সাম্প্রদায়িক তিক্ততা ছিল না। প্রতিযোগিতা ছিল মূলত ক্রিকেটের, দল ভাগের চেয়ে ক্রিকেটে প্রতিযোগিতাই প্রাধান্য পেত এবং খেলোয়াড় ও দর্শকদের মধ্যে আজকের টেষ্ট ক্রিকেটের অনুরূপ উদ্দীপনাই দেখা যেত।

ইংরেজরা আমাদের যে সব উপহার দিয়েছে ক্রিকেট তার অন্যতম। এবং ক্রিকেট সংগঠনের মধ্য দিয়েও তারা ভারতের জাতীয় ঐক্য অস্বীকার করেছে। ভারত আবার একজাতি কিসের? গুটিকয়েক বিবদমান ধর্মীয় সম্প্রদায় মাত্র। কিন্তু সে যুগের সাম্প্রদায়িক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দল ভাগ সম্প্রদায়গত তো ছিলই, গায়ের চামড়ার রঙও সেখানে বিবেচ্য ছিল। প্রথম খেলা পার্শী বনাম ইয়োরোপীয়ান। তারপর যখন হিন্দু দল ও মুসলিম দল তৈরী হল। তখনো ইয়োরোপীয়ান দল হল খৃষ্টান দল না। ভারতীয় খৃষ্টানদের ওই প্রতিযোগিতায় জায়গা হয়েছে অনেক পরে, অবশিষ্ট দলের পক্ষে। দ্বি'দলীয় হিসেবে শুরু হয়ে পঞ্চ দলীয় প্রতিযোগিতায় পূর্ণ বিকাশ। ভারতের ক্রিকেটে অনেক নমস্য নাম ওই প্রতিযোগিতার সঙ্গেই মুখ্যত জড়িত হয়ে আছে, যথা ভিথাল, বাসু, কর্ণেল মিস্ত্রি, রামজী, ডাঃ কাঙ্গা, চন্দ্রানা, ভজিকদার, আব্বাস

সালাম, এস এম যোশী, সি কে নাইডু, ডি বি দেওধর, উজীর আলি, এল পি জয়, জে জি নাভলে। কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড়ও প্রাক-টেষ্ট যুগের ভারতীয় ক্রিকেটে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়ে বিচরণ করেছেন, যথা জি এইচ হার্স্ট, ফ্রাঙ্ক ট্যারাণ্ট, ডব্লু আর রোডস, আর জে ও নায়ার, এ এল হোসী। যদিচ আমি এবং আমার সমসাময়িক অনেক বম্বের সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতার আস্বাদ পাওয়ার আগেই টেষ্টের স্বাদ পেয়েছিলাম, কিন্তু পরবর্তী জীবনে সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তার চেয়ে কিছু কম উন্মাদনা উপলব্ধি করিনি, কম আনন্দও পাইনি। ন্যায়শাস্ত্রের মৌলিকনীতি বিরুদ্ধ দল বিভাগ—হিন্দু, মুসলিম, পার্শী ও ইয়োরোপীয়ান—এই ব্যবস্থার ফলে, পি এ কানিক্কাম, অ্যাণ্টনি ডি মোলা, ভিজয় হাজারের মত খেলোয়াড়দেরও ওই প্রতিযোগিতায় ঠাঁই হয়নি : হাজারেই যা বিলম্বে প্রবেশাধিকার পেয়ে অবশিষ্ট দলের হয়ে শেষ পর্যন্ত খেলতে পেয়েছিলেন, ওই প্রতিযোগিতার পূর্ণ বিকশিত পঞ্চদলীয় রূপে সর্বশেষ খেলাটিতে যাঁরা খেলেছিলেন, আমি তাদের একজন।

মহাত্মা গান্ধীর ডাণ্ডি পদযাত্রার পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য চার বছর বন্ধ থাকার পর ১৯৩৪ সালে যখন চতুর্দলীয় প্রতিযোগিতা আবার শুরু হয় সেই বছর মুসলিম দলের পক্ষে ওই প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম অংশগ্রহন করি। অবশ্য পরবর্তী কালের মত ত্রিশের দশকের প্রথম যুগের ওই রাজনৈতিক আন্দোলনে কোনরকম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি।

আমি প্রথম যে খেলাটিতে অংশগ্রহণ করি তাতে প্রবল অনিশ্চয়তার ফলে উত্তেজনা চরমে উঠেছিল। ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের এ এল যোসীর দশ বছরের রেকর্ড অল্পের জন্য ভাঙতে পারলেন না আমাদের দলপতি উজীর আলির অনুজ নাজির আলি। গল্প শুনেছি ২০০ রান পিটিয়ে হোসী ওই রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদলের বিরুদ্ধে উজীর আলি মাত্র তিন রানের জন্য ২০০ রানে বঞ্চিত হয়েছিলেন। নাজির আলি ওই বছর উজীরের খেলায় ৬০ রান করেছিলেন, এত দিন ওই ছিল তাঁর সর্বোচ্চ রান, এবার তিনি অনেক দূর এগিয়ে গেলেন, কিন্তু দাদার পূর্ববর্তী প্রয়াসেরই মত তিন রান পিছিয়ে রইলেন।

ফাইনালে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলিম দলকে জয়ী করলেন উজীর আলি,

যদিচ ব্যক্তিগত সার্থকতায় মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন চতুর্দলীয় প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ বীর সি কে নাইডু। বোলিং-এ নিসার ও অমর সিং দুদলে সমতা রক্ষা করেছিলেন, তবু যে মুসলিম দলই বিজয়ী হয়েছিল, তার মূলে ছিল ওদের দলগত সংহতি। মুসলিম দলের পক্ষে ফাইনালে সর্বোচ্চ রান করলেন লেফটেন্যান্ট এস এম হুসেন।

পরবর্তী ফাইনালে মুসলিম দল যে প্রথম ইনিংসে হিন্দুদলের চেয়ে সামান্য রানে এগিয়ে রইল, তার মূলেও ছিল সেই হুসেনের ব্যাটিং। দ্বিতীয় ইনিংসে উজির নাজির দুভাই সেঞ্চুরি করে মুসলিম দলকে বেশ এগিয়ে দেওয়ার ফলে হিন্দুদলের জয়লক্ষ্য হল ৩৬৭ রান। নাইডু প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছিলেন, এবারেও ৫৩ রান করলেন, কিন্তু আর সবার ব্যর্থতায় ১৪৫ রানে ইনিংস খতম, মুসলিম দল আবার বিজয়ী।

পরের বছর হিন্দুদল শোধ তুললো, প্রথম খেলাতেই হারিয়ে দিল মুসলিম দলকে। হিণ্ডেলকার চতুর্দ্দলীয় প্রতিযোগিতায় তাঁর একমাত্র সেঞ্চুরি করায় (১৫৩) হিন্দুদলের রান উঠলো ৪০১, জবাবে মুসলিম দল মাত্র ১৫০, তবে আমি এই প্রথম ভদ্রগোছের রান করলাম, ৫০। দ্বিতীয় ইনিংসে বিজয় মার্চেন্ট ১০৭ রানে অপরাজিত রইলেন। প্রতিযোগিতায় তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি। শুঁটে ব্যানার্জীর মারাত্মক বোলিং (২৯ রানে ৫ উইঃ) সত্ত্বেও মুসলিম দল সরাসরি পরাজয় এড়াতে পারলো। শেষ পর্যন্ত হিন্দু দলই চ্যাম্পিয়ান হল, শক্তিশালী ইয়োরোপীয়ান দলকে ফাইনালে হারিয়ে, অমরনাথ, ভিনু মানকড়, বিজয় মার্চেন্ট, শুঁটে ব্যানার্জী সকলেই ভালো রান করলেন।

এই ফাইনাল খেলাতেই আমি কাথিওয়াড়ের স্কুলছাত্র ভিনু মানকড়কে প্রথম চাক্ষুষ করলাম, তাঁর খেলায় প্রচুর সম্ভাবনা লক্ষ্য করলাম। আরও এক প্রথম দেখা—ফ্র্যাঙ্ক ট্যারান্ট, ওই প্রৌঢ় খেলোয়াড়ের অনবদ্য ৭৮ রান আমাকে বিস্মিত করলো। অস্ট্রেলিয়ায় জন্ম ওই মিডলসেক্সের পেশাদার খেলোয়াড় তাঁর সময়কার শ্রেষ্ঠ চৌকষ খেলোয়াড় বলে বিবেচিত। খেলোয়াড় জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি না ফুরোতেই ভারতবর্ষে চলে আসেন এবং এই দেশেই বাস করেন।

ট্যারেন্টের বলে যে কত বিষ আছে, তার প্রমাণ পেয়েছিল মুসলিম দল ১৯১৫-সালের খেলায়, ২০ রানে ও ৩৯ রানে ওদের দু'ইনিংস খতম হয়েছিল। ফাইনালে হিন্দু দলকে দশ উইকেটে হারিয়ে ইয়োরোপীয়ান দলের চ্যাম্পিয়ান-

শিপ লাভেও ট্যারাণ্টই ছিলেন প্রধান শক্তি, যথাক্রমে ছয় ও ন'রানের পরিবর্তে পাঁচটি করে উইকেট নেওয়া ছাড়াও তিনি ছিলেন দলের সর্বোচ্চ স্কোরার।

চতুর্দ্দলীয় প্রতিযোগিতা ১৯৩৬-এই শেষ, কারণ পরের বছর অবশিষ্ট দলকে নেওয়া হল এবং প্রতিযোগিতাটি পঞ্চ দলীয় আখ্যা পেল। তিন বছর পাঁচটি চতুর্দ্দলীয় খেলায় আমার ব্যাটিং হিসেব হল ৮—০—৫০—১৮৬—২৩ ৩৫, আর বোলিং-এ ৫৬'৯—১৬২—৮—২০'২৫।

কিন্তু চতুর্দ্দলীয় খেলাগুলি আসলে পঞ্চ দলীয় প্রতিযোগিতায় আমার খেলার ভূমিকা স্বরূপ ছিল। পঞ্চ দলীয় প্রতিযোগিতার আট বছর আমি ১৫ ইনিংস খেলে মোট রান করেছিলাম ৮০১, তার মধ্যে সেঞ্চুরী ছিল তিনটি, আর ইনিংস পিছু গড় রান ছিল ৫৩'৪৯। মুসলিম দলের পক্ষে এর চেয়ে ভালো গড় পড়তা রান আর কারোই নেই। মার্চেণ্টের ১২ ইনিংসে মোট ১৪৪৭ রান আর গড়পড়তা রান ১৬১'৮৮ কিংবা হাজারের ১৪ ইনিংসে ১২১২ রান ও গড়পড়তা ১০২ রানের তুলনায় আমার কৃতিত্ব কিন্তু নিতান্তই নগণ্য। বস্তুত মার্চেণ্ট ও হাজারে ছাড়া আর কারো মোট রান সংখ্যা এক হাজার পার হয়নি। হাজারে অবশিষ্ট দলের পক্ষে সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছিলেন, তাঁর ২০টি উইকেটের গড়পড়তা হিসেব ছিল ৩৩'১০, আমি তো বোলিং থেকে ক্রমেই অপসরন করছিলাম। পঞ্চ দলীয় প্রতিযোগিতার আট বছরে আমি বড় জোর ২০ ওভার বল করেছি, একটিও উইকেট পাইনি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে সি কে নাইডু, দেওধর, ভি থাল, জয় ও ভজিকদার প্রত্যেকেই চতুর্দ্দলীয় প্রতিযোগিতায় হাজারের ওপর রান করেছেন। উজির আলি (৯১১) ও হাজারে (৮৯৯) অল্পের জন্য সে কৃতিত্বে বঞ্চিত হয়েছেন। চতুর্দ্দলীয় পঞ্চ দলীয় প্রতিযোগিতায় একজন বোলারই শতাধিক উইকেট পেয়েছেন, তিনি হিন্দু দলের এম এইচ চন্দ্রানা, এন এস যোশী পেয়েছিলেন ৯৭ টি।

পঞ্চ দলীয় প্রতিযোগিতার প্রথম বছর অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে, সেটি কিন্তু বাস্তবে হয়েছিল চতুর্দ্দলীয়। নবনির্মিত ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামে খেলা উপলক্ষ্যে আসন বণ্টনের ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হয়ে হিন্দু দল নাম প্রত্যাহার করেছিল। চতুর্দ্দলীয় প্রতিযোগিতার খেলাগুলি হত বিভিন্ন জিমখানার মাঠে। লর্ড টেনিসনের দলের খেলা দিয়ে ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামের উদ্বোধন হয় ১৯৩৭-র

ডিসেম্বর মাসে। এরপর থেকে পঞ্চ দলীয় প্রতিযোগিতায় ব্রেবোর্ণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হওয়াতে জিমখানাগুলির মর্যাদা হ্রাস পেল। এতে জিমখানাগুলির ক্ষোভ স্বাভাবিক। হিন্দু জিমখানার সদস্য সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। ওরা ব্রেবোর্ণ খেলায় বেশি আসন দাবি করেছিল; কিন্তু মাত্র ৫০০ আসন দেওয়া হয় ওদের, তাও সর্ত সাপেক্ষ। পঞ্চ দলীয় প্রতিযোগিতার দুদিন আগে হিন্দু জিমখানা ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামের মালিক সি সি আই-কে (ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়া) জানিয়ে দিল, আমরা নিরুপায়, খেলতে পারলাম না।

প্রথম খেলাটি হল মুসলিম ও পার্শী দলের মধ্যে, অধিনায়ক কাদ্রির সঙ্গে ইনিংস সূচনা করে জোড়ে যখন ৫৯ রান উঠিয়েছি, আমি রান আউট হয়ে গেলাম। এরপর কপাকপ উইকেট পড়লো, শেষ পর্যন্ত দলের দুই বোলার মোবারক আলি ও আমির ইলাহীর প্রচেষ্টায় কোন মতে আমরা প্রথম ইনিংসে ২৩ রানে এগিয়ে থাকতে পারলাম! দ্বিতীয় ইনিংসে জয়ের জন্য আমাদের দরকার ১০৪, আমি ৬৫ মিনিটে মাত্র ৪৪ রান করলাম, বাউণ্ডারী মাত্র দুটো, অবশ্য মুসলিম দলই জিতে গেল।

ফাইনাল খেলায় আমার ব্যক্তিগত সার্থকতাই হল দলীয় জয়ের ভিত্তি। দলের রাণ উঠলো ২৩৪, তার মধ্যে ২১০ মিনিটে ১৩৫। বম্বেতে আমার প্রথম শত রান। আমি তিন নম্বর হিসেবে নেমেছিলাম। ৫০ রান করে কামরুদ্দিন আমাকে সহযোগিতা দিয়েছিলেন। পঞ্চদলীয় প্রতিযোগিতার প্রথম বছরে মুসলিম দলের জয় লাভে আমার ভূমিকায় অবশ্যই আমি গর্ববোধ করেছিলাম।

অবশিষ্ট দলের সঙ্গে মুসলিম দলের দ্বিতীয় খেলায় আমি ছিলাম না। নবাগত অবশিষ্ট দল মুসলিম দলকে প্রথম ব্যাটিং করতে পাঠিয়ে বেশ কোণঠাসা করে ফেলেছিল। দুজন সিংহলী দেসারাম ও জয়বিক্রম দু'ইনিংসেই অবশিষ্ট দলের পক্ষে চমৎকার ব্যাটিং করেছিলেন। দেসারাম দ্বিতীয় ইনিংসে ১২২ রান করে অপরাজিত ছিলেন। দ্রুত রান তুলে চারের পর চার মেরে স্বীয় দলকে জয়ের পথে ঠেলে দিয়েও নিঃসঙ্গ দে'সারাম শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেন।

এবারের রাণার্স আপ ইয়োরোপীয়ান দলের সঙ্গে পরের বছর প্রথম খেলাতেই মুখোমুখী হলাম। দারুণ খেলা। কাদ্রির সঙ্গে ইনিংস সূচনা করে এবারেও আমি শতরান করলাম। আমার ১৫৭ রানের সঙ্গে বাকি দশজনে মিলে যোগ করলো ৮৯। ইউরোপীয়ান দলের ন্যাটা বোলার অর্টন পরপর তিন বলে তিন আলিকে আউট করলেন। প্রথমে আমি ফাইন লেগে ধরা

পড়লাম, পরের বলে নাজির এলবি এবং ঠিক তার পরের বলে উজির কভারে ক্যাচ আউট। দ্বিতীয় ইনিংসে আমি সুবিধা করতে পারলাম না। কিন্তু উজির আলি দৃঢ়ভাবে খেলে ১১২ রান করার ফলে বিপক্ষকে ৩৪৭ রান করার দায়ে ফেলে দিলেন। ইয়োরোপীয়ান দল প্রাণপণ লড়েও সে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলো না। পরবর্তী যুগের বিখ্যাত ওপেনিং ব্যাটসম্যান কে সি ইব্রাহিম দ্বিতীয় ইনিংসে ১১ নম্বর নেমে বিনা রানে আউট হলেন। পঞ্চ দলীয় প্রতিযোগিতায় এই তাঁর অশুভ আবির্ভাব।

অবশিষ্ট দলের বিরুদ্ধে হিন্দু দল সাত উইকেটে ৫৬০ রান তুললো, লালা অমরনাথ সবাইকে ছাড়িয়ে গেলেন অনবদ্য ভঙ্গিতে ২৪১ করে। কিন্তু ফাইনালে মুসলিম দলের দুই বোলার নিসার ও সঈদ আহমেদ হিন্দুদলের বাঘাবাঘা ব্যাটসমানদের প্যাভিলিয়ানে ফিরিয়ে দিলেন মোট ৬৯ রানে। এর মধ্যে সি কে (২৫) ও শুঁটে ব্যানার্জী (১৪)—এই দুজনই যা কিছুক্ষণ উইকেটে দাঁড়াতে পেরেছিলেন, বাকি সব প্রায় পত্রপাঠ বিদায়। প্রথম দিনের শেষে আমরা যখন ছ' উইকেটে ২০১ তুলেছি, হিন্দু দলের নৈরাশ্যের ভাব তখনি পূর্ণ।

এই তাজ্জব খেলাটিতে বোলারেরাই ব্যাটিং-এর কৃতিত্ব পেল, কাদ্রির ৬৫ ও উজির আলির ৩০ রানের পরে সঈদ আহমেদ পাকা ব্যাটসম্যানের ভঙ্গীতে ৫৮ রান করলেন, আর আট নম্বরে নেমে আমির ইলাহী শতরান ধরো ধরো। কিন্তু তাঁকে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট জীবনের একমাত্র শত রানে বঞ্চিত করলেন সি এস নাইডু (১০৯ রানে ৭ উইঃ) সরাসরি বোল্ড করে। ইলাহীর শতরান পুরতে তখন মাত্র চার রান বাকি, একটা বাউণ্ডারির মাত্র অপেক্ষা। হিন্দু দলের দ্বিতীয় ইনিংসে সব চেয়ে বেশি রান সি এস-এর ৭৫, পৃথ্বিরাজ ৬২ ও সি কে ৬৬, হিন্দু দলের মোট রান উঠলো ৩৭৭। কিন্তু মুসলিম দলের জয় লক্ষ্য মাত্র ১০৭ রান, চার উইকেটেই তা উঠে গেল। ম্যাচ প্রসঙ্গে সি কে মন্তব্য করেছিলেন: ব্রেবোর্ণের উইকেট প্রথম আধঘণ্টা বদখেয়ালে ভরা, পর পর থেকে শান্ত ছেলে।' নতুন মাঠের নতুন উইকেটের এই চরিত্র বোঝার মত অভিজ্ঞতা সি কে-র হয়েছিল অনেক দেরিতে, আগে বুঝলে টসে জিতে নিশ্চয়ই তিনি বিপক্ষ দলকে ব্যাট করতে পাঠাতেন।

পরের বছর আবার ফাইনালে দু'দলের সাক্ষাৎ। নিসারের দুর্দান্ত বোলিং এর ফলে প্রথম ইনিংসে ৪০ রানে পিছিয়ে রইল হিন্দু দল, কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে

পাঁচ উইকেটে ২২১ তুলে ওরাই বিজয়ী হল। পঞ্চ দলীয় প্রতিযোগিতায় হিন্দু দলের এই প্রথম সার্থকতায় মার্চেণ্ট, মানকড় ও সি এস এই তিন জনের দান ছিল। দ্বিতীয় ইনিংসের ২২১ রানের মধ্যে মানকড় (৭৩) ও মার্চেণ্ট (৮৮) দুজনে মিলেই করলো ১৬১, সি এস ১৪২ রানে ১১টি উইকেট পেলেন।

এই বছরের প্রতিযোগিতাতেই আমি সর্বপ্রথম অ্যাণ্টনি ডি মেলোর সঙ্গে মোলাকাতের সুযোগ পাই। এ ডিমেলোই পরবর্তী কালে ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। ডিমেলো সাহেব খেলার সময় দিনে দুবার ব্লেজার বদল করতেন। উনি আমার বিরুদ্ধে বল করতে এলে আমি এক ওভারে ১৮ রান পেটাই, এর পর সে খেলায় তিনি আর বল করেননি।

পরের বছর হিন্দু দল আবার প্রতিযোগিতা থেকে সরে থাকে, বৈচিত্র্যবিহীন নিরুত্তাপ ফাইনালে অবশিষ্ট দলকে হারিয়ে মুসলিম দল বিজয়ী হয়। ফাইনালে আমার ১১০ ওই প্রতিযোগিতায় শেষ শতরান।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সারা দেশে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা এতদিনে প্রবল হয়ে উঠেছে, তাই সম্প্রদায়গত দল ভাগ নির্ভর ক্রিকেট প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে জনমত তখন প্রবল। বৃটিশ শাসক ভারত ছেড়ে চলে গেলে ক্ষমতা ও সম্পদ ভাগাভাগির ব্যাপারে জনসাধারণ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যে মনোভাবই পোষণ করে থাকুকনা কেন, আমরা ক্রিকেট খেলোয়াড়রা হিন্দু দল-বনাম মুসলিম দলের খেলাটিকে যে একান্তভাবে ক্রিকেটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া আর কোনভাবেই দেখতাম না, একথা আমি হলফ্ করে বলতে পারি।

এই প্রতিযোগিতায় বরাবরই বিপুল উদ্দীপনা জেগেছে এবং বিরাট জনসমাগমও হয়েছে। খেলাও চটকদার এবং প্রাণবন্ত হয়েছে, বিশেষ করে একটি খেলায় ব্যর্থ হলে দল থেকে বাদ পড়বার ত্রাস নিয়ে খেলতে হত না কাউকে। প্রতিযোগিতাটি যে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা থেকে মুক্ত ছিল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ১৯৪৪ সালের ফাইনাল খেলার এক সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে প্রাণপণে খেলবার জন্য আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছিলেন স্বয়ং সি কে নাইডু। সে খেলায় মুসলিম দল বিজয়ী হয় এবং তার পরই প্রতিযোগিতাটি উঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সিদ্ধান্তটি হয়তো সমুচিত ও সময়োপযোগীই হয়েছিল। কারণ সার্থান্ধ

ব্যক্তিরা ও গোষ্ঠিবর্গ দুই প্রধান সম্প্রদায়ের ক্রিকেট প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে রাজনৈতিক বৈরিতার খাতে চালনা করতে শুরু করেছিল। তাছাড়া প্রতিযোগিতাটির উপযোগিতাও বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েছিল। পঁচিশ বছর কাল সারা ভারত জোড়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বলতেই চতুর্দ্দলীয় ও তার উত্তরাধীকারবাহী পঞ্চদলীয় প্রতিযোগিতা এবং এরই মাধ্যমে ভারতের খেলোয়াড়েরা নিজেদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেয়েছিল। আঞ্চলিক ভিত্তিতে গঠিত দলগুলির মধ্যে জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পরিবেশ অনেক সুস্থ ও স্বচ্ছ। সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতার প্রথম যুগে দর্শক সমাজের শৃঙ্খলাবোধ ছিল প্রশংসনীয়, বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে তারা ক্রিকেটের দৃষ্টিতেই দেখতো। কিন্তু পরিবর্তিত নতুন পরিবেশে দর্শক সমাজে বিভিন্ন দলের অন্ধ সমর্থকে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, স্বার্থান্ধ চক্রান্তকারীদের পক্ষে খেলার মাঠের তিক্ততা থেকে জঘন্যতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানো অসম্ভব ছিল না।

মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের পরিবেশে ১৯৪২ সালের পঞ্চদলীয় প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। আমার ভাগ্য ভালো যে ১৯৪৩-এর প্রতিযোগিতায় আমি অংশগ্রহণের অবকাশ পাইনি, হোলকার রাজ্যের খেলাধূলা পরিদর্শক পদের দায়িত্ব পালনেই আমি তখন বিশেষ ব্যস্ত। তবু ওই বছরের প্রতিযোগিতায় মার্চেন্ট ও হাজারে ওই দুই বিজয়ের মধ্যেও রেকর্ড ভাঙ্গা গড়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল সে কাহিনী উল্লেখ আমি সমীচিন মনে করি। মুসলিম দলের বিরুদ্ধে খেলায় বিজয় হাজারে ২৪৩ করে অমরনাথ (১৯৩৮) ও মার্চেন্টের (১৯৪১) সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের (২৪১) রেকর্ড ভেঙে দেন। মুসলিম দলের ৩৫৩ রানের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে অবশিষ্ট দল যখন ৩০ রান তুলতে তিন উইকেট খুইয়ে বসে, তখন হাজারে হাল ধরেন এবং একক প্রচেষ্টায় দলকে জিতিয়ে দেন।

দুদিন বাদে অবশিষ্ট দলের বিরুদ্ধে হিন্দুদলের ব্যাটিং-এ মার্চেন্ট ২৫৯ করে অপরাজিত থাকেন, হাজারের রেকর্ড ভেঙে যায়। কিন্তু হাজারে হার মানতে রাজি নন। অবশিষ্ট দলের ব্যাটিং-এ তিনি ৪০১ মিনিটে ৩১টি চার ও একটি ছয়ের সাহায্যে ৩০৯ রান করে অপরাজিত থেকে যান। ভাই বিক্রমকে সঙ্গে নিয়ে বিজয় ষষ্ঠ উইকেট ৩০০ রান যোগ করে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন, খেলাটির স্বরূপ বুঝতে হলে জানা দরকার যে ওই জুড়ি রেকর্ড

রানসংখ্যার মধ্যে বিক্রম করেছিলেন মাত্র ২১ কিন্তু বিজয় হাজারের একক বীরত্ব (৩৮৭ রানের মধ্যে ৩০৯) হিন্দুদলের সমষ্টিগত সার্থকতার কাছে ব্যর্থ হল। হিন্দুদল এক ইনিংস ও ৬১ রানে জিতে গেল।

সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতায় আলোচনায় পূর্নচ্ছেদ টানবার আগে প্রতিযোগিতার সর্বশ্রেষ্ঠ খেলাটি সম্পর্কে কিছু বলতে চাই, ৯৪৪ সালের ফাইনাল ওই প্রতিযোগিতার সর্বশেষ খেলাটি আমার মতে নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি সর্বসমেত তিন ইনিংস খেলে মাত্র ৭২ রান করেছিলাম। তবু আমারই অধিনায়কতায় মুসলিম দল অবশিষ্ট দলের বিরুদ্ধে এক ইনিংস ৭৮ রানে জয় লাভ করে এবং ফাইনালে প্রবল শক্তিশালী হিন্দুদলকে পরাজিত করে।

অবশিষ্ট দলের খেলাটি আমার স্মরণে উজ্জ্বল হয়ে আছে, কারণ ওই খেলায় প্রখ্যাত সিংহলী ব্যাটসম্যান শতশিবম যে ০১ রান করেছিলেন শিল্পকৌশলে সে খেলার তুলনা আমি পাইনি। অত্যন্ত বিষাদময় পরিস্থিতির মধ্যে মানব সমাজ তথা ক্রিকেট সমাজ থেকে শতশিবম যখন অপসারিত হলেন তখনো তাঁর ক্রিকেট প্রতিভা মধ্যগগনে।

ফাইনালে খেলার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। দল হিসেবে আমরা হিন্দুদের তুলনায় অনেক দুর্ব্বল, বিশেষ করে আমাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান নজর মহম্মদ বিশ্ববিদ্যালয় দল পরিচালনার আহ্বানে আগের দিন লাহোর রওনা হয়ে গেছেন। ওই অবস্থায় অধিনায়কত্বের দায়িত্ব কিভাবে পালন করবো ভেবে আমি কূল কিনারা পাচ্ছিলাম না। আমার ও সবার তবু মনে দৃঢ় সংকল্প মার্চেন্টের প্রবল শক্তিধর দলকে প্রাণপণে প্রতিরোধ করবো।

ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। মার্চেন্ট টসে জিতে ব্যাটিং নিলেন, আমির ইলাহী, বালুচ ও মহম্মদ আহমেদের বলে মাত্র ৬৮ রানে পাঁচটি উইকেট পড়ে গেল, মার্চেন্টের নিজের মাত্র এক রান। দুনম্বর মানকড় ও শেষের দিকের কিষেণ চাঁদের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং সত্ত্বেও ২০৩ রানে ইনিংস শেষ। হিন্দুদলের বোলিং শক্তি প্রবলতর, শুঁটে ব্যানার্জীর আগুন ছোটানো বল, একটা শর্ট পিচ বল লাফিয়ে আমার পাঁজরে লাগলো, ব্যথা নিয়ে খেলতে পারলাম না, মাত্র নরান করে বিদায় নিলাম। সি এস নাইডু ও চাঁদু সারভাতের কুশলী বোলিং আর শুঁটের গোলা সত্ত্বেও প্রথম ইনিংসে ১৮ রানে

এগিয়ে গেলাম আমরা, বিশেষ করে মন্ত্রালি ও গোলাম আহমদের কৃতিত্বে।

দ্বিতীয় ইনিংসে হিন্দুদল দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ৩১৫ রান তুললো। মার্চেন্ট একটা দিক আগলে রাখলেন, অপর দিকে কিষেণ চাঁদ ১১৪ রানের তুবড়ী ছোটালেন। আমরা যখন দ্বিতীয় ইনিংসে নামি তখন জয়ের জন্য আমাদের তুলতে হবে ২৯৮ রান, হাতে সময় সাড়ে ছঘণ্টা।

নজর মহম্মদ নেই, এবারও আনোয়ার হোসেনকেই পাঠাতে হল ইব্রাহিমের সঙ্গে ইনিংস সূচনা করতে। দশ রানের মাথায় সি-এস-এর বলে আনোয়ার আউট, তের রানে দিবা অবসান। শুঁটে ব্যানার্জী, সোহোনি, সি এস, সারভাতে, মানকড়, ফাদকার হিন্দুদলের ওই বোলিং শক্তির কাছে নেতিমূলক ব্যাটিং আত্মহত্যার সামিল। কিন্তু যদি আমরা টিকে থাকতে পারি তবে প্রথম ইনিংসের ১৮ রানের জোরেই আমরা বিজয়ী ঘোষিত হব। নেতিবাচক ক্রিকেট আমার স্বভাব বিরুদ্ধ, কিন্তু মাত্র একদিনের খেলায় ৯টি উইকেট হাতে নিয়ে ২৮৫ রান করাও প্রায় অসম্ভব। তার উপর আমার পাঁজরের ব্যথাটিও বেশ কষ্ট দিচ্ছে, দ্বিতীয় ইনিংসে আদপেই ব্যাটিং করতে পারবো কিনা বুঝতে পারছি না। এক্স-রে তে দেখা গেছে হাড় ভাঙেনি। কিন্তু ব্যাথাটি রয়েই গেছে, ডাক্তারের মতে আমার পক্ষে কোন ঝুঁকি নেওয়া আমার পক্ষে অসমীচিন। মনের মধ্যে দুশ্চিন্তার কল্লোল।

চতুর্থ দিনে মাঠে যাবার আগেই দুই আম্পায়ারকে সঙ্গে নিয়ে বিপক্ষ দলপতি মার্চেন্ট আমার কাছে এলেন। আমাকে জানালেন যে বোলারদের পায়ে পায়ে বোলিং ক্রীজের এক অংশের মাটি সরে গর্ত হয়ে গেছে, যার ফলে সেদিক থেকে পেস বোলারদের বল করা প্রায়ই অসম্ভব। মার্চেন্টের গর্ত ভরাট করার প্রস্তাব আম্পায়াররা প্রত্যাখান করেছেন, তবে জানিয়েছেন যে বিপক্ষ দলের অধিনায়কের আপত্তি না থাকলে গর্তটি ভরাট করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

সরাসরি জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না, অন্যান্য সদস্যদের মতামত চাইতে সবাই আপত্তি জানালেন, বললেন মার্চেন্টের বোলারদের পূর্ণ-শক্তি প্রয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে কেন মত দেব আমরা। অন্তত চার্চ গেটের দিক থেকে মার্চেন্ট যদি শুঁটে ব্যানার্জী ফাদকারকে ব্যবহার করতে না

পারেন, অনেক সুবিধা হবে আমাদের। ওদের যুক্তি অখণ্ডনীয়, কিন্তু ওদের বোঝালাম যে খেলাটা খেলা, যুদ্ধ নয়, হেরে যদি যাই-ই আমাদের কোতল করা হবে না, ক্রীতদাস রূপে বাজারে বিক্রী করেও দেবে না। কিন্তু খেলোয়াড়ি মনোভাব জয়-পরাজয়ের উর্দ্ধে, যদিও যে কোন অবস্থায় খেলার নৈপুণ্যের জোরে জয়লাভের উদ্দেশ্যে প্রাণপণ করাই খেলারও ধর্ম, তবে বিপক্ষের কোন অসুবিধার সুযোগ নেওয়ার মধ্যে কোন বীরত্ব নেই। আমার যুক্তি সবাই স্বীকার করে নিলেন। মার্চেন্টের সামনে এসে তার পিঠে হাত রেখে যখন জানালাম ঠিক আছে, মার্চেন্ট প্রকৃতই অভিভূত। আমার দায়িত্ব কিন্তু গুরুতর হয়ে গেল।

নিদারুণ অনিশ্চয়তা নিয়ে ত্রিশ হাজার দর্শক সকাল থেকেই স্টেডিয়ামে বসে গেছে। ব্যাটে-বলে কী নিদারুণ সংগ্রাম! বোলাররা তীব্র ছোবল হানছেন, আর আমাদের ব্যাটসম্যানরা কিছুক্ষণ বাদে বাদেই প্যাভিলিয়ানে ফিরে আসছেন। আমি প্যাভিলিয়ানে বসে দলের দুরবস্থা দেখছি, ব্যাটস-ম্যানদের সংগ্রামী মনোভাবে মাঝে মাঝে উৎসাহিত হলেও দুশ্চিন্তায় অস্থির হচ্ছি। হিমাচল সদৃশ অটলতায় একদিক রক্ষা করে চলেছেন ইব্রাহিম। বোধ হয় তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ খেলা খেলছেন, অপর দিকে গুল মহম্মদ রান করে চলেছেন, কিন্তু ৪২ রান করে গুল আউট হলেন সি, এস-এর বলে। এরপর সঈদ আহমেদ যখন গোল্লা খেয়ে ফিরে এলেন, তখন জয়ের আশা স্তিমিত।

এবার ইব্রাহিমের সঙ্গে যোগ দিলেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ খেলোয়াড় আবদুল হাফিজ। (পরবর্তী যুগে পাকিস্তান অধিনায়ক এ, এইচ কারদার) ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে লড়াই করে রান তুলতে লাগলেন। ক্রীজ ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে মারে মারে ছত্রখান করলেন। অবশিষ্ট দলের বিরুদ্ধে নবাগত হাফিজের খেলা আমাকে আনন্দ দিয়েছিল, তাঁর সম্পর্কে আমার সেদিনের প্রত্যাশা আজ পূর্ণ বিকশিত। ৩৫ রান করে বেপরোয়া রান নিতে গিয়ে আউট হলেন হাফিজ, তবে ততক্ষণে ঘড়ির কাঁটাকে পিছনে ফেলে এসেছি আমরা। উজীর আলিকে সামনে পেয়ে হাফিজ সম্বন্ধে সেদিন যে ভবিষ্যদ্বানী করেছিলাম এবং আলি সাহেবের সমর্থন পেয়েছিলাম, আমাদের প্রত্যাশা পরবর্তী কালে তিনি পূর্ণ করেছেন। বর্তমানে তিনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি, যে সম্মান ভারতের কোন প্রথিত যশা ক্রিকেটারের ভাগ্যে জোটেনি।

কিন্তু পর পর তিনটি উইকেট পড়ে খেলার মধ্যে নাটকীয় পরিবর্তন এনে দিল, মনে হল, এবার অথই জলে পড়েছি। আমার ডানপাশে বসে খেলা দেখছিলেন গুরুজী সি, কে, নাইডু। ঘণ্টাখানেক আগেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি ব্যাট করছি কিনা। আমি জানিয়েছিলাম সে ফোলাটা কমে থাকলেও জোর ব্যাথা রয়েছে। তাছাড়া ডাক্তাররাও কোন ঝুঁকি নিতে বারণ করেছেন। তবে গুরুজীকে এই আশ্বাসও দিয়েছিলাম যে নিজের কথা ভেবে ম্যাচ সম্বন্ধেও কোন ঝুঁকি আমি নেবনা।

তিনটি দ্রুত উইকেট পতনের পরই আমার দিকে মুখ ফেরালেন সি কে, প্রশ্ন করলেন, মুশতাখ এই মুহূর্তের দলের প্রয়োজনে পরিত্রাতার ভূমিকা গ্রহণে তুমি কি পিছপা হবে? আমাকে নিরুত্তর দেখে তিনি নির্দেশ দিলেন, যাও মাঠে নামো, আর নির্ভীক চিত্তে নিজের স্বাভাবিক খেলা খেলো। গুরুর আদেশে তখনই সাজঘরে গিয়ে ঢুকলাম। তৈরি হয়ে ঘর থেকে বার হতেই দেখলাম এনায়েৎ খাঁ ক্রীজ থেকে ফিরছেন।

সকালের পত্রিকায় আমার ব্যাট না করার সম্ভাবনা ঘোষিত হয়েছিল। সি, কে জোর না করলে হয়তো নিবৃত্তই থেকে যেতাম, জানি না। আমি মাঠে নামতেই জনতার মধ্যে প্রবল উল্লাস, অবিরাম করতালিতে আমাকে স্বাগত জানানো হল। শুরুটা মন্থরই হল। কিন্তু অল্প পরেই আমার স্বভাব-সিদ্ধ মারের ফুলঝুরি ছোটাতে লাগলাম চারদিকে, প্রতিটি মারে কলকণ্ঠ অভিনন্দন। সারভাতের একটা সোজা বল পুল করতে গিয়ে ব্যাটে ঠেকাতে পারলাম না, বেল গেল উড়ে। তবু ২১ মিনিটে ৩৬ রান করে ঘড়ির থেকে দলের রান সংখ্যাকে দশ মিনিট এগিয়ে দিতে পেরেছি।

এবার শুরু হল আমির এলাহির দোহাত্তা মার। জয় লক্ষ্যে কাছাকাছি পেঁাছে গেছি, মনে হলে আমির এলাহির মারেই জয়লাভ হয়ে যাবে। কিন্তু সারভাতের বলে সি, এস ধরে ফেললেন তাকে (৩০ রান)। ওদিক ইব্রাহিম দুর্গ আগলে আছেন। মাকা যখন নামলেন উত্তেজনা তখন চরমে উঠেছে। ঘড়ির আগে থাকাই যথেষ্ট নয়, রান চাই, বলে বলে রান. কিন্তু মাকা শূন্য হাতে ফিরলেন। শেষ ব্যাটসম্যান গুজরাটের প্রধান খেলোয়াড় বালুচ যখন নামছেন চারিদিকে বিশাল জনতা নীরব। শুধু ৩০ হাজার হৃৎপিণ্ডের ধপধপানি বোধ হয় বাতাসে প্রতিধ্বনিত। প্রথম বল মিস করলেন বালুচ. পরের বলে তিন রান নেওয়া হতেই এল ইব্রাহিমের পালা। দুটি বল ঠেকালেন তিনি,

তৃতীয় বলে এক রান। সমান সমান। পরের ওভারে মিড উইকেটে দু রান নিয়ে যখন বিজয় লক্ষ্যে দলকে পৌঁছে দিলেন ইব্রাহিম, তখনো হাতে পাঁচ মিনিট সময়।

স্বভাবতই সারা মাঠে অভূতপূর্ব উল্লাস। হিন্দুদের সবচেয়ে শক্তিমান দলের বিরুদ্ধে একান্তই অপ্রত্যাশিত এই জয়। এই জয়ের প্রধান স্থপতি ইব্রাহিম ১৩৭ রান করেও অপরাজিত। ইব্রাহিমের আমার দেখা শ্রেষ্ঠ ইনিংস। তাঁকে কাঁধে তুলে নাচতে লাগলো জনতা।

অভিনন্দনের বন্যায় প্লাবিত হলাম আমি। বিজিত দলের অধিনায়ক মার্চেণ্ট সাজঘরের মধ্যে আমাকে নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধলেন। সি কে তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বললেন: কেমন বলিনি আমি? ওই ভাবেই ক্রিকেট খেলতে হয়, মুশতাখ। ডেনিস কম্পটন ও জো হাউস্টাফ ইয়োরোপীয়ান দলের হয়ে খেলছিলেন। কম্পটন ফাইনালের শেষে আমাকে বললেন যে এরকম উত্তেজনাভরা খেলা তিনি কখনো দেখেন নি, আমার নেতৃত্বে দলের এই প্রয়াসার্জিত জয়লাভে আমি নাকি যথার্থ গর্ববোধ করতে পারি।

তবু আমি বলবো ওই জয়ে আমার নিজস্ব কৃতিত্ব সামান্যই ছিল। অনেক বেশি শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিত ওই জয়ের কৃতিত্বে সকলেই সমান অংশীদার। দলগত সংহতি বজায় রেখে সাহসের সঙ্গে সুচিন্তিত প্রয়াসে খেলেছেন প্রত্যেকে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কারো সংগ্রামী মনোভাব শিথিল হয় নি। ১৯৪৫-৪৬-এর ক্রিকেট মরশুমের সময় সারা ভারত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বারুদস্তূপের ওপর বসে, কাজেই সম্প্রদায়গত ক্রিকেট প্রতিযোগিতার কথা সে সময় চিন্তাও করা যায় নি, বিশেষ করে বোম্বাই শহরে। তাই পঞ্চ-দলীয় প্রতিযোগিতা বন্ধই রইল। সিন্ধু প্রদেশের প্রতিযোগিতাটি অবশ্য হল, তবে ততদিনে তা স্থানীয় প্রতিযোগিতায় রূপ নিয়েছে। বম্বের প্রাচীন চতুর্দলীয় প্রতিযোগিতার স্মারক হিসেবে সিন্ধুতে একটি অনুরূপ প্রতিযোগিতা হত, কখনো কখনো বা পুনায়।

সম্প্রদায়গত ক্রিকেট প্রতিযোগিতা উঠিয়ে দেবার সপক্ষে তখন জনমত প্রবল হয়ে উঠেছে, ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডই তার মৃত্যু ঘোষণা করলো। যাঁরা সম্প্রদায়গত প্রতিযোগিতার সমর্থন করে এসেছেন এতদিন তাঁরা বলতে লাগলেন, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বৃদ্ধি ছাড়া আজ তার অন্য উপযোগিতা নেই।

বোর্ডের সভায় সভাপতি ডি মেলো বললেন: কলকাতা ও বম্বের রক্তাক্ত দাঙ্গার বিভীষিকা আজও আমাদের আতঙ্কিত করে। মানুষ অসঙ্কোচে মানুষ হত্যা করেছে, স্বচক্ষে এমন অনেক অমানুষিকতা দেখেছি। বর্তমানে দেশবাসীর যা মনোভাব তাতে সুস্থচিত্তে বিচার করে দেখতে হবে এই বছর বা ভবিষ্যতে কোনো দিন সম্প্রদায়গত ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান সমীচিন কিনা। তিনি আরো জানালেন যে অন্যান্য বহু দায়িত্বশীল ব্যক্তিও অনুরূপ মনোভাব পোষণ করেন। ভারতের এখন চূড়ান্ত দুঃসময়, এই অবস্থায় সাম্প্রদায়িক বহ্নিস্তূপে এতটুকু স্ফুলিঙ্গ সঞ্চার কোন মতেই উচিত হবে না। তাছাড়া ভারতের প্রথম জাতীয় সরকার বিব্রত ও বিপন্ন হতে পারে এমন কিছু করা যারপরনাই অন্যায় হবে। ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির প্রসঙ্গও বোর্ডে আলোচিত হল, বলা হল, দেশের বৃহত্তর কল্যাণে সেই ক্ষয়-ক্ষতিকে গৌণ বলেই বিবেচনা করতে হবে।

পঞ্চদলীয় ক্রিকেটের যথাকালেই মৃত্যু ঘটেছে, তার জন্য আমি বিলাপ করি না। বিশেষত আঞ্চলিক ভিত্তিতে গঠিত দল নিয়ে রঞ্জি ট্রফির জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এতদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে ওই বহু নিন্দিত প্রতিযোগিতার সমাধিফলকে লেখা থাকা উচিত যে এদেশে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্পর্কে কোন ধারণাই যখন সৃষ্টি হয়নি, তখন কিন্তু বছরের পর বছর ওই সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতাই ভারতের ক্রিকেট মৃত্তিকার উর্বরতা সাধন করে-ছিল। মহাত্মা গান্ধী নাকি বোম্বাই পঞ্চদলীয় প্রতিযোগিতা সম্পর্কে একদা মন্তব্য করেছিলেন, ওই সাম্প্রদায়িক পুডিং কে বানিয়েছে? বাপুজীকে কেউ বোঝাতে পারলে হত যে ওই পুডিংই এককালে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিধান করেছিল। কিন্তু সেদিন বিভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরের খাদ্যে বিষ মেশানোর কথা চিন্তা করেনি, এবং নিজের খাদ্যে অন্যে বিষিয়ে দেবে এমন বিভীষিকায়ও বিব্রত বোধ করেনি।

উনিশ

রঞ্জি ট্রফি রূপ পরিগ্রহ করলো

ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সূচনাকালে দল বিভাগ মনে হয় কোন সুপরিকল্পিত নীতি অনুযায়ী হয়নি। কতকগুলি দল ছিল রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা ভিত্তিক প্রদেশ অনুযায়ী গঠিত, আবার ক্রিকেট পরিচালনার কাঠামো-অনুযায়ীও কিছু দল তৈরি হয়েছিল। সামন্তশাসিত রাজ্যগুলি একেবারে শুরুর যুগে আঞ্চলিক দলের অন্তবর্তী ছিল। একই সঙ্গে উত্তর ভারত পশ্চিম ভারত, দক্ষিণ পাঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ ও সিন্ধুপ্রদেশ দলভাগ একান্তই বিসদৃশ ঠেকেছে। গুজরাট ও মহারাষ্ট্র, সেই সঙ্গে হায়দ্রাবাদ, মধ্য-প্রদেশ ও বেরার-এর অস্তিত্ব অসঙ্গত মনে হয়েছে। প্রথম বছর থেকেই সৈন্যদল প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত থেকেছে, বাঙ্‌লা, দিল্লী, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—এগুলি ছিল শাসনব্যবস্থা ভিত্তিক প্রাদেশিক দল, রাজপুতানাদলটি ছিল ক্রিকেট প্রদেশ। ১৯৩৬-৩৭ সালে পতনগরের মত ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য পৃথক দল হিসেবে স্বীকৃতি পেল, অবশ্য ওই রাজ্যের ক্রিকেট ঐতিহ্য ও সেখানে ক্রিকেটের প্রসার ও ক্রিকেট সম্পর্কিত উৎসাহ তাকে স্বাধীন ক্রিকেট সত্বার যোগ্যতা দান করেছিল। এর পরে বরোদা এবং হোলকার রাজ্যও অনুরূপ স্বীকৃতি পেল। জাতীয় প্রতিযোগিতার পত্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ক্রিকেট প্রসার ও তার জনপ্রিয়তা বাড়ানো। ক্রিকেট খেলার রাজা, ইংল্যাণ্ডের মাটিতে তার বিকাশ, অস্ট্রেলিয়ায় এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কালো মানুষগুলিও তার রসে ভাসছে, কিন্তু পল্লীপ্রধান ভারতীয় পরিবেশে তার প্রভূত অসঙ্গতি। কোন জমিদার বা অন্য কোন সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির চেষ্টায় কোন পল্লী অঞ্চলে দু'একটি ক্রিকেট ম্যাচ হয়নি তা নয়। কিন্তু ক্রিকেট মাঠের, বিশেষ করে পিচের জন্য যে ঐকান্তিক যত্ন প্রয়োজন, সরঞ্জাম সংগ্রহের প্রয়াসও কম নয়। তাছাড়া যে নিবিড় মন সংযোগ সহকারে খেলতে হয়—এই সব কিছু ভারতীয় পল্লীঅঞ্চলের সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো-তে একেবারে বেমানান। এমন কি আজকের পরিবর্তিত পরিবেশেও গ্রামাঞ্চলে ক্রিকেট বিকাশের অনুকূল পরিবেশের উদ্ভব হয়নি।

তবু ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ সংযোগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্জিত সম্পদ ওই ক্রিকেট, সম্পূর্ণ বিদেশী ওই খেলাটি যে আজ ভারতবাসীর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে, রঞ্জিট্রফি প্রতিযোগিতার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। জাতীয় প্রতিযোগিতা শুরু হবার আগে বড় জোর জনাপঞ্চাশ ভারতীয় বোম্বাই-এর পঞ্চদলীয় প্রতিযোগিতা পর্যায়ের খেলায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে, তাও ওই প্রতিযোগিতায় একটি দল ছিল শ্বেতাঙ্গদের। কিন্তু রঞ্জি প্রতিযোগিতা যে বছরে শুরু হয় সে বছরেই তাতে পনেরটি দলে কমপক্ষে দুশ ভারতীয় প্রথম শ্রেণীব ক্রিকেট খেলার সুযোগ লাভ করেছিল। স্বাধীনতার পরে ভারতের মানচিত্র আমূল পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু তার আগেই জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা কুড়িতে উঠে গেছে।

বর্তমানে প্রতিযোগিতা পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করে খেলা হয়, প্রতি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দলগুলির মধ্যে বাৎসরিক প্রতিযোগিতা একই ভাবে চলে, কিন্তু এত বড় দেশে, যেখানে অর্থ সঙ্গতি সীমিত সেখানে বহুদূরবর্তী দুই দলের প্রাথমিক প্রতিযোগিতার অনেক অসুবিধা। আবার বিভিন্ন অঞ্চলের বিজয়ী দলগুলির মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ের প্রতিযোগিতা হয় বলে, যে কোন অঞ্চলের দুর্বল দলভুক্ত প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন খেলোয়াড় কোন সুযোগই পায় না, এই ব্যবস্থা অংশত স্বাধীনতার আগেই চালু হয়েছিল। ইদানীং কালে আন্ত-অঞ্চল দলীপ ট্রফির প্রবর্তনে দুর্বল দলের কৃতী খেলোয়াড়দেরও সুযোগ মিলছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে আজও জন-উৎসাহ সৃষ্টি হয়নি। ক্রিকেট সম্পর্কে যত উদ্দীপনা সবই আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা টেস্ট ম্যাচ নিয়ে। সে আগ্রহ জাতীয় প্রতিযোগিতায় ছড়িয়ে পড়েনি। ঘন ঘন বিদেশী দলেব ভারত সফরের ফলে যা কিছু সময়, উৎসাহ ও অর্থ সবই বিদেশী দলের খেলায় খরচ হয়ে যায়, একান্তভাবে স্বদেশী ক্রিকেটে ব্যয় করার মত উদ্বৃত্ত কিছুই আর থাকে না। টেস্ট ম্যাচে অর্জিত অর্থবলেই অনুশীলনের ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে। তবে রঞ্জি প্রতিযোগিতায় জন উৎসাহের অভাবে খেলোয়াড়দের উদ্দীপনা জাগছেনা।

তবু পুণ্যস্মৃতি রঞ্জির নামাঙ্কিত জাতীয় প্রতিযোগিতার ফলেই বহু খেলোয়াড় তার প্রতিভা পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পেয়ে থাকেন। ওই প্রতিযোগিতা না থাকলে আমিও বোধ হয় আজকের আমি হয়ে উঠতে পারতাম না।

প্রতিযোগিতার প্রথম যুগে হোলকার রাজ্য মধ্যভারত দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং প্রথম বছরে পূর্বাঞ্চলের খেলায় মধ্য প্রদেশ ও বেরার দলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, বাংলার মত দীর্ঘ ক্রিকেট ঐতিহ্য সম্পন্ন প্রদেশ যে জাতীয় প্রতিযোগিতার প্রথম বছরে অংশ গ্রহণ করেনি, তা ভাবতেও বিস্ময় জাগে।

১৯৩৪ সালের ৪ঠা নভেম্বর মাদ্রাজের চিপক মাঠে মহীশূরের এ ভি কৃষ্ণ-মূর্তির ব্যাটিং-এর বিরুদ্ধে মাদ্রাজের এম কে গোপালন-এর বোলিং দিয়ে রঞ্জি-ট্রফির জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন।

আমি সেবারই নাগপুরে মধ্যপ্রদেশ ও বেরার-এর বিরুদ্ধে মধ্য ভারতের হয়ে খেলি। আমাদের দলের অধিনায়ক ছিলেন আলিরাজপুরের মহারাজ কুমার, দলের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সি কে, সি এস, দিলাওয়ার হোসেন, জে এন ভায়া, এম এম জগদেল, ইশতিয়ার আলি। দলের দশ উইকেট জয়ে মুখ্য স্থপতি ছিলেন সি কে, ৭৯ রান করার সঙ্গে ৯৫ রানে ৯টি উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। আমি বেশ কিছুদিন বোলিং করিনি, তবু সি কে-র সঙ্গে আক্রমণ সূচনা করতে আমার ডাক পড়েছিল, বিশেষ সুবিধা করতে পারিনি, সারা খেলায় মাত্র চারটি উইকেট পেয়েছিলাম ৯৮ রান দিয়ে। ব্যাটিং-এ ব্যর্থ হলাম। তবে সান্ত্বনা অনুজ ইশতিয়ার ইয়ার্ডের সঙ্গে ইনিংস সূচনা ভালোভাবেই করেছিল।

পরবর্তী খেলায় আমি ব্যাট করে আনন্দ পেয়েছিলাম, যদিচ মাত্র এক রানের জন্য পঞ্চাশ পুরোতে পারিনি। উত্তর ভারতের মুবারক আলি অমৃত সহর উইকেটের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে আমাদের দলকে অল্প রানে আউট করে দেন। অপর দিকে সি এস, উজির আলি ও আমার বলে (৪৮ রানে ৩ উইঃ) ওদের ইনিংস আমাদের চেয়েও কম রানে শেষ হয়। আমাদের দ্বিতীয় ইনিংসে এক ভায়া-ই যা খেলেছেন (২৮)। তারপর অধিনায়ক জর্জ এবেল, ফিদা হসেন ও বাকী জিলানি আমাদের আক্রমণ উপেক্ষা করে উত্তর ভারতকে চার উইকেটে জিতিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত রঞ্জিট্রফিতে প্রথম নাম খোদাই করলো বোম্বাই। সে দলের অধিনায়ক জয়, বিজয়স্তম্ভ মার্চেন্ট—তাঁর দুখানা সেঞ্চুরি, বোলিং-এ ২৬৯ রানে ১৪টি উইকেট।

রঞ্জিট্রফিতে প্রথম সেঞ্চুরির কৃতিত্ব হায়দ্রাবাদের এস এম হাদির, মাদ্রাজের বিরুদ্ধে ১৩২ রান করে অপরাজিত ছিলেন তিনি। প্রথম দুশ রানের ইনিংস

খেলেন উত্তর ভারতের জর্জ এবেল সৈন্যদলের বিরুদ্ধে। উত্তর ভারতেই বাকা জিলানি করেন প্রথম হ্যাট্রিক দক্ষিণ পাঞ্জাবের লাল সিং যোগীন্দর সিং ও পাতিয়ালার যুবরাজকে (পরে মহারাজ) পর পর বলে আউট করে। ওই সব কটি কৃতিত্বই প্রথম বছরে অর্জিত।

দ্বিতীয় বছরের প্রতিযোগিতা আমায় কলকাতার ইডেন গার্ডেনে নিয়ে যায়। বাঙ্‌লা দলে ইংল্যাণ্ডের তিনজন কাউণ্টি খেলোয়াড় ছিলেন—এ-এল হোসি, টি সি লংফিল্ড ও পি আই ভ্যানডারগুট। ভ্যানডারগুট ও কমল ভট্টাচার্যের জুড়ি খেলার দৌলতে বাঙ্‌লা দল প্রথম ইনিংসে ৮৩ রানে এগিয়ে থাকে এবং তারই জোরে ম্যাচ জেতে। ইন্দোরে আমাদের দলের আগের খেলাটিতে রাজপুতানার বিরুদ্ধে হাজারে রঞ্জিট্রফিতে নিজস্ব প্রথম শতরান করেন, যদিচ প্রতিযোগিতায় তাঁর প্রথম আবির্ভাব আগের বছর মহারাষ্ট্রের পক্ষে বোম্বাই-এর বিরুদ্ধে।

বিজয়মুকুট রক্ষার প্রয়াসে বোম্বাই প্রবল বাধা পেল সেমি-ফাইন্যালে উত্তর ভারতের কাছে। উত্তর ভারতের শেষ জুড়ি ১৭ রান করলেই জিতে যায়, কিন্তু পাঁচ রান যোগ হতে মুবারক আলি বোম্বাই-এর অধিনায়ক ভজিফদারের বলে আউট হয়ে যান।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বোম্বাই-মাদ্রাজ ফাইনাল খেলাটির জন্য আমাদের ইংল্যাণ্ড যাত্রায় অসুবিধা ঘটেছিল। ইংল্যাণ্ডযাত্রী দলের চারজন খেলোয়াড় মার্চেণ্ট, হিণ্ডলেকার, রামস্বামী ও গোপালন ওই খেলায় যুক্ত ছিলেন। ২৭ মার্চ খেলা শুরু হল এবং মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত খেলা। বৃষ্টির জন্য মাঝে মাঝেই বাধা, চতুর্থ দিনে যখন একেবারেই খেলা হল না, তখন দুশ্চিন্তা জাগলো খেলা যথা-সময়ে শেষ হবে কিনা। অবস্থা এমন যে ষষ্ঠ দিনে খেলাটি শেষ না হলে সেখানেই তা বাতিল করতে হবে। যাই হোক খেলাটি পঞ্চম দিনেই শেষ হওয়াতে ওই চারজন যথাসময়ে বোম্বাই পৌঁছে ইংল্যাণ্ডগামী জাহাজ ধরতে পেরেছিলেন।

পরের বছরও আমাদের খেলা কলকাতায়। সি কে তখন হোলকার রাজের সঙ্গে মার্কিণ দেশ সফরে। উজির আলি অধিনায়ক। বাঙ্‌লা দলের সমবেত শক্তির কাছে আমরা হেরে গেলাম, বিশেষ করে শুঁটে ব্যানার্জীর মারাত্মক বোলিংই আমাদের কাল হল। সেই শুঁটে কিন্তু নওনগরের বিরুদ্ধে বাঙ্‌লার পক্ষে রইলেন না। ঠিক ফাইনালের আগেই তিনি নওনগর রাজ্যে

চাকরি নিয়েছেন, তাই নওনগরের বিরুদ্ধে খেলতে পারলেন না, নওনগরের পক্ষে খেলাতেও আইনগত বাধা হল। সে বছরকার বিজয়ী নওনগর দলে অধিনায়ক সাসেক্সের পেশাদার খেলোয়াড় এ এফ ওয়েল্‌স্‌লি, ভারতের জাতীয় প্রতিযোগিতায় প্রথম ইংরেজ পেশাদার খেলোয়াড়। ওই দলে আরো ছিলেন এস এম কোলাহ্‌, ভিনু মানকড়, অমর সিং।

পর পর তৃতীয় বারও আমরা বাঙ্‌লার কাছে ইডেন গার্ডেনে হারলাম। আমার খেলা দেখার জন্য সমবেত বিরাট দর্শকমণ্ডলীকে নিরাশ করলাম, বিশেষ করে মাসেক আগেই সেখানে টেনিসনের দলের বিরুদ্ধে আমার শতরান এখনো স্থানীয় স্মৃতিতে উজ্জ্বল। মাত্র ছয় ও চার রান করলাম। কেন জানিনা বাঙ্‌লা দল সেমি-ফাইনালে নওনগরকে ওয়াকওভার দিলে। সেবার অপর সেমি-ফাইনালেও দক্ষিণ পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ওয়াকওভার পেল হায়দ্রাবাদ।

পরের মরশুমে, ১৯৩৮-৩৯ সালে আমি বা সি কে কেউ মধ্য ভারতের পক্ষে খেলিনি। তুকোজী রাও হোলকারের মৃত্যুর পর সি কে তখন আর হোলরাজের চাকরিতে নেই, উজির আলি দক্ষিণ পাঞ্জাব দলে, সি এস বরোদায়। ইন্দোরে জন্মসূত্রে মধ্যভারত দলের হয়ে খেলায় আমার অধিকার। তবু সে দলে খেলা আমার হল না, দলের নেতৃত্ব করলেন দিলাওয়ার হুসেন, হাজারে ও ভায়া দলভুক্ত রইলেন।

ঘটনাচক্রে আমাকে জীবিকার অন্বেষণে ঘুরে বেড়াতে হল। ১৯৩৬ সালে আমি হোলকার সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু প্রধান সেনাপতি কার্পাণ্ডেল-এর সঙ্গে বিরোধের ফলে দুবছর বাদেই আমাকে পদত্যাগ করতে হল।

পরের বছর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আবার মধ্যভারতের হয়ে খেললাম। মধ্যভারত ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশানের কোন টাকা নেই, খেলোয়াড়েরাই টাকা তুলে এন্ট্রি ফী দিল। যুক্ত প্রদেশের সঙ্গে খেলতে এলাহাবাদ গেলাম, জনতা গাড়িতে যে যার ভাড়া দিয়ে। আমি স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রুর অতিথি হলাম, তাঁরই নাতিদের আমন্ত্রণে। দলে পুরানো খেলোয়াড় মাত্র তিনজন, ইশতিয়ার, ভায়া ও আমি। সি কে বরোদায় চলে গেছেন, কোন দলেই তিনি খেললেন না, হাজারেও নয়।

আমার দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৪ রান এবং ভায়ার ৪১ রান সত্ত্বেও উত্তর প্রদেশের কাছে ইনিংসে হারলাম আমরা। প্রথম ইনিংসে মোট রান উঠেছিল

৬৪। তবু একদিক দিয়ে আমি সার্থকতা অর্জন করেছিলাম। মুশতাখ আলির মৃত বোলার সত্বা পুনর্জীবন পেয়েছিল। ১০৮ রানে সাতটি উইকেট নিয়েছিলাম, তার মধ্যে পাঁচ জনকে করেছিলাম বোল্ড আউট, বাকি দুজন এলবি, উল্লেখ্য যে সেই ইনিংসে বিপক্ষদলের রান উঠেছিল ৩২৬।

পরের বছর আমার পিতৃবিয়োগ ঘটলো। পিতৃ শোকের সঙ্গে যোগ হল অর্থ উপার্জন চিন্তা। ঘুরতে ঘুরতে বারিয়া সামন্ত রাজ্যে এক চাকরী পেলাম এবং সেই সূত্রে ১৯৪০-৪২-এর প্রতিযোগিতায় গুজরাট দলভুক্ত হলাম। এখানে আমি অধিনায়ক নির্বাচিত হলাম, যে সম্মান নিজের জন্মভূমিতে পেতে আমাকে আরো বারো বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আমি অনুরোধ জানিয়েছিলাম স্থানীয় খেলোয়াড় বালুচকে অধিনায়ক করতে, কিন্তু বালুচ সমেত সকলেরই দাবিতে আমাকেই অধিনায়কত্বে রাজি হতে হল। অধিনায়কের গুরুভারে আমি কাবু হলাম না, স্বভাব সিদ্ধ খেলা খেলে জাতীয় প্রতিযোগিতায় আমার সর্বপ্রথম শতাধিক রান (২৫৬) করে অধিনায়ক পদে আমার নিয়োগের মর্যাদা উর্ধে তুলে ধরলাম। বরোদার বিরুদ্ধে ওয়াকওভার পেয়ে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে খেলা। সে খেলায় আমার প্রতিপক্ষ প্রোফেসার দেওধর। সোহানী সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায় ১৪৩ করলেন আর হাজারে চার ঘণ্টায় ১১৭; মহারাষ্ট্রের রান উঠে গেল ৫০৬। আমাদের পক্ষে বোলিং-এ বালুচ বিশেষ কৃতিত্ব দেখালেন, নতুন বল হলেই উইকেট। প্রথম ওভারেই এস জি পাওবায়কে শূন্য রানে বোল্ড করলেন, দেওধরকে নিলেন ১৫২-য়, সোহোনিকে ৩০৫-এ। মহারাষ্ট্রের ৫১৬-র জবাবে আমরা করলাম ৩৩৫। ওখানেই খেল খতম, তবে আহমেবাদের দর্শকদের পয়সা হজম হয়ে যায়নি। যেভাবে ১২১ মিনিটে ১১৬ রান পিটিয়ে ছিলাম আমি, চার মেরেছিলাম ১৯টা একটা হপ্তা তার আনন্দময় স্মৃতি তারা বহুদিন বহন করেছে। বস্তুত রঞ্জি প্রতিযোগিতায় আমার জীবনের গৌরবময় অধ্যায়ের এখানেই সূচনা।

আমার যাযাবর জীবনে অচিরেই যবনিকা পড়লো। ইন্দোরের তরুণ রাজা হোলকার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশান প্রতিষ্ঠা করে রঞ্জি ট্রফিতে সেই দলের জন্য স্বীকৃতি সংগ্রহ করলেন। সি কে নাইডু ফিরে এসে দলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করলেন আমার ও আমাদের দলের পক্ষে এক মহান গৌরবময় রণক্ষেত্রে পদার্পণ সম্ভব হল।

কুড়ি

গৌরব শিখরে হোলকার দল

রঞ্জি প্রতিযোগিতায় হোলকার দলের প্রথম অংশ গ্রহণে কোন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু ক'বছরের মধ্যেই তারা অনেকের উপরে উঠে গেল। ধীরে ধীরে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে ১৯৪৫-৪৬ মরশুমে তারা চ্যাম্পিয়ান হল।

১৯৪০ সালে ভারতীয় দলের ইংল্যাণ্ড সফর প্রায় নিশ্চিত ছিল; কিন্তু ইংল্যাণ্ড তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে। অতএব বাতিল হল সফর। যুদ্ধের কবছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বন্ধ থাকার ফলে ভারতীয় ক্রিকেট পরিচালক বৃন্দ রঞ্জি প্রতিযোগিতায় পূর্ণ মনঃসংযোগের সুযোগ পেলেন।

প্রথম বছর (১৯৪১ ৪২) খেলতে নেমে হোলকার দল প্রথম খেলাতেই পি ই পালিয়া পরিচালিত যুক্ত প্রদেশ দলের কাছে হেরে যায়। আমার অবস্থা আরো শোচনীয়। জগদেল-এর সঙ্গে বোলিং সূচনা করে আমি ১১ ওভারে ৩৬ রান দিয়েও কোন উইকেট লাভ করতে পারিনি, পরে তিন নম্বর ব্যাটিং করতে নেমে বিনা রানে আউট হয়ে যাই।

পরের বছর আমাদের দল পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে যুক্তপ্রদেশকে হারায় এবং পরের ম্যাচে বাংলাকে। লক্ষৌতে যুক্তপ্রদেশের বিরুদ্ধে আমার নিজস্ব অপরাজিত ৬৬ রান সত্ত্বেও প্রথম ইনিংসে ১০৩ রানে পিছিয়ে থাকে আমাদের দল। দ্বিতীয় ইনিংসে ১২৭ মিনিটে আমার ১১৩ রানের জোরে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ সম্ভব হয়। সে জয় সম্ভব হয় সি কে ও জগদেল-এর অনবদ্য যুগ্ম খেলায়।

বাংলার বিরুদ্ধে আমাদের নিজস্ব মাঠে এইবার প্রথম খেললাম এবং প্রথমবার জিতলাম। এর আগে মধ্য ভারতের হয়ে তিনবার ইডেনে খেলেছি, তিনবারই হেরেছি। নাইডু টসে জেতার পর হোলকার ৬১৮ রান তুললো। আমার ১১৮ ছাড়াও সি কে (১০২) ও বি বি নির্মলকর (১৭৮) শতরান করলেন। দশম ব্যাটসম্যান হিসেবে ইশ্‌তিয়ার ৫৮ রান করে অপরাজিত থাকলেন। বাঙ্‌লা দল ২২১ রানে শেষ। আমি ৫৩ রানে যে দুটি উইকেট নিলাম তার একজন এক নম্বর ব্যাটসম্যান কমল ভট্টাচার্য।

হায়দ্রাবাদে স্থানীয় দলের বিরুদ্ধে আমরা ১৮৭ রানে হেরে গেলাম। আমার প্রথম ইনিংসের সর্বোচ্চ রান ৭২ ও ১০৪ রানে চার উইকেট দলের পক্ষে সহায়ক হল না।

যুক্তপ্রদেশ—হোলকার খেলার সময়কার একটি ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না। দ্বিতীয় ইনিংসে আলেকজাণ্ডারের একটা বল মেরে আমি ধীরে রান নিচ্ছি। উইকেটের কাছাকাছি পৌচেছি এমন সময় আলেকজাণ্ডার পায়ে করে শট করতেই বলটা বেইল উড়িয়ে নিয়ে গেল। আউটের দাবি উঠলো কিন্তু আম্পায়ার তা নস্যাৎ করলেন। বেঁচে গেলাম, সেঞ্চুরিটা করতে পারলাম, কিন্তু মনে সন্দেহ রইল, বোধ হয় আউট হয়েছিলাম। খেলার শেষে আম্পায়ারকে প্রশ্ন করতে সঙ্গে সঙ্গে তিনি জবাব দিলেন—তুমি নিশ্চয়ই আউট হয়েছিলে, তবে তোমার খেলা দেখে যে আনন্দ পাচ্ছিলাম, তাতে তোমার আউট হওয়া আমি চাইনি। অথচ পরবর্তী কালে ওই ভদ্রলোকই সর্ব ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে আমাকে টেষ্ট ক্রিকেট থেকে বাতিল করার নিমিত্ত হয়েছিলেন। সে বিষয়ে পরে আলোচনা করবো।

১৯৪৩-৪৪-এও যুক্তপ্রদেশকে হারালাম। প্রথম ইনিংসে সি. কে সেঞ্চুরি করলেন; দ্বিতীয় ইনিংসে আমার ১৬৩ আমাদের জয়ের ভিত্তি হল। আমরা ছোব্ড়ার উইকেটে পেয়ে বাঙলাকে নাজেহাল করেছিলাম, এবার ইডেনের তৃণাচ্ছাদিত মাঠে বাঙ্লা তার শোধ তুললো। তরুণ প্রণব (খোকন) সেনের সেঞ্চুরির মধ্যে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পেলাম। নির্মল চ্যাটার্জীও অপূর্ব ব্যাটিং করলেন। ওদের রান উঠলো ৩৮৭। এবার কমল ভট্টাচার্যের আক্রমণ শুরু হল, ২৬ রানে ৬ উইকেট নিয়ে তিনি ১৩৮ রান আমাদের পতনের হেতু হলেন। আমরা ফলো-অন করার পরে ২১ রান করে বাঙ্লা দল জিতে গেল। দুইনিংসেই আমার রান দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩৩ ও ৭০। এ খেলায় আগের যুগের সরকারী ও বেসরকারী টেস্ট খেলা থেকেও বেশি দর্শক সমাগম হয়েছিল, কেউ কেউ বললেন রেকর্ড। কিন্তু পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক খেলার পুনরাবৃত্তিতে রঞ্জি ট্রফির খেলায় জনসমাগম কমে গিয়েছে।

বাঙ্লা দলের নির্মল চ্যাটার্জীর ব্যাটিং-এ আমি নিজের ছায়া প্রত্যক্ষ করলাম, প্রতিটি স্ট্রোকে সৌন্দর্য ও মাধুর্য, দর্শকদের মধ্যে খেলোয়াড়ের মনের আনন্দময়তা সঞ্চারিত। সে বছর নির্মল রঞ্জির খেলায় মোট ৩৮৮ রান করে-ছিলেন, তার মধ্যে একটি ছিল ১২২ রান, গড় হিসেব ৫৫·৪২। কমল ভট্টাচার্য

উইকেট পিছু ১৫.৬৫ রান দিয়ে উইকেট নিলেন ২৩টি, সেবারের সমগ্র প্রতিযোগিতায় বোলিং-এ তাঁর কৃতিত্ব ছিল দু নম্বর, এক নম্বর ছিলেন পশ্চিম ভারত দলের সঈদ আহমেদ, তাঁর ছিল ২৮টি উইকেট গড় হিসাব ১১.৫০।

পরের বছর ১৯৪৪-৪৫-এ হোলকার দল সর্বপ্রথম ফাইনালে উঠলো। এই সময় দলের শক্তি আরো বেড়েছে, চাঁদু সারভাতে, সি, এস-নাইডু, কমল, ভাণ্ডারকর, হোলকার রাজ্য সরকারে চাকরি নিয়ে দলভুক্ত হয়েছেন। আমাদের এই শক্তিবৃদ্ধি ও সার্থকতা সম্ভব হয়েছিল স্বয়ং হোলকারের আগ্রহ ও প্রয়াসের ফলে। তাছাড়া অধিনায়ক সি.কে ছিলেন আক্রমণাত্মক খেলার পক্ষপাতী। ভাগ্যগুণে আমরা প্রখ্যাত ইংরেজ টেস্টে খেলোয়াড় ডেনিস কম্প্টনকেও দলে পেলাম। যুদ্ধকালীন ভারতীয়স্থ বৃটিশ সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত ডেনিস তখন ইন্দোর থেকে ১৪ মাইল দূরের সৈন্যঘাঁটি মাহতে থাকছেন। হোলকার সৈন্যদলের প্রধান জেনারেল উইলিয়ামসের চেষ্টায় বৃটিশ সৈন্যদলের কাছ থেকে মিডলসেক্সের টেস্ট খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটনের হোলকার দলে খেলার অনুমতি মিলেছিল বোর্ড অব কণ্ট্রোলের অনুমোদন মিলেছিল।

প্রথম খেলা বিহারের সঙ্গে, ডেনিস কম্পটন ছাড়াই এক ইনিংসে হারালাম তাদের, আমি অল্পক্ষণ খেলে ৪১ রান করলাম। পরের ম্যাচে বাঙ্লাদলকে আবার আমাদের ঘরোয়া ছোবড়ার উইকেটে কাবু করলাম। আমাদের ৫৩৮, ওরা ইনিংসে হেরে গেল। মাদ্রাজে সেমি-ফাইনাল খেলায় চিপকের ঘাসের উইকেটও কিন্তু আমাদের অনুকূলই হল। হোলকার দলের হয়ে মারাত্মক বোলিং করলেন সারভাতে, ৪৯ রানে ১৪টি উইকেট নিলেন, ব্যাটিং-ও ইনিংস সূচনা করে ৭৪ রান করেন, কম্পটন ৮১। দশ উইকেটে জিতে হোলকার দল ফাইনালে উঠলো।

দারুণ গরমের মধ্যে বোম্বাইতে ফাইনাল খেলা। হোলকার দলেরই সেবারকার খেলার স্থান নির্বাচনের অধিকার। ঠিক ছিল ইন্দোরের ছোবড়া উইকেটে খেলা হবে এবং আমরা যথেষ্ট সুবিধা পাব। তবু আমাদের অধিনায়ক সি কে নাইডু কেন যে বম্বেতে রাজি হয়ে গেলেন! গুজবে আমি বিশ্বাস না করলেও গুজবটির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। হিন্দু জিমখানা নাকি সি কে-কে সর্ত দিয়েছিল রঞ্জি ফাইনাল যদি বম্বেতে খেলা হয় তবে তারা সি কেঁর সম্মানে একটি খেলার ব্যবস্থা করবে। তবে আমার ধারনা নিজের দলের শক্তি সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই অধিনায়ক ওদের অনুকূল পরিবেশেই

ওদের হারাবার চেষ্টা করতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া ছোবড়ার উইকেটে অনভ্যস্ত বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে অসমান যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব ক্ষুণ্ণ হত বলেই তাঁর ধারনা হয়ে থাকবে।

বোম্বাই দলের অধিনায়ক বিজয় মার্চেন্টের দক্ষতা তখন তুঙ্গে, তাঁর পিছনে অমিত বিক্রম সব খেলোয়াড়, রুসি মোদি, ইব্রাহিম, রঙ্গনেকার, উদয় মার্চেন্ট, মন্ত্রী, তারাপোর এবং আরো অনেকে। কেউ সেঞ্চুরি না করা সত্ত্বেও বোম্বাই দল ৪৬২ রান তুললো, আমাদের জবাব ৩৬০, তার মধ্যে আমার অবদান ১০৯। দ্বিতীয় ইনিংসে আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে খাটালো বোম্বাই, ন উইকেটে রান তুললো ৭৬৮, মার্চেন্ট একাই দুশর ওপর, মোদি ও কুপার শতাধিক করে রান। আমরা যখন আবার ব্যাট করতে নামলাম ৮৬৯ রানের দুরূহ মাউণ্ট এভারেস্ট আরোহণের দায়িত্ব আমাদের সামনে। তবু আমি ও ডেনিস চতুর্থ জুড়িতে বোম্বাই বোলারদের মারে মারে অন্ধকার দেখিয়ে দিলাম। আমার নিজস্ব রান যখন একশ'র কাছাকাছি দুজনে মিলে অল্প দূরের রান নিয়ে নিয়ে ওদের ফিল্ডিং ছত্রখান করে দিলাম, এমন সমঝোতা নিয়ে খেলেছিলাম দুজনে যেন আমাদের একত্রে খেলায় বহু বছরের অভিজ্ঞতা।

বিপুল অভিনন্দনের মধ্যে একই খেলায় আমার দ্বিতীয় শতরান পূর্ণ হল। এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী আমার আগে আর তিনজন হয়েছেন, বোম্বাই-এর এস এম কাদ্রি (১৯৩৫-৩৬), মহারাষ্ট্রের দেওধর (১৯৪৪-৪৫) ও বরোদার বিজয় হাজারে (১৯৪৪-৪৫)। ওঁরা তিনজনই করেছিলেন আঞ্চলিক খেলায়, আমি করলাম একেবারে ফাইনালে, বিশেষ করে যখন আমাদের সামনে দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার। করমর্দনে অভিনন্দন জানাবার সময় নীচু গলায় ডেনিস বললেন আমি যদি একটু স্থির হয়ে খেলি হোলকার দলের পক্ষে জয়লাভ অসম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু ১৩৯ রান করেই উদয় মার্চেন্টর হাতে যখন ধরা পড়ে গেলাম, ডেনিস বিহ্বল। আমারও মনটা ভেঙ্গে গেল, যদি সঙ্গীর কথা শুনে একটু শান্ত হয়ে খেলতাম। কিন্তু রক্তে আমার তখন মারের নেশায় উত্তাল তরঙ্গ, রাশ টানার ক্ষমতা ছিল না। মনে এতবড় ধাক্কা খেয়েও ডেনিস কিন্তু খেলেই চললেন, রওয়ালকে নিয়ে শেষ জুড়িতে ১০৯ যোগ করলেন। এগার রান করে রওয়াল যখন আউট ডেনিসের নিজস্ব রান তখন ২৪৯, কিন্তু তখন তিনি সঙ্গীবিহীন একা, মাথা নিচু করে ফিরে এলেন প্যাভিলিয়ানে। ৩৭৭ রানে হেরে গেলাম আমরা। ক্রিকেট দলগত খেলা

অথচ আমরা দুজন ছাড়া দু' অঙ্কের রান করেছিল মাত্র চারজন ৪০, ১৭, ১৩ ও ১১।

ইন্দোর থেকে অনেক পয়সাওয়ালা লোক খেলা দেখতে বোম্বাই এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে শেঠ হীরালাল টোপ দিয়েছিলেন প্রথম ইনিংসে যে কোন হোলকার খেলোয়াড় শতরান পূর্ণ করবেন, পরবর্তী প্রতি রানের জন্য তিনি ৫০ টাকা করে পাবেন। আমার খেলার সময় মারের আনন্দ ছাড়া অন্য কোন লক্ষ্য থাকে না, টাকা কামাবার মন থাকলে অনেক কামাতে পারতাম সেদিন। ন' রানের পুরস্কার ৪৫০ টাকা পেয়েই খুশি হতে হল। ডেনিস নাকি তাঁর কোন গ্রন্থে অভিযোগ করেছেন যে শেঠ হীরালাল প্রতিশ্রুতি মত তাকে ১৪৯×৫০ টাকা দেননি। আমি ডেনিসকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে প্রতিশ্রুতি শুধু প্রথম ইনিংস সম্পর্কেই ছিল।

আমরা হারলেও ম্যাচটি স্মরণীয়। সি এস মোট ১৫২ ওভার বোলিং করে জাতীয় প্রতিযোগিতায় নতুন রেকর্ড করলেন, বিজয় মার্চেন্টের ও রঞ্জিতে তিন হাজার রান পূর্ণ হল, যে কৃতিত্ব এর আগে কারো ভাগ্যে জোটেনি।

১৯৪৪-৪৫ মরশুমের ব্যর্থতাই আমাদের পরবর্তী বছরে সার্থকতা অর্জনের ভিত্তিস্বরূপ হল। তবে ১৯৪৫-৪৬ সালের দলগত সার্থকতায় আমার নিজস্ব অবদান ছিল নগণ্য। ছটি পূর্ণাঙ্গ ইনিংসে আমার মোট রান ১০৫, হোলকার দলের ব্যাটিং-এর গড়পড়তা হিসেবে প্রথম দশজনের মধ্যেও আমার ঠাঁই হল না। প্রথম দুটি খেলায় এক ওভারও বল করিনি, একটিও ক্যাচ নিতে পারিনি। মহীশূরের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮ ওভার বল করে ও ১৮ রান দিয়ে উইকেটে একটি পেয়েছিলাম, ওই পর্যন্ত।

বিহারকে এক ইনিংসে হারিয়ে আমরা বাঙলার সঙ্গে খেলতে ইডেনে আসি। সারভাতে, সি এস জগদেও, বি বি নিম্বলকার-এর কৃতিত্বে পরাজিত বাঙলা দলে নির্মল চ্যাটার্জীর খেলা ভোলবার নয়। শতরান পুরলো না, ৯৯-এর মাথায় আউট হয়ে গেলেন তিনি।

সেবারকার প্রতিযোগিতায় অনেক অঘটন ঘটেছিল। অপরাজেয় বোম্বাই দল প্রথম খেলাতেই বাতিল, বরোদার কাছে টসে হেরে গেল। এবারই প্রথম আইন হল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উভয় দলের এক এক ইনিংস সম্পূর্ণ না হলে মুদ্রাক্ষেপণে জয় পরাজয় নির্ধারিত হবে। বোম্বাই-এর ৬৩৫ এবং বরোদার হয়েছিল ছ'উইকেটে ৪৬৫, তারপরেই টস।

বরোদা দ্বিতীয়বার টসে জিতলো, দক্ষিণ পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে সেমি-ফাইনাল খেলায়। এখানে অসমাপ্ত ইনিংসের প্রশ্ন নয়। দুদলের রান সমষ্টি এক, রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসে একমাত্র টাই ম্যাচ। অমীমাংসিত খেলা নয় বলেই প্রথম ইনিংসের ভিত্তিতে জয়-পরাজয় সিদ্ধান্ত হয়নি। হলে বরোদাই বাতিল হয়ে যেত, প্রথম ইনিংসে ৬১ রানে পিছিয়ে ছিল ওরা।

ইন্দোরে ফাইনাল খেলা, সাড়ে ছ'ঘণ্টা ব্যাট করে ২২০ করলেন সি কে তার মধ্যে ২০টা চার। হোলকারের ৩৪২-এর উত্তরে বরোদা করলো মাত্র ২৬২, কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে হোলকার যে ২৭৩ তুললো তা সম্ভব হল হীরালাল গাইকোয়াড় (৭৯) ও পি রওয়ালের দশম জুড়িতে ১৩০ রানের দৌলতে। বরোদার জয় লক্ষ্য ৪১৯। দৃঢ় সংগ্রাম করে ওরা সে লক্ষ্যের কাছাকাছি এসেও ৫৬ রানে হেরে গেল। এম এম নাইডু ৯৯ রান করে অপরাজিত থাকলেন। দলের পরাজয়েরও পরে যা তাঁকে বেদনার্ত করলো, সে তার শতরানে বঞ্চিত হওয়া।

হোলকার দলের পক্ষে এবারের সবচেয়ে স্মরণীয় খেলা মহীশূরের বিরুদ্ধে সেমি ফাইনাল। আমরা ৯২১ রান করে আট উইকেটে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলাম, তারমধ্যে ছ'জনের সেঞ্চুরি, আর আমার রান মাত্র দুই। এ খেলায় সার্থকতার মূল স্থপতি ৫০ বর্ষ বয়স্ক প্রবীন সি কে, দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং ও কুশলী অধিনায়কতায় তিনি অদ্বিতীয়। সারভাতে ২২টি (গড় ১৬.২২) ও সি এস নাইডু ২৩টি (গড় ২৬.২১) উইকেট নিয়ে অধিনায়কদের সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা দান করছিলেন। তবে সামগ্রিক সহযোগিতার মূল্যও কিছু কম ছিল না।

ইন্দোরী হিসেবে আমি নিজের ব্যর্থতার গ্লানি গায়েই মাখলাম না, সার্থকতার ভিত্তিতে সামগ্রিক ভাবে হোলকার দলের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস যে বেড়ে গেল আমিও তার অংশীদার হলাম। জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় পরবর্তী বছরগুলি আমার সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়। কিন্তু সর্বভারতীয় নির্বাচক মণ্ডলী কেন যে আমার ওপর বিরূপ হলেন, দূর যা বলে ঠেলে সরিয়ে দিলেন আমাকে? এইটিই আমার পক্ষে সবচেয়ে বেদনার।

একুশ

মুশতাখ ছাড়া টেষ্ট হবে না

বড় তিক্ত মনোভাব নিয়েই এই অধ্যায় আরম্ভ করছি। ১৯৪৪-৪৫ রঞ্জি প্রতিযোগিতায় আমি সবচেয়ে ভালো খেলেছি, পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ ইনিংসে মোট ৩১৮ রান করেছি। তার মধ্যে বম্বের বিরুদ্ধে ফাইনালের দুটি ইনিংসে দুখানা সেঞ্চুরি, গড় রান ৬৩·৬০। তবু কি যে হল, কোথায় কার আমিত্বে খোঁচা লেগে গেল জানিনা, আমি সর্বভারতীয় দল নির্বাচনে বাদ পড়ে গেলাম, জনসাধারণের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা গেল তাতে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বহুকাল বন্ধ। ১৯৪৫ সালে যাহোক গোছের একটা বিকল্প ব্যবস্থায় এক বে-সরকারী ভারতীয় দল সিংহল সফরে গেল। অধিনায়ক বিজয় মার্চেন্ট, দলে ছিলেন সি এম সারভাতে, অমরনাথ, হাজারে, মানকড়, রঙ্গচারী, রুসি মোদি, কিষেণ চাঁদ, আর বি নিম্বল কর, এ জি রাম সিং, আমিও ছিলাম। হোমি কণ্ট্রাক্টার হলেন ম্যানেজার।

অবহেলিত চৌকষ খেলোয়াড় রাম সিং শেষ পর্যন্ত সামান্য স্বীকৃতি পেলেন দেখে মনটা ভালো লাগলো। লর্ড টেনিসনের দলের সফরের সময়ও তাঁকে সর্বভারতীয় দলে প্রাপ্য স্থান দেওয়া হয়নি। তারপর যখন ১৯৪০-এর ইংল্যাণ্ড সফরে তাঁর ডাক পড়লো, ভারতের হয়ে টেষ্ট খেলার তাঁর শেষ সম্ভাবনাও লোপ পেল। অথচ রঞ্জি ট্রফিতে তাঁর কৃতিত্ব সোনার আখরে লিখে রাখার মত। ১৯৪০-৪১ সালে তিনি জাতীয় প্রতিযোগিতায় হাজার রান ও একশ উইকেটের দুর্লভ সম্মান অর্জন করেন, যা একমাত্র অমর সিং-ই তাঁর আগে পেরেছিলেন, ঠিক আগের মরশুমে, তারও অনেক আগে ১৯৩৫-এ রাম সিং একম্যাচে সেঞ্চুরি করার সঙ্গে আটটি উইকেটও নিয়েছিলেন। তবে সংখ্যা তত্বের পরিমাপ দিয়ে তাঁর প্রতিভা বিচার হয় না। কতবার কত সঙ্কট মুহূর্তে সাহস ও দৃঢ়তা সহকারে তিনি স্বীয় দলের খেলার ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন, সে সব কাহিনী তাঁকে মহত্ব মণ্ডিত করেছে।

এই প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় নির্বাচকবৃন্দ কর্তৃক অবহেলিত আরো দুজনের উল্লেখ করছি, তাঁরা হলেন বাঙলার কমল ভট্টাচার্য ও নির্মল ভটাচার্য,

গোলাম আহমেদকেও তাঁর খেলোয়াড় জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলিতে অবহেলা করে হয়েছিল, তবে দেরিতে হলেও শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তিনি ১৯৫৩-৫৪ সালে সিলভার জুবিলি ওভারসীজ ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে শেষ দুটি বেসরকারি "টেষ্টে" ভারতীয় দলের অধিনায়ক করা হয়েছিল তাঁকে।

সিংহলে এই আমার দ্বিতীয়বার আসা। বহুদিন পরে আসাতে অনেক পরিবর্তন চোখে পড়লো। নতুন স্টেডিয়াম, এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম স্কোর বোর্ড (অবশ্য তার কবছর বাদে ইডেন গার্ডেনে আরো বড় স্কোরবোর্ড তৈরি হয়েছে)। ওভাল নামধেয় ক্রিকেট মাঠের ঘন সবুজ রং ও চিকণ শোভা দেখে মনে হল কোন সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞের হাতের স্পর্শ এতে অবশ্যই আছে। জানলাম আমার অনুমান সত্য, মাঠের তদারক করেন একজন মহিলা, যাঁর সহজাত সৌন্দর্য বোধ ও সৌন্দর্যস্পৃহা মাঠের শোভায় প্রতীয়মান। পৃথিবীর অন্য কোথাও ক্রিকেট মাঠ পরিচর্যার দায়িত্ব কোন মহিলার হাতে আছে বলে আমি শুনিনি। সেবার সিংহলে বর্ষা খুব বেশি, তিনটির মধ্যে দুটি 'টেষ্টই' ভেসে গেল। তৃতীয়টি নিষ্প্রাণভাবে অমীমাংসিত রইল।

আমাদের দলের অবস্থা শোচনীয়। ভেজা মাঠে অমরনাথ, মার্চেণ্ট-এর মত ব্যাটসম্যানরাও সিংহলী বোলারদের হাতে বিপর্যস্ত। যা কিছু খেলা রঙ্গচারীর ও আমার। দর্শনীয় ব্যাটিং-এ ভদ্রগোছের স্কোর তুলতে সাহায্য করলাম আমরা। আমার ৪৫-ই সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান। সিংহলী ক্রিকেটে প্রভূত উন্নতি লক্ষ্য করলাম, বোলিং ও ফিল্ডিং তো খুবই প্রশংসনীয়।

স্বদেশের মাটিতে ভিনু সেবার রাহুগ্রস্ত, কিছুই খেলতে পারছেন না, এমন অবস্থা যে নির্বাচকবৃন্দ তাঁকে বাদ দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। সিংহলে এসে ভিনু নিজের খেলা ফিরে পেলেন দেখে মন ভরে গেল; "টেষ্টে" অদ্ভুত ভালো বল করলেন এবং তার পর থেকে পূর্ণ কৃতিত্বে চললো তাঁর খেলা। রাম সিংও দুর্দান্ত বোলিং করলেন, কিন্তু নির্বাচকবৃন্দ চোখ চেয়ে তা দেখলেন না।

সিংহলে আরো কয়েকটি ম্যাচ খেললাম। তবে মোটের উপর আমাদের দলের খেলা আশানুরূপ হয়নি, যদিচ সিংহলীরা ভালোই খেলেছিল। বিশেষ করে শতশিবম্। আগেই দেখেছি, এবারও দেখলাম, প্রতিটি স্ট্রোকে আনন্দ ছড়িয়ে-দেওয়া খেলা। মন্থরগতি বলে এগিয়ে এসে তাঁর মার কখনো হাফ-ভলি, কখনো ফুল-টস—আজও চোখে ভাসে।

দেশে ফিরে আসার পর আমাদের দিন কাটতে লাগলো অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস দলের পথ চেয়ে। ইউরোপে খণ্ড যুদ্ধ বিরতির ঠিক পরেই ওই দল গঠিত হয়। পোষাক বদলাবার সময়টুকু না মিলতেই কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যদলভুক্ত ক্রিকেট খেলোয়াড়েরা ক্রিকেট খেলতে হাত বাড়িয়ে দিল। লিণ্ডসে হ্যাসেটকে অধিনায়ক ও কীথ মিলারকে সহাধিনায়ক করে ওরা দলগঠন করেছে, এবং ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বে-সরকারী ভিক্টোরি টেষ্ট সীরিজ খেলেছে।

ঘরে ফেরার জন্য উতলা মন সত্বেও ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে "রাবার" জয় করে ওরা ভারতে চারদিনের তিনটি টেষ্ট সমেত গুটি কয়েক ম্যাচ খেলার প্রস্তাব জানালো। এ পক্ষও সাগ্রহে রাজী। প্রথম খেলা লাহোরে উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে। দ্বিতীয় ম্যাচে আমি ওদের সাক্ষাৎ পেলাম। দিল্লীর ফিরোজশা কোটলা মাঠে সামন্তরাজ দলের পক্ষে খেলবার আহ্বান পেয়ে। খেলাটিতে রাজকীয় মহিমা ও মর্যাদা দেখে বিস্মিত হলাম, কিভাবে দীর্ঘকাল প্রাণ দেওয়া নেওয়ার খেলায় মেতে থাকা সত্বেও ক্রিকেটের কৌশল এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি।

ওদের আগে ব্যাটিং, এক উইকেটে ৩৩ রান উঠেছে এমন সময় অধিনায়ক পাতিয়ালার মহারাজা হঠাৎ অমরনাথের বদলি আমাকে বল দিলেন। চার রান মাত্র যোগ হতেই ওয়ার্কম্যান ৪৫ মিনিটের খেলায় প্রথম ভুল করলেন, বলের গতি ঠাহর করতে না পেরে খোঁচা মেরে ঠেলে দিলেন উইকেট কীপাররের হাতে, আমি একটি উইকেট পেয়ে গেলাম। কয়েক ওভাব পরে সি-এস-এর বলে ওয়াদিংটন অনুরূপ ভাবে আউট হতে মিলার এসে যোগ দিলেন হ্যাসেটের সঙ্গে।

মিলারের খেলার অনুপম সাবলীল ভঙ্গি আমাকে মুগ্ধ করলো। কলকণ্ঠে অভিনন্দনের মধ্যে তিনি উইকেটে এলেন। তাঁকে প্রথম বল আমাকেই করতে হল। প্রথম বলটিই চকিতে স্কোয়ার কাট করে সীমান্ত পার করে দিলেন, ওভারের শেষ বলটি সোজা ছক্কা, আরো চার রাণ নিয়ে তিনি সি কের অনবদ্য একটি লেগব্রেক বলের হদিশ করতে না পেরে আউট হলেন।

৭০ রানে চার উইকেট পড়ে গেছে, অবস্থা ভালো নয়; কিন্তু হ্যাসেট পূর্ণ দায়িত্ব নিজের উপর তুলে নিয়ে সহজ ভঙ্গিতে উইকেটের চারপাশে

মারতে লাগলেন, যেমন তার ড্রাইভ, তেমনি লেট কাট, মারেমারে দর্শক-বৃন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ছে। ১২৬ মিনিটের খেলায় তাঁর নিজস্ব শতরান পূর্ণ হল। ১২০র মাথায় সি কের বলে ক্যাচ উঠতে অমরনাথ তা একহাতে ধরতে ব্যর্থ হলেন। ফাঁড়া কেটে যেতেই অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক হুহু করে নিজস্ব দুশ'র দিকে এগোতে থাকলেন, ১৭ রান মাত্র বাকি হ্যাসেটের, আমির ইলাহির বলটি তুলে দিতেই মিড-অফে সি কে ধরে ফেললেন।

ষষ্ঠ জুড়িতে (২৭৯) হ্যাসেটের সাথী উইলিয়ামস দিনের শেষ ওভারে নিজস্ব শতরান পূর্ণ করলেন। একদিনে আট উইকেট ৪৪২ রান উঠলো।

পরদিন সকালেই হ্যাসেট ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। ভাণ্ডারকর ও সি এস কে দিয়ে ইনিংস সূচনা হতে গোল্লাতেই ভাণ্ডারকর আউট। এবার আমার পালা, প্রথম বলেই রোপার নো বল ছাড়লেন, আমিও লেগের দিকে দিকে টেনে নিয়ে বলটা চারে পাঠিয়ে দিলাম, তারপরই উইলিয়ামসের বলে দুটো বাউণ্ডারি। অমরনাথ এসে যোগ দিতে মারের বহর ছুটলো, চারের পর চার। ৪৩ মিনিটে আমার নিজস্ব রান ৫২, তার মধ্যে নট ১৪। মাত্র ৬৯ মিনিটের খেলায় দলের ১০০ রান পূর্ণ হল, আমার তখন ৬১, অমর নাথের ৩৩, ছরান সি এস-এর।

মন্থরগতি বোলারদের বিরুদ্ধে ঝুঁকি নিয়ে খেলে রান পাচ্ছিলাম, প্রাইসকে সোজা ড্রাইভ করে আমার রান হল ১০৩, ১১৭ মিনিটের খেলায়। মধ্যাহ্ন ভোজের আগেই সেঞ্চুরি করে বিপুল অভিনন্দন পেলাম। কিন্তু আর মাত্র পাঁচ রান যোগ হতেই মিলারের বল মারতে টাইমিং ভুল করলে, মিড অফে ধরা পড়লাম। তখনো মধ্যাহ্ন ভোজ বিরতির পাঁচ মিনিট বাকি, অমরনাথের নিজস্ব রান ৭৫।

হাজারে এসে যোগ দিলেন। অমরনাথ কিন্তু মার মার চালিয়ে গেলেন এবং ১৬০ মিনিটে শতরান পূর্ণ করলেন, দিনশেষে ১৪৪ করে অপরাজিত রইলেন। পরদিন আর ন'রান যোগ করতেই মিলার বোল্ড করলেন অমর নাথকে। অমরনাথের জীবনের আমার দেখা ওই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইনিংসের আলোচনা ফিরোজ শা কোটলায় অনেক বছর চলেছে। মাত্র ১৪ রানের খেলাতেই সি কে দর্শকদের দাবি মেনে পেটিফোর্ডকে লং-অনে ছক্কা মেরেছিলেন।

এ খেলার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটিং এরও পরে, দ্বিতীয় ইনিংসে হ্যাসেটের শত

রান পুরলো ৯৮ মিনিটে, অস্ট্রেলিয়ান দল ১৯১ মিনিটে ৩৯০ রান পেটালো। হ্যাসেট ১২৪ রানে নট আউট রইলেন। মিলার ৭৫ রানের নিজের প্রতিভা প্রকাশ করলেন। খেলাটি অবশ্য শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত রইল।

আমার কাছে এই খেলাটি অন্য কারণে স্মরণীয় আছে। আমাতে মিলারে এই প্রথম সাক্ষাৎ এবং প্রথম দর্শনেই প্রেম, তাঁর খেলা, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর চলা, তাঁর ব্যাট ধরার ভঙ্গি, বল করতে তাঁর দৌড়ে যাওয়া, বল দেওয়া এবং সব অবস্থায় দীপ্ত মুখশ্রী আমাকে মুগ্ধ করলো। সেই প্রথম প্রেমের বন্ধন আজও অটুট। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়করূপে ডন ব্র্যাডম্যানের উত্তরাধিকারী হ্যাসেটে আমাতেও ওই ম্যাচেই প্রথম সাক্ষাৎ। সেদিন আমি তাঁর সামনে ও তাঁরই বিরুদ্ধে আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইনিংস খেলতে পেরেছিলাম। তবু পত্রপত্রিকায় হ্যাসেটের বিবৃতি বার হল "মুশতাখ আলি ভারতের প্রথম শ্রেণীর কদর্য ব্যাটসম্যান।" ওই মন্তব্যে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। হ্যাসেট আসলে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন জানিনা। কিন্তু সাংবাদিকরা কৈফিয়ৎ দাবি করেছিলেন, কলকাতায় তো প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়েছিলেন হ্যাসেট। হ্যাসেটও বিমূঢ়, কি জবাব দেবেন জানেন না, অগত্যা বললেন যে তিনি আমার ব্যাটিং-কে প্রচলিত ধারা থেকে অন্যরকম মনে করেন এবং তাই বোঝাতে চেয়েছেন। বারবার বললেন, আপনারা কদর্য শব্দটির উপর জোর না দিয়ে প্রথম শ্রেণীর এই বিশেষণটাই ধরছেন না কেন। এদেশের সাংবাদিক ও সমালোচকরা ওই ব্যাখায় খুশি হতে পারেন নি। তবে আমার ক্ষোভ নেই, কার খেলার পদ্ধতি সম্পর্কে কে কি ভাবেন সেকথা অকপটে বলার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। প্রত্যেক ক্রিকেটারেরই নিজস্ব পছন্দ অপছন্দ আছে, আমার ব্যাটিং-এর ধরণ যদি হ্যাসেটের খারাপ লেগে থাকে, তবে আপত্তি করবো কেন?

যেভাবে খেলে চলছিলাম 'টেষ্ট' দলে আমার নির্বাচন স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু ঠাণ্ডা লেগে বুকে সর্দি বসে যেতে আমি দিল্লী থেকেই নির্বাচক সমিতির চেয়ারম্যানকে ওই মর্মে পত্র দিই, কিন্তু বিস্মিত হলাম সংবাদ পত্রের বিবরণ পড়ে, নির্বাচিত হলেও মুশতাফ প্রথম 'টেষ্টে' অনুপস্থিত। এরপর কলকাতায় দ্বিতীয় 'টেষ্টে' আমি বাদ। পরে জেনেছি আমার 'ইচ্ছাকৃত' অনুপস্থিতির জন্য নির্বাচকবৃন্দ একযোগে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আমাকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

কলকাতায় কিন্তু আমাকে আসতেই হল, সফরকারী দলের বিরুদ্ধে

পূর্বাঞ্চলের পক্ষে খেলার জন্য। খেলার আগেরদিন নেট প্র্যাকটিসের জন্য মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন, কেন আমি বোম্বাই 'টেষ্টে' খেলতে যাইনি। আমি তাঁদের জানালাম যে যথাসময়ে চিঠি দিয়েছিলাম সি সি আইর হেফাজতে, সেই চিঠি যে ডাকে খোয়া যাবে তা কি করে ধরে নেব! আরো জানালাম যে অসুস্থ হয়ে দিল্লীতেই পড়েছিলাম এবং সেখানকার খেলাটির পর ব্যাট-বল স্পর্শ করাও আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পূর্বাঞ্চলের খেলার অভূতপূর্ব নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল এবং যদিচ শেষ দিনের একঘণ্টা খেলা বন্ধ ছিল, খেলার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, পূর্বাঞ্চলের দশ উইকেটে জয়লাভ। নটি খেলায় ওদের দুটি পরাজয়ের প্রথমটিই কলকাতাতে।

পূর্বাঞ্চল দলের অধিনায়ক সি কে নাইডু, অন্য খেলোয়াড়দের মধ্যে আমি, ডেনিস কম্পটন, সারভাতে, শুঁটে ব্যানার্জী, সি এস নাইডু, বি বি নিম্বলকর, নির্মল চ্যাটার্জী, এন (পুঁটু) চৌধুরী। শুরুতেই নাটকীয়তা। স্যাঁৎসেঁতে বদখেয়ালী উইকেটে বোলারদের জয় জয়কার। একদিনে ২৩টি উইকেট পড়লো মোট রান উঠলো ২৬৭। আমার সান্ত্বনা যে ওরি মধ্যে আমার ৪৬ই সবচেয়ে বেশি ব্যক্তিগত রান। প্রথম ইনিংসে আমাদের দলই ২৪ রানে এগিয়ে রইল। ডেনিস কম্পটন তখন সৈন্যহিসেবে কলকাতায় অধিষ্ঠিত। বেশ কিছুক্ষণ একদিক ঠেকা দিয়ে শূন্য রানে আউট হয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় দিনে হ্যাসেট ঝড়ের মত ১২৫ পেটালেন, দ্বিতীয় ইনিংসের ওদের দলগত রান উঠলো ৩০৪। ২৮১ রানের জয়লক্ষ্য নিয়ে নামলো পূর্বাঞ্চল দল কিন্তু প্রথম দুই ব্যাটসম্যানই ঝটিতি প্যাভিলিয়ানে ফিরে গেলেন। এরপর আমার ও ডেনিসের মিলিত প্রয়াস। কলকাতার কোন ইংরেজী পত্রিকা লিখেছিল 'মুশতাখ আলি ও ডেনিস কম্পটন জুড়ির খেলায় ক্রিকেটের কবিতা উৎসারিত হয়েছিল।' দিনশেষে রান হল দু উইকেটে ১২২, কম্পটন ৩৯, আমি ৫৩, দুজনেই নট আউট।

আমরা টেরও পাইনি যে আমরা যখন ইডেনে খেলে চলেছি, সারা কলকাতা শহরে রাজনীতির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। রাত্রে একদল তরুণ সি কে নাইডুর সঙ্গে দেখা করে দাবি জানালো, পুলিশের গুলিতে নিহত এক ছাত্রের সম্মানে পরদিনের খেলায় এক মিনিট নীরবতা পালন করতে হবে। ওই দাবির সঙ্গে পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করেও নাইডু জানালেন, এ ব্যাপারে

তাঁর অধিকার সীমিত, খেলাটির উদ্যোক্তা বাঙলার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েসান, তাঁদের অনুমতি তিনি চাইবেন।

পরদিন সকালে দর্শকাসনগুলি প্রায় শূন্য, আর বাইরে প্রবল বিক্ষোভ। ল্যাগডেন গেটে (বর্তমানে পঙ্কজ গুপ্ত গেট) একদল তরুন সি এ বি-র অস্থায়ী। সভাপতি এ .এ লেসলিকে পাকড়াও করলো। পঙ্কজগুপ্তর চেষ্টায় জনতা পথ ছেড়ে দিল, লেসলিও ওদের যথাসাধ্য করবেন বলে কথা দিলেন। কিন্তু লেসলি যখন হ্যাসেট-এর কাছে এক মিনিট নীরবতার প্রস্তাব জানালেন, হ্যাসেটের মনোভাব প্রতিকূল, তিনি সরাসরি জবাব দিলেন, 'আমরা ক্রিকেট খেলতে এসেছি, স্থানীয় রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে যেতে রাজি নই' লেসলি বোঝালেন যে মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কোন রাজনীতি নেই। নীরবতা পালনে মতৈক্য হল। দুই দলের সব খেলোয়াড়, দুই আম্পায়ার ও সি এ বি-র কর্মকর্তারা মাঠের মধ্যে প্যাভিলিয়ানের সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। ঘণ্টা বাজিয়ে নীরবতা পালনের ও ভঙ্গের নির্দেশ জানালো হল।

খেলা শুরু হতে ঘণ্টা খানেক দেরি হয়ে গেল। পাঁচ রান যোগ করে আমি আউট হতে নিম্বলকর সবে মাঠে নেমেছেন জনকয়েক বিক্ষোভকারী মাঠের মধ্যে ঢুকে আহ্বান জানাতে গ্যালারি থেকে লোক নেমে এল। পঙ্কজ গুপ্ত পরামর্শ দিলেন, জনতার আবেগের বিরোধিতা করা অসমীচিন, তাই দুই দল মধ্যাহ্ন ভোজের উদ্দেশ্যে প্যাভিলিয়ানে ফিরে এল। বিক্ষোভকারীদের জনৈক নেতা কলকাতার এক প্রধান ক্লাবের ফুটবল অধিনায়ক। পঙ্কজবাবু তাকে বোঝালেন যে দুপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকলে দুমিনিট নীরবতা পালন করেছে। বিদেশীদলের সঙ্গে ক্রিকেট খেলায় এরচেয়ে বেশি সমবেদনার প্রকাশ কি করে আদায় করা যায়, এই বক্তব্য স্বীকার করে নিয়ে বিক্ষোভ-কারীরা চলে গেলে আবার শুরু হল খেলা।

অনেকখানি সময় বরবাদ হয়ে গেছে। পূর্বাঞ্চল যে জয়লাভের প্রয়াস করবে এমন সময় নেই। দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা সত্ত্বেও ফালতু বল পেলেই কম্পটন মারতে লাগলেন। ১০১ করে তিনি যখন রোপারের বলে বোল্ড হলেন তখন দলের রান ৬ উইকেটে ২৩৩। পাঁচ রান বাদে সি-এস আউট হলেন, নিম্বলকর, ফনিসলকর, পার্থসারথি ও চৌধুরী বাকি, এঁদের সাধ্যে কুলোবে কি? ফনসলকরকে সঙ্গী নিয়ে নিম্বলকর তিনটে চার মারলেন। তারপর পার্থসারথিকে নিয়ে আরো চারটি বাউণ্ডারি। রান সমান সমান হতে

পেপায়কে বল করতে ডাকা হল, তাঁর প্রথম বলই পার্থসারথি দড়ি পার করে দিয়ে পূর্বাঞ্চল দলের জয় ঘোষণা করলেন। ইডেনের ওই অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলায় জনতার উল্লাস বাদ পড়ে গেল, কারণ কলকাতার জনতা তখন পথে পথে। তবু ওই খেলা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমাদের দলের ১০২ রান উঠেছিল ৭১ মিনিটে, ২০০ রান ১৬০ মিনিটে, আর ২৯৪ রান ২১৮ মিনিটে। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে রানের তীব্র অথচ সার্থক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কদাচ দেখা যায়। আমার নিজের খেলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সংবাদ পত্রে, প্রথম ইনিংসে ৫১ রান ৬১ মিনিটে, দ্বিতীয় ইনিংসের ৫৮ রান ৭৬ মিনিটে।

খেলার শেষে আনন্দোল্লাস তেমন না থাকলেও আর এক বিক্ষোভ প্রদর্শন দেখা গেল। ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে তা একাধারে আনন্দের ও দুঃখের। কলকাতার মানুষ আমায় কত ভালোবাসে ওই বিক্ষোভে তার প্রকাশ আমাকে সত্যি অভিভূত করেছিল। কিন্তু অতবড় ক্রিকেটার কুমার দলীপসিংজীকে বিব্রত করে বিক্ষোভকারীরা আমাকে দুঃখও দিয়েছিল।

কলকাতা' টেস্ট' থেকে আমি বাদ এ নিয়ে সর্বত্র আলোচনা চলছিল। পূর্বাঞ্চলের খেলাটি শেষ হতে না হতেই একদল উত্তেজিত তরুণ প্যাভিলিয়ানের সামনে দাঁড়িয়ে চীৎকার শুরু করে দিল "নো মুশতাখ, নো টেস্ট", মুশতাখকে বাদ দিয়ে টেস্ট খেলা চলবে না। ক্রমে ভীড় বাড়তে থাকে। হঠাৎ একদল মারমুখো হয়ে লাফ দিয়ে প্যাভিলিয়ানে উঠে পড়ে এবং নির্বাচন সমিতির সভাপতি কুমার দলীপ সিংজীকে ঘেরাও করে ফেলে। আমার খেলার সম্পর্কে গভীর প্রীতির বশেই ওরা আমাকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদ জানাচ্ছে একথা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেও আমি ওই অপ্রীতিকর পরিস্থিতে বিশেষ লজ্জা বোধ করলাম। অতবড় ক্রিকেটার এবং অনবদ্য ভদ্রচরিত্রের মানুষ দলীপ সিংজীকে ওরা ধাক্কাধাক্কি ও টানাহেঁচড়া শুরু করে দিল, একজন ওঁর টাইটাও টেনে ধরলো, আমি চেষ্টা করেও তাদের বিরত করতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত ওরা প্রতিশ্রুতি আদায় করে ছাড়লো। মাঝে একদিন বাদ দিয়ে টেস্ট খেলা আরম্ভ। দলীপ সিংজী কথা দিলেন সেই খেলায় মুশতাখ যাতে ভারতীয় দলভুক্ত হন তাঁর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন তিনি।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে দলভুক্ত হয়েও আমি জনগণের প্রীতির প্রতিদান দিতে পারিনি। ৫৫ মিনিট খেলে মাত্র ১৩ রান করে মার্চেণ্ট রান আউট হলেন। এর পর আমার ডাক পড়লো, মেরে ও দ্রুত রান তুলে

খেলার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করলাম বটে। মানকড়কে সাথী করে এগিয়েও চললাম। দলগত ১০০ রান পূরণে তখনও বাকি, হঠাৎ প্রলুব্ধ হয়ে পেপারের একটা অফ-সাইডে পড়া বল মারতে গেলাম। বলটা বিশ্রীভাবে লাফিয়ে উঠ্‌লো, আর ব্যাটের খোঁচায় সোজা গিয়ে সেঁটে বসলো রোপারের হাতে। খেলার মধ্যে সৌন্দর্যের প্রকাশ দেখা না গেলেও মানকড় হাজারে ও মোদী ভালোই রান তুলে চললেন। দ্বিতীয় দিনের মধ্যাহ্ন ভোজের ২৬ মিনিট আগে ৩৮০ রানে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস শেষ হতে অস্ট্রেলিয়ান দল ব্যাটিং-এ নামলো। দ্রুত রান তুলে পরদিন চা-পানের পর পর্যন্ত খেলে ৪৭২ রান করে ফেললো। দুজন শত রান করলেন লুইটিংটন ও পেটিফোর্ড। তবু সকলের চিত্ত জয় করলেন কীথ মিলার। নিজস্ব ৫০ রান পূর্ণ করতে চারটা ছয়ের বাড়ি চালালেন, প্রথম ছক্কা সি-এস-এর বলে, পরের তিনটেই মানকড়ের একই ওভারে, আরেকখানা ছক্কা মারতে গিয়েই আউট হলেন, ব্যাট বলে লাগলো না, স্টাম্পও হতে হল। আগেই মানকড়ের বলে একখানা ছয়ের মার ছেড়ে ছিলেন, কিন্তু একটুর জন্য বলটা এপাশে পড়তে সি-এস ক্যাচ ধরতে হাত বাড়িয়েও শেষ পর্যন্ত ফেলে দিলেন।

এই খেলায় বোলিং-এর ধার ছিল না। চতুর্থ দিনে বিজয় মার্চেন্ট ১১৫ করলেন, কিন্তু দর্শনীয় হল আব্দুল হাফিজের ৮২। খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হল, কিন্তু দর্শকরা মন মজিয়ে খেলা উপভোগ করতে পেরেছিলেন।

আর আমার দ্বিতীয় ইনিংসে, পেপারকে মেরে দুরান নেবার পরই পেটি-ফোর্ডের বল শূন্যে তুলে দিলাম। ফিল্ডারদের মধ্যে একাধিক ক্যাচ ধরতে আসায় বিশৃঙ্খলায় বলটি মাটিতে পড়লো। কিন্তু আমার লাভ বা ওদের ক্ষতি হল না তাতে, কারণ মাত্র এক রান যোগ করেই গালিতে ধরা পড়লাম।

দুটি "টেস্টই" ড্র। তৃতীয় খেলা মাদ্রাজে। হ্যাসেট টসে জিতে নিজে করলেন ১৪৩। দলের রান উঠলো ৩৩৯। আমাদের দলে মানকড় নেই, বিয়ে করতে গেছেন। তবু আমাদের ৫২৫ উঠ্‌লো, অমরনাথ করলেন ১১৩, রুসি মোদী ২০৩, অনবদ্য তাঁদের খেলার ভঙ্গি। ১৯০৬ এর পর এই প্রথম মার্চেন্টের সঙ্গে আমি ইনিংস সূচনা করতে নামলাম। দলের রান সবে ৩১-এ উঠেছে, মার্চেন্ট বিদায়, ৫০ হতেই আমাকেও যেতে হল, এবারেও পেপারের বলে আউট হলাম। ফুল টস এগিয়ে খেলতে গিয়ে নিচু ক্যাচ তুলে দিলাম,

শর্ট মিড অফে, হাসেট তা ধরে ফেললেন, ৫২ মিনিট খেলে রান করলাম মাত্র ৩৭।

অস্ট্রেলিয়ান দল যখন দ্বিতীয় বার ব্যাট করতে নামলো, একটানা মেরে চললো ওদের প্রথম জুড়ি, হুইটিংটনের উইকেট নিয়ে আমি সে জুড়ি ভাঙার নিমিত্ত হলাম। সারভাতে ও শুঁটে ব্যানার্জীর মারাত্মক বোলিং-এ খেলার গতি মন্থর হয়ে এল। কীথ মিলার মাত্র এক রাণ করে শুঁটের বলে আউট হলেন। ২৭৫ রানে ইনিংস শেষ। দ্বিতীয় ইনিংস সূচনা করতে আবার যখন মার্চেন্টের সাথী হয়ে নামলাম, আমাদের লক্ষ্য মাত্র ৯৪ রান, তার মধ্যে আমরাই ৫০ তুলে দিলাম মাত্র ৩৫ মিনিটের খেলায়, আমার রান তখন ৩০, মার্চেন্টের ১৬, এলিসের বদলে ক্রিস্টোফানি বল করতে এলেন। ক্রিস্টোফানির একটা বল পিছিয়ে খেলতে গিয়ে এলবি হয়ে গেলাম। মার্চেন্টও ৩৫ রান করে বিদায় নিলেন। এর পর অমরনাথ এবং হাজারেকেও অল্প রানেই ফেরত যেতে হল। দুই তরুণ আবদুল হাফিজ ও রুসি মোদী আমাদের বিজয় লক্ষ্যে পেঁাছে দিলেন।

সমগ্র সীরিজের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান মোদী, গড়ে ৮৬ হিসেবে মোট ৩৪৪ রান তাঁর। ভারতের উঠ্‌তি ক্রিকেটের শক্তি প্রকাশ পেল অস্ট্রেলিয়ানদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় দলের খেলায়, হাফিজ করলেন ২০০, এম আর বেগ ১৬২, দুজনেই অপরাজিত।

এই সফরে প্রকাশ পেল দুপক্ষেই অনেক ভালো ব্যাটসম্যান আছে, কিন্তু বোলারের দুর্ভিক্ষ। জ্যাক ফিংগলটন তো প্রবন্ধ লিখে অস্ট্রেলিয়ার যুদ্ধোত্তর ক্রিকেট সম্পর্কে সংশয়ই প্রকাশ করলেন, বললেন, বোলার নেই, কি হবে? আর ভারতীয় বোলিং-এর দুর্বলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলাম আমি নিজে। সারা সীরিজের হিসেবে আমি বোলারদের ক্রমতালিকায় সবার উপরে। একটি ম্যাচে ছ'ওভার বোলিং করেছিলাম, তার দুটিতে কোন রান হয় নি আর ১৩ রান দিয়ে একটি উইকেট পেয়েছিলাম।

বাইশ

আবার ইংল্যাণ্ড

ক্রিকেট খেলিয়ে দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের গায়েই মহাযুদ্ধের দাহ সব চেয়ে কম লেগেছিল। কাজেই যুদ্ধ বিরতির অব্যবহিত পরে ইংল্যাণ্ডে ক্রিকেট সফরে যাওয়া ভারতের পক্ষেই ছিল সবচেয়ে সহজ।

১৯৪৬ সাল ভারত ও ইংল্যাণ্ডের দুই দেশের পক্ষেই ছিল সঙ্কটকাল, দুই দেশের দীর্ঘ সম্পর্কে বৈপ্লবিক পরিবর্তন তখন আসন্ন, কিন্তু ক্রিকেট সম্পর্কের কোন পরিবর্তন কোন পক্ষেরই কাম্য ছিল না।

আমাদের নির্বাচক মণ্ডলীর খেয়ালিপনা সম্পর্কে অবহিত ছিলাম বলেই ইংল্যাণ্ডগামী ভারতীয় দলে আমার অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ হতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত বোম্বাইএ অনুষ্ঠিত নির্বাচনী খেলায় সেঞ্চুরি করলাম, নির্বাচিত হবার আশা জাগলো। নির্বাচন নীতির মধ্যে সবচেয়ে প্রশংসনীয় ছিল দলগঠনে অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের সমতা রক্ষার প্রয়াস। যা আমার একেবারেই মনে ধরলো না, তা হল অধিনায়ক পদে পতৌদির নবাবের নির্বাচন। একথা আমি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করবো যে অধিনায়ক হিসেবে তিনি অনবদ্য সার্থকতা দেখিয়েছিলেন। ভারতীয় খেলোয়াড়দের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা একান্ত সীমিত হওয়া সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডের উইকেট ও ক্রিকেট পরিবেশ সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান আমাদের খুব কাজে এসেছিল, বিশেষ করে আমরা একান্ত ভিজে পরিবেশে পড়ে গিয়েছিলাম, পঁচিশ বছরের মধ্যে সেবারের মত বর্ষণ হয়নি সে দেশে। নিজের দলের খেলোয়াড়দের সম্পর্কে অধিনায়কের যে অভিজ্ঞতার অভাব সে দুর্বলতা কাটিয়ে দিতে পেরেছিলেন সহাধিনায়ক বিজয় মার্চেণ্ট, পতৌদি পদে পদে মার্চেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ করে চলেছেন। ১৯৩৬ সালের দল কড়া আমলাতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে পরিচালিত হয়েছিল, তার বদলে এবারের ম্যানেজার হাসি খুশি ও সকলের সঙ্গে সবসময় বন্ধুভাবাপন্ন পঙ্কজ গুপ্ত, পতৌদি, গুপ্ত ও মার্চেণ্ট এই তিনজনে যে সফর কমিটি গঠিত হয়েছিল, তার ক্রিয়াকলাপ ছিল কোনরকম সংশয়ের উর্দ্ধে, কোনরকম গোপনীয়তা বর্জিত। দলের প্রত্যেক সদস্যের

সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ ব্যবহার করা হত। তার ফলে দলগত সংহতি হয়েছিল অনবদ্য এবং খেলার ফলাফলে সফর সার্থক হয়েছিল।

আমি আজও বলবো যে প্রতি খেলোয়াড়ের যোগ্যতা দিয়ে বিচার করলে ১৯৩৬-এর দলকেই সবচেয়ে শক্তিশালী বলে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের বহু প্রবীণ সমালোচক ১৯৪৬-এর দলকেই সবচেয়ে শক্তিশালী আখ্যা দিয়েছেন, ফলাফলের বিচারে সে আখ্যা তাদের অবশ্যই প্রাপ্য। আমাদের দল ১৩টি খেলায় জয়লাভ করেছিল, অমীমাংসিত ছিল ১৬টি, আর হার হয়েছিল মোট ৩৩টি খেলার মাত্র চারটিতে। এই সার্থকতার মূলে ছিল পতৌদি ও গুপ্তর প্রেরণা, যে প্রেরণায় প্রত্যেকে সবসময় প্রাণপণ খেলেছে।

ভারত তিনটি টেস্টের একটিও জেতেনি সত্য। তবে প্রথম টেস্টে একজন খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত সার্থকতায়ই ইংল্যাণ্ডের জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয় টেস্টে বার কয়েক বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও এবং অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাতে অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনার অভাব হয় নি কোন সময়েই। তৃতীয় টেস্ট বৃষ্টির জন্য ভেসে গিয়েছিল। সব কিছু বিচার করে মানতেই হবে যে ভারতীয় ক্রিকেটের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি। টেষ্টের বাইরেকার দুটি খেলায় আমাদের পক্ষে যে সব রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা অনেকদিন থাকবে বলেই মনে হয়। আমাদের বোলাররা দুবার হ্যাটট্রিক করেছিলেন। মার্চেণ্ট ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেটে সে বছরের ব্যাটসম্যান ক্রমতালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন, তাঁর ওপরে ছিলেন একমাত্র হ্যামণ্ড। মানকড় হাজার রান ও একশ উইকেটের জোড়া মুকুট লাভ করেছিলেন, যে কৃতিত্ব তাঁর আগে বিদেশী ক্রিকেটার হিসেবে ইংল্যাণ্ডের খেলায় একমাত্র লিয়ারি কনস্টান্টাইনই অর্জন করতে পেরেছিলেন, সেই ১৯২৮ সালে। সবচেয়ে বড় কথা ভারতীয়দের খেলার ধরণ এত জনপ্রিয় ইংল্যাণ্ডে আগে আর কখনো হয়নি।

যারা বলেন যে ভিজে পিচের জন্যই অনেক খেলায় আমরা জয়লাভে বঞ্চিত হয়েছি, তাঁদের সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি। অমরনাথ, মানকড়, সি, এস নাইডু ও সারভাতে ভিজে পিচে সবসময়ই মারাত্মক বোলিং করেছেন, ঠনঠনে শুকনো উইকেটে অনুরূপ বোলিং করার মত আমাদের দলে কেউ না থাকার ফলে আমরা অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছি, বিশেষ করে লর্ডস টেষ্টে তাই ঘটেছে।

ইংল্যাণ্ডের জনকয় সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন যে ভারতীয় দলের বোলিংকে যতটা শক্তিহীন বলে কেউ কেউ ঘোষণা করতে চান, আসলে তা ততটা দুর্বল নয়। সফরের প্রথম খেলায় প্রথম ইনিংসে নামে মাত্র এক রানে এগিয়ে থেকেও উষ্টার্সের কাছে আমরা ১৬ রানে হেরে গেলাম। সে প্রসঙ্গে ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় স্যর গায় কাম্বেল লিখলেন, "বোলারদের অনুকুল পিচ পেলে ভারতীয়রা আমাদের ব্যাটসম্যানদের কঠোর পরীক্ষায় ফেলবে। আমার ধারণা ওরা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সফরকারী দল বলে প্রতিভাত হবে"। আরেকজন লিখলেন, "আমাদের ব্যাটসম্যানদের সম্পর্কে সব চাইতে ভয়ের কথা হল, প্রথম ইনিংসে যে নজন আউট হয়েছেন, তার মধ্যে সাতজনই অনবদ্য উইকেটে বোল্ড হয়েছেন"।

তবু অস্বীকার করে লাভ নেই যে ইংল্যাণ্ডের তুষারধবল ও বৃষ্টি ভেজা ক্রিকেট মরশুমে আমাদের খেলতে খুবই অসুবিধা হয়েছিল। হাওয়াই জাহাজে ইংল্যাণ্ড নেমেই আমাদের সারারাত মোটরে ছুটতে হয়েছে প্রথম খেলার জন্য উস্টার্সশায়ারে পৌঁছতে, আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হবার জন্য এতটুকু সময় পাইনি। তাছাড়া আমরা সবাই একসঙ্গে আসতে পারিনি। সি, এস, সারভাতে গুল মহম্মদ ও আমি এসেছি রয়েল এয়ারফোর্সের ডাকোটা বিমানে। আরেকটা দল বি ও এ সি প্লেনে চড়ে আসতে প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য সিসিলিতে আটকা পড়ে গিয়েছিল। সর্বশেষ যে দল ইংল্যাণ্ডে পৌঁছয় তার মধ্যে ছিলেন, মার্চেণ্ট, মোদী, মানকড়, হিণ্ডলেকর। এর ফলে ভারতের হাই কমিশনার প্রদত্ত অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে সবাই উপস্থিত হতে পারেননি, অনুষ্ঠানের আধঘণ্টা পরে লণ্ডনে পদার্পণ করেছিলেন মার্চেণ্টরা চারজন। আমাদের দল আগেরদিন বেশী রাত্রে এসে নামার ফলে দীর্ঘ বিমান ভ্রমণের ধকল কাটাতে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। কোনমতে অভ্যর্থনা সভায় পৌঁছতে পেরেছিলাম এই যা। পৌঁছে অবশ্য আনন্দই পেয়েছিলাম, দেবোপম পুরুষ সি বি ফ্রাই ও জ্যাক হবসকে সাক্ষাতে শ্রদ্ধা জানাতে পেরেছিলাম। আর্থার গিলিগান ও ডি, আর জার্ডিন প্রমুখ প্রধানদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাছাড়া বন্ধু স্থানীয় অ্যালেন, হোম্‌স্‌, রবিনস ও ডেনিস কম্পটনের সান্নিধ্যে মন আনন্দে ভরে গিয়েছিল।

আমাদের মধ্যে যারা দশ বছর আগে ইংল্যাণ্ড ঘুরে গেছেন, জ্যাবজেবে ঠাণ্ডা আবহাওয়া তাদেরও অসহ্য মনে হল, মন চুপসে গেল।

সব চেয়ে অসুবিধা হয়েছিল আমার, সাইনাসে ভুগে অনেক খেলাতেই যোগ দিতে পারিনি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের মত করে খেলতে পারিনি। গরম দেশের মানুষ শীতের দেশে এসে সাইনাসে পড়লে অবস্থা কাহিল। ১৯৫৬-৫৭-র ইংল্যাণ্ড সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের এভারটন উইকসও সাইনাসে ভুলে আশানুরূপ খেলতে পারেননি।

উস্টার্স শায়ারের খেলায় মার্চেন্টের সঙ্গে ইনিংস সূচনা করলাম, দুজনে মিলে রান করলাম মাত্র ৫৩। পরের ইনিংসে কোন রান না উঠতেই আমি আউট। পরের খেলায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আমার বিশ্রাম, তবে দর্শক হিসেবে নিউজীল্যাণ্ডের টেষ্ট খেলোয়াড় মার্টিন ডোনেলির খেলায় পরমানন্দ লাভ করলাম। তাঁকে সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ ন্যাটা ব্যাটসম্যানদের অন্যতম বলে মনে হয়েছে আমার। ইউনার্ভিসিটি ব্লুপ্রাপ্তির প্রেরণাতেই বোধ হয় তিনি প্রাণমাতানো খেলা দেখালেন, প্রথম ইনিংসে ৬১, দ্বিতীয় ইনিংসে ১১৬ রান করলেন।

পরের ম্যাচ কেনিংটন ওভালে, সারের বিরুদ্ধে। এখানে আমি ব্যাট করতে নামি ১৬৯ রানে ষষ্ঠ উইকেট পড়লে। মার্চেন্ট ও হাজারের প্রথম জুড়ি ভেঙে যায় মাত্র দুরাণে। এরপর মার্চেন্ট ও গুল মহম্মদ চমৎকার খেলেন। চৌকষ খেলোয়াড় হিসেবে সবিশেষ সার্থকতা লাভ করেছিলেন গুল; ডীপ ফিল্ডিং-এ তার তুলনা একমাত্র ১৯৩২-এ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত লাল সিং।

কিন্তু সারের খেলাটি যে স্মরণীয় হয়ে আছে তার নিমিত্ত হলেন সারভাতে ও শুঁটে ব্যানার্জী। ২০৫ রানে অষ্টম উইকেট পড়তে সারভাতে মাঠে নামেন কিন্তু সারভাতে কোন রান করবার আগেই নবম উইকেট পড়ে এবং ব্যানার্জী এসে যোগ দেন। সারে দলের অধিনায়ক চা পানের জন্য বিরাম বিলম্বে নিলেন, আশা, তার আগে ভারতীয় দলের ইনিংস শেষ করে দেবেন। তাঁর দুভার্গ্য শেষ করে দেবার জন্য পরের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। পার্কার ব্যানার্জী-কে বোল্ড করে ইনিংস যখন খতম করলেন ততক্ষণে সারভাতে ও ব্যানার্জী দুজনেই নিজস্ব শতরান তুলে ফেলেছেন। ওঁদের শেষ জুড়ি রান ২৪৯ আজও ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেটে রেকর্ড হিসেবে অক্ষত রয়ে গেছে। সারা দুনিয়ার-এর চেয়ে ভালো শেষ জুড়িতে খেলার আর একটিমাত্র নজীর আছে। অস্ট্রেলিয়াতে ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে খেলায় নিউ সাউথ ওয়েলস এর এ এফ কিপ্যাকস্ (২৬০) ও জে ই এইচ হুকার (৬১) মিলে ৩০৭ রান যোগ

করেছিলেন ১৯২৮-২৯ সালে। তবে ১০ নম্বর ও ১১ নম্বর ব্যাটসম্যান দুজনেই সেঞ্চুরি করেছেন এমন নজির আর নেই দুনিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসে। দুজনেই পাকা ব্যাটসম্যানের মত খেলেছেন, টেষ্টে ইনিংস সূচনা করার যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। আশ্চর্য, ভবিষ্যতে বিদেশের মাটিতে এদের মধ্যে কেউ আর একটা সেঞ্চুরি করতে পারেনি। আমাদের ৪৫৪ রানের জবাবে সারে যখন ব্যাটিং করতে নামে, সি এস নাইডু গুগ্‌লি ছেড়ে পর পর তিন বলে তিন জনকে আউট করেন—ফিশলক, অ্যালেক বেডসার ও বেনেট। সি এস-এর ওই হ্যাট্রিকে আমারও সামান্য একটু অবদান ছিল, ফিশলক ও বেডসার দুজনে বোল্ড আউট হলে তৃতীয় বলে বেনেটকে আমি দ্বিতীয় স্লিপে ক্যাচ ধরেছিলাম। সারে ফলো-অন করে দশ উইকেটে হেরে গেল।

আমি কিছুটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেললাম পরবর্তী ম্যাচে কেম্ব্রিজের বিরুদ্ধে। মার্চেন্ট ও আমি ৫৮ রান তোলার পর মার্চেন্ট আউট, আমি অমরনাথ ও মোদির সহযোগিতায় ৯১ ওঠা পর্যন্ত খেলে নিজস্ব ৫৪ রান করলাম।

এর পরের খেলা লিস্টার্সের বিরুদ্ধে, সেখানে প্রমান হল মার্চেন্ট ভারতের দৃঢ়তম ব্যাটসম্যান। ওই খেলায় টার্নিং উইকেটে মার্চেন্ট যেভাবে ব্যাট করলেন অনুরূপক্ষেত্রে সারা সফরেই আমাদের দলের অন্য ব্যাটসম্যানরা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। পতৌদিরই মত মার্চেন্ট ডান পায়ে ভর করে বিলম্বিত স্ট্রোক ছেড়েছেন। অনেকে ভয় করেছিলেন স্ট্রোক করতে মার্চেন্ট হয়তো বড় বেশি দেরি করে ফেলবেন, কিন্তু দৃঢ়পদে উইকেট বাঁচিয়ে তিনি অনবদ্য বলিষ্ঠ স্ট্রোকে ড্রাইভ ও হুক করেছেন অবলীলাক্রমে। দশ বছর আগে ইংল্যাণ্ডে খেলার অভিজ্ঞতা তিনি সযত্নে পুষে রেখেছিলেন নিশ্চয়ই; ঠাণ্ডা, আলোর স্বল্পতা, এবং বিভিন্ন গতি সম্পন্ন উইকেট কোন কিছুই তাকে বিব্রত করতে পারেনি।

পরে যখন মানসপটে মার্চেন্টের ইংসের পর ইনিংসের খেলা পর্যালোচনা করেছি, মনে হয়েছে সব কিছুর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। আমার ইচ্ছে করে তাঁকে ভারতের হাটন বলে অভিহিত করতে। সব রকম উইকেটে মার্চেন্টের ব্যাটিং দেখে আমাদের খেলোয়াড়দের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ছিল বলে আমি মনে করি। দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যাটসম্যান টেষ্ট পর্যায়ে উঠেও হালে পানি পান না, কোনসময়েই

যথেষ্ট এগিয়ে খেলেন না। আবার সম্পূর্ণ পিছিয়ে খেলাও নয়, অধিকাংশ সময়ই বলে আধ খেচড়া খোঁচামারার চেষ্টা শুধু।

লিস্টার্সের তিনজন ন্যাটা ব্যাটসম্যান পরপর তিন বলে আউট হলেন। প্রথমে হাজারে আউট করলেন হাউয়ার্ডকে। ওভার শেষ হল, অমরনাথ প্রথম তুবলে রেভিংটন ও স্পেরিকে বোল্ড করলেন। মাঝে মাঝে বৃষ্টি, হাড় কাঁপানা শীত, তারই মধ্যে আমাদের ফিল্ডিং হচ্ছে অনবদ্য, গালিতে সি এস নাইডু চমক লাগাচ্ছেন। আমাদের পক্ষে দ্বিতীয় হাট্রিক করেন সারভাতে স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আমাদের পরবর্তী খেলায়। সেই ম্যাচে সারভাতে ৭২ রানে বারটি উইকেট নেন।

লর্ডস মাঠে যখন শক্তিশালী এম সি সি-কে হারালাম আমাদের মনে কি পরিতৃপ্তি। ও দলের অধিনায়ক নরম্যান ইয়ার্ডলি। আর খেলার মধ্যেই পতৌদি ও আমি তুজনেই অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমি মার্চেণ্টএর সঙ্গে ইনিংস সূচনায় ন রান করেছিলাম, মার্চেণ্টর অবশ্য আর একখানা সেঞ্চুরি। পতৌদি মোটেই ব্যাটিং করতে পারলেন না। লর্ডস প্যাভিলিয়ানে সিঁড়িতে পা ফশকে যাওয়ায় পেশিতে টান ধরলো। এরপর এল জ্বর। লণ্ডনে আমাদের প্রধান ডেরা যে হোটেলে সেখানে শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন।

এম সি সি-র বিরুদ্ধে যে এক ইনিংসে জয় তাতে সবারই অবদান ছিল, কেবল আমার ছাড়া, মার্চেণ্ট ১৪০, গুলমহম্মদ ৯৪ হিণ্ডলেকার ৭৬, মোদী ৪৮, আর আমি মাত্র নয়। মানকড় ৭৭ রানে ১০ উইকেট নিলেন, অমরনাথ ৮৩ রানে সাত।

লর্ডস মাঠে প্রথম টেষ্টের আগে পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি। তবে লর্ডস টেষ্টে আমি বাদ রইলাম, আমার নিজেরই অনুরোধে, স্বাস্থ্য খারাপ, নিজের খেলা খেলতে পারছিনা। সেই সুযোগে খেলাটি মন দিয়ে দেখতে পেলাম। রান সংগ্রহের জন্য কী তুর্দান্ত সংগ্রাম। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সারের যমজ ভাইদের অন্যতম অ্যালেক বেডসার তুর্দান্ত বোলিং করলেন। তাঁর প্রসঙ্গে উইজডেন পরে লিখেছিল, জীবনের প্রথম টেষ্ট খেলার এতখানি সার্থকতা কোন বোলার কোনদিন পেয়েছিল কিনা সন্দেহ। পরবর্তী কালে এই অ্যালেক ইংল্যাণ্ড তথা তুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোলার, দ্বিতীয় মরিস টেট— বলে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। ১৪৫ রানে এগারটি উইকেট নেওয়াই বেডসারের কৃতিত্বের শেষ কথা নয়, মিডিয়াম ফাস্ট বোলিং করে অনবদ্য লেংগথ রক্ষা

করেছিলেন তিনি, উইকেটে বলকে অনেকখানি পাক খাইয়েছিলেন। দারুন বৃষ্টির পর প্রথম দিন উইকেটের বদখেয়ালিপনার স্থযোগ নিয়ে বোলাররা রান তোলা প্রায় অসম্ভব করে তুলেছিলেন। ভারতের ব্যাটিং তাই আগাগোড়াই কুঁকড়ে রইল, একমাত্র হাফিজ খাঁ সাবলীল ভাবে খেলেছিলেন, দর্শনীয় কাট, ড্রাইভ ও লেগের মারে স্বকীয়তা ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সিদ্ধে কিছুক্ষণ দৃঢ়তা দেখিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেন নি, ফলে ২০০ রানেই ইনিংস শেষ হয়ে যায়।

ইংল্যাণ্ডের ব্যাটিং শুরু হতেই মহামারী কাণ্ড, ওদের ১৬ রান উঠতেই অমরনাথের বলে হাটন আউট, পরের বলে শূন্য রানে ডেনিস কম্পটন বোল্ড। হ্যামণ্ড এসে হ্যাট্রিক বাঁচালেন বটে, তবে অমরনাথের হাতেই বোল্ড হলেন। ৭০ রানে যে চারটি উইকেট পড়লো চারটিই অমরনাথের। হাউস্টাফ ও গিবস প্রকৃত সাহস ও দৃঢ়তা নিয়ে বিপর্যয় ঠেকালেন। রবিবার ঝকমকে রোদ, পরদিন সোমবারে দ্বিতীয় দিনের খেলার পিচ এবং বাকি মাঠের অবস্থা ভালো, সেই স্থযোগে হাউস্টাফ রাজকীয় মহিমায় খেলে নিজস্ব ২০৫ তুললেন। গিবস দৃঢ়চিত্তে অপর দিকে ঠেকা দিলেন। ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে আগের চেয়ে ভালো করলেও, ইংল্যাণ্ডের জয় লক্ষ্য রইল মাত্র ৪৮ রান। হাতে অঢেল সময়। ইংল্যাণ্ড ৪৮ এর জন্যও খুব সাবধানে খেলে ধীর গতিতে রান তুলতে লাগলো, পরপর সাতখানা এক রান নিয়ে তবে ৪৮ পেরোতে হল, জয়লাভ অবশ্য দশ উইকেটের।

প্রথম দিনের খেলায় সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ মাঠে এসেছিলেন, শুধুমাত্র টেষ্টম্যাচের খেলোয়াড়েরাই নয়, আমাদের দলের সব সদস্যের সঙ্গে তিনি করমর্দন করলেন, আমিও বাদ পড়লাম না।

স্বাস্থ্যের উন্নতি না হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় টেষ্টে আমি খেলতে নামলাম। ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ভাগ্য আমার প্রতি একবার স্থপ্রসন্ন হয়েছিল সে স্মৃতি ভুলতে পারিনি। টসে জিতে ফিল্ডিং নিলেন পতৌদি। তাকে তার জন্য কঠোর সমালোচনা সহ্য করতে হল। ক্রিকেটে কূটনীতি বলে, টসে জিতে অবশ্য ভেবে দেখতে হবে বিপক্ষ দলকে ব্যাটিং দেওয়া হবে কিনা, ভাববে কিন্তু দেবেনা। ধোঁয়াভরা ম্যাঞ্চেস্টারে যথানিয়মে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার ফলে পতৌদি জুয়ার দান ফেললেন, কিন্তু দানটা ঠিকমত পড়লো না। উইকেট কোনভাবেই খারাপ হয়নি, তাই হাটন, ওয়াশব্রুক, কম্পটন, হ্যামণ্ড, গিবস সবই মনের স্থখে

খেললেন, হাউস্টাফই শুধু যা অল্প রানে আউট হলেন। হাটন তিনঘণ্টা খেলার পর আগের ওভারে হ্যামণ্ডের ছয়ের বাড়ির অনুপ্রেরণায় নিজেই ছক্কা হাঁকড়ালেন। মারটা একটু বেখাপ্পা হওয়াতে ডীপ-স্কোয়ার লেগের মাথার ওপর দিয়ে বলটা পড়লো গিয়ে মিউ-উইকেটে সে ক্যাচ ধরার সুযোগ হল আমার, ওইটুকু যা সান্ত্বনা।

মাঝে রবিবারে প্রচুর বৃষ্টি, সোমবারে অমরনাথ ও মানকড় বাকী ছটি উইকেট নিয়ে নিলেন। আর কাউকে বল করতেই হলনা রান যোগ হল মাত্র ৪৮।

সেই ওল্ডট্রাফোর্ড আর নেই। যুদ্ধের সময়েই যন্ত্রশিল্প প্রসারণের ফলে সেখানকার আকাশ রেখা বদলে গেছে। আমার পুরাতন বন্ধু মাঠের সেই বৃদ্ধ মালী মৃত। তবে সেই একই মাঠে মার্চেণ্টের সঙ্গে ইনিংস সূচনা করতে তীব্র পুলক বোধ করলাম। মাঠের অবস্থা ইংল্যাণ্ডের ইনিংস সূচনা অনুরূপ। ভারী রোলার ব্যবহারের ফলে মাটির তলাকার জলীয় ভাবটা ওপরে উঠে এসেছে, পিচ ধীরগতি হয়ে গিয়েছে।

মনের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেললাম, ভুলতে চাইলাম যে এবারকার অধিকাংশ খেলায় আমি কিছুই করতে পারিনি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে নামলাম, আশা ওল্ডট্রাফোর্ড মাঠ যদি আমার প্রতি আবার প্রসন্ন হয়। একটু ধীরে শুরু করে ভোসকে বাউণ্ডারীতে কাট করলাম, কনস্টাণ্টাইনের ভাষায় "সে শটের দীপ্তি ও দুঃসাহসিকতায় জনতার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল'। এরপর ঘিরে ধরা ফিল্ডারদের মাথার ওপর দিয়ে বেডসারকে চার মারলাম। পরের ওভারে ভোসের বলে ন রান নিলাম। একখানা কৌশলী লেটকাট হ্যামণ্ড ঠাহর করতে পারলেন না, চকিতে তা সীমান্ত পেরিয়ে গেল। হ্যামণ্ড বোলার বদলি করতেই তখনকার মত একটু সাবধান হয়ে গেলাম, বয়স আমার দশবছর বেড়েছে, অভিজ্ঞতা থেকে বোধ জেগেছে যে অপ্রয়োজনে দুঃসাহস দেখানো মূর্খতা। অপরদিকে মার্চেণ্টকে প্রতিটি বলে সোজা ব্যাট পেতে দিতে দেখেও কিছুটা শান্ত হবার প্রেরণা পেলাম। কাজেই মাঝে মাঝে চকিত আক্রমণাত্মক মার সত্ত্বেও সাবধানেই খেলতে লাগলাম। একজনের পর একজন ন'জনকে দিয়ে বোলিং করালেন হ্যামণ্ড, তাতে আমি এতটুকু বিব্রত হলাম না, বেমক্কা বল পেলেই পেটাতে লাগলাম। পরে দেখলাম লিয়ারী কনস্টাণ্টাইন-এর মত এককালের দুঃসাহসী ক্রিকেটার লিখেছেন, 'মুশতাখ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ

চঞ্চলতা সংযত করে আরো সহজে রান তুলতে পারছিলেন, অবস্থা বুঝে সঠিক খেলা খেলছিলেন'।

একঘণ্টা খেলা চললো, আরো একঘণ্টা। চা-পানের মিনিট কয় আগে দলের শতরান উঠে গেল, এর মধ্যে আউট করার সুযোগ একটিও কেউই দিইনি। জনতা প্রবল অভিনন্দন জানালো। কিন্তু ক্রিকেট এমন খেলা যে, যেই মুহূর্তে নিজের অবস্থা একান্ত নিরাপদ মনে করছি, তখনি কি করে যেন হাত থেকে বিপদজনক মার বার হয়। যখন বোলিং-এর উপর আমাদের পূর্ণ আধিপত্য, পোলার্ডের একটা ইনসুইংগার আমাকে ঠকালো, নিচু হয়ে গেল বলটা তারপর আমার ব্যাটের ভিতরদিকের কিনারায় ছিটকে গিয়ে উইকেটে লাগলো। কি ভেবে যে এরপর পতৌদি ব্যাটিং-এর ক্রম উলট পালট করে দিলেন! তার ফল হল সর্বনাশা। মাত্র ১৭ রান যোগ হতেই পোলার্ড হাফিজ, মানকড় ও মার্চেণ্টকে আউট করে ৫—২—৭—৪ হিসেবে দাঁড়ালেন। জীবনের প্রথম টেষ্ট খেলায় পোলার্ডের এ অভাবনীয় সার্থকতা। এরপর আঘাত এল বেডসারের কাছ থেকে। ১৫ রান যোগ হতেই আরো তিনটে উইকেট পড়ে গেল। সেদিনের মত খেলা শেষ হল, এই যা রক্ষা।

পরদিন সকাল থেকেই সূর্যালোকের বন্যা এবং যথা সময়ে খেলা শুরু। আর মাত্র দশরানে আমাদের বাকি তিনটি উইকেটের পতন ঘটলো। মার্চেণ্ট আমি একত্রে ১২৪ রান তুলেছিলাম, ইংল্যাণ্ডের তুলনায় প্রথম ইনিংসে আমাদের ঘাটতিও হল সেই ১২৪।

ইংল্যাণ্ডের লক্ষ্য হল তাড়াতাড়ি রান তুলে যথাসময়ে ভারতকে আবার ব্যাটিং করতে নামানো, যাতে তাদের সবাইকে আউট করার মত সময় পাওয়া যায়। কিন্তু রান তোলা অত সহজ হলনা। হাঁটুতে চোট লাগা সত্ত্বেও অমরনাথ একটানা বোলিং করে গেলেন। অবস্থা যা হল তাতে ডেনিস কম্পটন একঘণ্টা খেলে করলেন মাত্র ১৭ রান, মধ্যাহ্নভোজের মধ্যে ৮৪ রানে ইংল্যাণ্ডের অর্ধেক ব্যাটসম্যান প্যাভিলিয়ানে ফেরত চলে গেছে। কিন্তু বিরতির সময়টুকুতে উইকেটের প্রভূত উন্নতি হওয়ায় কম্পটন ও গিবস ১৫৪ রানে পৌছে দিলেন ইংল্যাণ্ডকে এবং তারপরই হ্যামণ্ড ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে ভারতকে ২৭৯ রান তুলে ম্যাচ জেতার জন্য তিনঘণ্টা সময় দিলেন। মাত্র পাঁচ রান উঠতেই মার্চেণ্ট আমি ও পতৌদী আউট। কিন্তু

তাতেও আমাদের মনোবল ভাঙ্লোনা। হাজারে ও মোদি সওয়া ঘণ্টা টিকে থেকে ৭৪ রান যোগ করলেন।

ভারতীয়দলের 'শিশু' হাফিজ প্রথম ইনিংস শিশুসুলভই খেলেছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি অভিজ্ঞ বীরের মত খেললেন, তাঁর মারের চোটে হ্যামণ্ড ফিল্ডিং ছড়িয়ে দিতে বাধ্য হলেন। ইতিমধ্যে সারভাতের উইকেট পেয়ে বেডসার মরশুমের শত উইকেট পূর্ণ করলেন।

খেলা শেষের যখন মাত্র তের মিনিট বাকি আমাদের নবম উইকেট পড়লো। তখনো ১৩৫ রান পিছিয়ে আছি আমরা, কিন্তু সোহোনি ও হিণ্ডলেকার মাটি কামড়ে পড়ে রইলেন। শত চেষ্টা করেও হ্যামণ্ড তাঁদের বিব্রত করতে পারলেন না। খেলা অমীমাংসিতভাবেই শেষ হল। অনেকের মনেই প্রশ্ন হ্যামণ্ড যদি আধঘণ্টা আগে ইনিংস ঘোষণা করতেন, তাহলে কি হত? কিন্তু ওই সব যদি মিলিয়েই ক্রিকেট। খেলার শেষে লিয়ারি কনষ্টাণ্টাইন লিখলেন: 'এর চেয়ে উত্তেজনাময় অনিশ্চয়তার মধ্যে কোন টেষ্টম্যাচের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। কি হয়, কি হয় ভেবে সকলেই দম বন্ধ করে মুহূর্ত গুনছে। সোহানি ৫৫ মিনিট কাল একদিকে ঠেকা দিয়েছে, অন্যদিকে হিণ্ডলেকার ঘড়ির সঙ্গে লড়াই করেছেন, আর দর্শকবৃন্দ উগ্র মনে প্রতিটি বল ও প্রতিটি মিনিট গণনা করেছে।·· নৈতিক জয় অবশ্যই ইংল্যাণ্ডের। তবে কোনঠাসা হয়েও ভারত যে শেষ পর্যন্ত নিজেদের বাঁচাতে পেরেছিল তাতে অনেকেই অখুশী হয় নি।'—মাঠের প্রধান মালি উইলিয়ামস আমাকে খেলার পরে বলেছেন যে ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন ক্ষয়ে যাওয়া উইকেট কখনো দেখা যায়নি। এতেই প্রমান ভারতের ব্যাটসম্যানেরা পরাজয় এড়াতে কি অসম্ভব প্রয়াস করেছেন।'

গিলিগানও ভারতের সংগ্রামী প্রয়াসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন, তিনি বললেন 'খেলা ড্র হওয়াতে পতৌদির পক্ষে টসে জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রয়টারের স্পোর্টস এডিটার ভার্ণন মর্গ্যান মন্তব্য করলেন, ভারতীয়েরা কি কঠোর সংগ্রামী শক্তি পোষণ করে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ওই সব মহারথীরা পিঠ চাপড়ানির ভঙ্গিতে ওই মন্তব্যগুলি করেছেন এমন মনে করার কারণ নেই, ভারতকে প্রাপ্য মর্যাদাই দিয়েছেন।

ভারতীয় ব্যাটিং-এর সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা এল সাসেক্সের বিরুদ্ধে হোভ-এ

অনুষ্ঠিত খেলায়। ওভাল টেষ্টের পরে ওইটিই প্রথম তিন দিনের ম্যাচ। রঞ্জি ও দলীপের স্মৃতি বিজড়িত সাসেক্সের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের রান উঠলো তিন উইকেটে ৫৩৩। মার্চেন্ট ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে ২৪২ করেছিলেন, সাসেক্সের বিরুদ্ধে ও দুশর ওপর রান তুললেন (২০৫)। আরো তিনজন প্রত্যেকই নিজ নিজ রান তিন অঙ্কে নিয়ে গেলেন। যে চারজন ব্যাট নিয়ে মাঠে নেমেছে সেই চারজনেরই সেঞ্চুরি দুনিয়ার ক্রিকেট রেকর্ড কি না সঠিক বলতে পারবো না তবে রেকর্ড হতে পারে বলে আমি ধারণা পোষণ করি। ইংল্যাণ্ড ও সাসেক্সের খেলোয়াড রঞ্জি যখন সাসেক্সে মাঠের বৃহৎ স্কোরবোর্ডটি উপহার দিয়েছিলেন তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি যে তাঁর স্বদেশের খেলোয়াড়দের প্রয়াসেই সেই স্কোরবোর্ড একদিন অভূতপূর্ব রানের পশরা বহন করবে, ঘণ্টায় নব্বই হিসেবে রান তুলবে।

তবু সে খেলায় সবচেয়ে বেশি ব্যক্তিগত রাণের কৃতিত্ব গেল অপরপক্ষে। জর্জ কক্স-এর নিজস্ব ২৩৪ রানের জোরেই সাসেক্স ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পেল।

ওই বিজয়ানন্দের মধ্যেই আমরা খবর পেলাম যে আমাদের দলের ম্যানেজার পঙ্কজ গুপ্ত ক্রিকেট বোর্ডের অবৈতনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। সাসেক্সে আমরা গিরিচূড়ায় উঠেছিলাম, পরবর্তী টন্টনের খেলায় একেবারে পপাত ধরণীতলে, শোচনীয় পরাজয়। এর আগে নিদারুণ ভিজে পিচে দু ইনিংসই খেলতে বাধ্য হয়ে ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে ইনিংসে পরাজিত হয়েছিলাম। কিন্তু টন্টনে সমারসেটের বিরুদ্ধে অনবদ্য স্বাভাবিক পিচে আমরা ৬৪ রানে কাৎ হলাম। দ্বিতীয় বারে ৩৩১ তুলেও আমরা ইনিংস পরাজয় এড়াতে পারলাম না। কারণ সমারসেট ৮ উইকেটে ৫০৬ রান তুলেছিল। সফরে আমাদের দলের সর্বোচ্চ রানের পরেই আমাদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ রান, কী নিষ্ঠুর পরিহাস! তবে সমারসেটের পক্ষে তাদের নিজস্ব মাঠে পাঁচশতের উপর রান উঠলো পরপর তিনবার।

মার্চেন্ট বিনা রানে আউট হতে আমি ২০ ও পতৌদি ২৯ করার পর বাকি সবাই মিলে আরও ১৪ রান। এমন শোচনীয় অবস্থা আমাদের আর কখনো ঘটেনি। অ্যাণ্ড্রুজ ও বিউজ মধ্যাহ্ন ভোজের আগে একটানা বল করে আমাদের কচুকাটা করলেন। ভিজে আবহাওয়ায় তারা বল অনেকখানি স্যুইং করতে পারার ফলেই এই বিপর্যয় ঘটলো, লিয়ারি কনস্টান্টাইন ঠিক কথাই

লিখেছিলেন। 'কঠিন নিষ্প্রাণ পিচে ভীরুতাপূর্ণ ব্যাটিং-এর ফলেই ভারতীয় দলের ওই দুরবস্থা।'

পরের ম্যাচে গ্ল্যামারগণের সঙ্গে ফিরতি খেলা। প্রথমটি অমীমাংসিত ছিল। দ্বিতীয়টি আমরা জিতলাম। আমার পক্ষের খেলাটি স্মরণীয় এই কারণে যে আমি ভাল খেলেছিলাম, দ্বিতীয় ইনিংসে মার্চেণ্ট ৩৬ রানে আউট হয়ে যেতে রুসি মোদির সহযোগিতায় ৭০ মিনিটে ১২১ রান যোগ করেছিলাম। সারা সফরে ওই একবারই নিজস্ব শত রানের সম্ভাবনা জাগাতে পেরেছিলাম, কিন্তু ৯৩ রানের মাথায় আউট হয়ে যাই। আমার খেলা সম্পর্কে কনস্টাণ্টাইন লিখেছিলেন—' মুস্তাকের খেলা কখনো অপূর্ব মাধুর্য ও চাতুর্য মণ্ডিত, কখনো আবার একান্ত শোচনীয় (প্রথম ইনিংসে গোল্লা করেছিলাম)। দ্বিতীয় ইনিংসে গতানুগতি বর্জিত তাঁর বিদ্যুৎচমকের মত খেলাই ছিল ভারতীয়দের পাঁচ উইকেটে জয়লাভের মূলস্তম্ভ।'

তৃতীয় টেষ্টের ঠিক আগের খেলা হ্যামণ্ডের কাউন্টি গ্ল্যস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে। প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে প্রথম দেড় দিনের খেলা বাতিল, দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্ন ভোজের পর শুরু হয়ে খুবই ধীর গতিতে খেলা চলে, কিন্তু শেষের দিকে উত্তেজনা চরমে ওঠে, আমাদের নবম জুড়ি যখন জয়ের পথে অগ্রসর, মাত্র আট রান বাকি, সেই অবস্থায় সারভাতে আউট ও খেলা শেষ। আমি নিজে খেলিনি, দর্শক হিসেবে উপভোগ করেছি, কিভাবে সিগারেটে পোড়া সেপ্টিক আঙুল নিয়ে হাফিজ সারভাতের সঙ্গে দৃঢ়চিত্তে নবম জুড়ি খেলেছেন।

ওই ম্যাচের একটি ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য প্রয়োজন। হ্যামণ্ড যখন ব্যাটিং করছেন উইকেট কীপার নিম্বলকর দু দুবার আউটের আবেদন করেছেন। অন্যান্য খেলোয়াড়েরাও কলকণ্ঠে সে আবেদনে যোগ দিয়েছেন অবশ্য আম্পায়ার তা অনুমোদন করেন নি। খেলার শেষে অধিনায়ক পতৌদি হ্যামণ্ডের কাছে গিয়ে আউটের 'অন্যায়' আবেদনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। এক পক্ষের অধিনায়ক স্বদলের দশ জনের সমবেত আবেদনকে অমান্য করে অপর দলের অধিনায়কের কাছে দুঃখ প্রকাশ করার আর কোন নজীর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আছে কিনা সন্দেহ। পতৌদির ওই কৃত্য অসমীচিন হয়েছিল বলে আমি মনে করি এবং দলের অন্যান্য খেলোয়াড়ও তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

ওভাল মাঠে তৃতীয় তথা চূড়ান্ত টেষ্ট সম্পর্কে টাইমস্ পত্রিকা লিখেছিল,

'ভারতীয় খেলোয়াড়েরা বৃষ্টি ভেজা মাঠের দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিশ্চয়ই অনুভব করেছিলেন যে তাঁদের প্রকৃত যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগে তারা বঞ্চিত হলেন।' যদিচ বৃষ্টির ফলে আশা ও ভয় দুই বিসর্জিত। তবু খেলোয়াড় বদল করে ইংল্যাণ্ড যে তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী দল গঠন করেছিল, তাতেই বোঝা যায় যে তৃতীয় টেষ্ট জিতে ভারত রাবার সমান সমান করে ফেলবার সম্ভাবনা ওদের মনে জেগে ছিল।

তৃতীয় বারও পতৌদিই টসে জিতলেন এবং গতানুগতিক সিদ্ধান্ত ব্যাটিং করতে চাইলেন। কিন্তু একটা পর্যন্ত বৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত যখন খেলা আরম্ভ সম্ভব হল, তখন মাত্র ৯০ মিনিট সময় বাকি আছে। তাও শুরু হল মাঠের বাইরে। ধৈর্যসহকারে অপেক্ষমান জনতার মুখ চেয়ে। দশ হাজার দর্শকের অভিনন্দনের মধ্যে মার্চেণ্টের সঙ্গে আমি ইনিংস সূচনা করতে মাঠে নামলাম। গিলিগান মন্তব্য করেছিলেন যে ঘন ঘন বোলিং পরিবর্তন করেও হ্যামণ্ড ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনে দুঃশ্চিন্তা জাগাতে পারেননি। দিন শেষে আমরা দুজনে রান তুললাম ৭৯, তার মধ্যে আমার ৪৮, মার্চেণ্টের ৩০। খেলাটি কিছুক্ষণের জন্য বসে দেখেছিলেন প্রধান মন্ত্রী অ্যাটিসি সস্ত্রীক। ওই খেলা প্রসঙ্গে জন রবার্টসন সাণ্ডে ডেসপ্যাচ পত্রিকায় লিখলেন, 'কিছুক্ষণের জন্য মুশতাখের হাতের কব্জি যেন উচ্চশ্রেণীর সহজে নমনীয় ইস্পাতের স্প্রিং-এর দিয়ে তৈরী, সে খেলা দর্শনের পরমানন্দও অবর্ণনীয়। লেগের দিকে মারার ঝোঁক ওঁর বেশি। একখানা গ্লাইড ছিল টাইমিং ও সৌকর্যের পরাকাষ্ঠা। মার্চেণ্ট অবশ্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত হননি, কিন্তু তিনি টিকে রয়ে গেছেন, ইংল্যণ্ড ওই ছোট মানুষটির পশ্চাৎ দৃশ্য দেখতে পেলে খুশি হবে।'

কিন্তু জ্যাক হবসের অন্য মত। 'মার্চেণ্ট হলেন দলের মধ্যে সবচেয়ে ত্রুটি বিহীন ব্যাটসম্যান, তাঁকে সরাতে অনেক বেগ পেতে হবে। কিন্তু মুশতাখ আলি অধিকাংশ সময়েই তাড়াতাড়ি বল মারেন, তিনি সারাক্ষণ উইকেটে থাকতে পারবেন বলে মনে হয়নি আমার।'

হবস-ই ঠিক কথাই বলেছিলেন। দ্বিতীয় দিন আর মাত্র ১৫ রান যোগ হতেই আমি আউট হলাম। অবশ্য ওই ১৫-র মধ্যে ১১ রানই আমার ব্যাট থেকে উৎসারিত। কিন্তু মার্চেণ্ট খেলে গেলেন, স্কোর বোর্ডও ঘুরতে লাগলো। ২৭২ যখন উঠেছে তখন আর্সেনাল তথা ইংল্যাণ্ডের ফুটবল খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটনের এক শটে ছিটকে মাঠের বাইরে চালান হয়ে গেলেন। ছুটন্ত বলটি

হাতে করে তুলবার কোন আশা নেই, তবু ডেনিস বোলারদের পিছন থেকে মিড-অন পর্যন্ত পিছু তাড়া করে চলেছেন। ছুটতে ছুটতে বাঁ পায়ে বলে মেরেছেন শট, আর বল গিয়ে সোজা লেগেছে স্ট্যাম্পে। রান নেবার উদ্দেশ্যে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়েছিলেন মার্চেন্ট, মত বদল করে ফিরে আসবার সময় কোন তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন বোধ করেননি। অনুরূপ ঘটনা আর একবার ঘটেছিল ওল্ড ট্রাফোর্ডে, ১৯৩৮ সালে, সেবারও আর্সেনাল তথা ইংল্যাণ্ডের জনৈক ফুটবলারই শট মেরে আউট করেছিলেন ল্যাঙ্কাশায়ারের ব্যাটসম্যান ইডনকে, সেই ফুটবলার ক্রিকেটার জো হিউম মিডলসেক্সের পক্ষে খেলছিলেন।

ভারতের ইনিংস ৩৩১-এ শেষ হলে পর ইংল্যাণ্ডের মাত্র ৬৬ রান উঠতেই হাটন, ওয়াশব্রুক ও ফিশলক আউট হয়ে গেলেন। পরদিন অর্থাৎ তৃতীয় দিনের মধ্যাহ্ন ভোজের সময় যখন আরো বৃষ্টি হওয়াতে ম্যাচটি পরিত্যক্ত হল, তখন কম্পটন ও হ্যামণ্ড জুড়িতে ২৯ রান যোগ হয়েছে, তবে ওই দুজন যতক্ষণ ব্যাট করছিলেন সারাক্ষণই মনে হয়েছে এই বুঝি একটি উইকেট পড়লো।

তৃতীয় টেষ্টের পরবর্তী খেলাটিও নিদারুণ উত্তেজনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়। মাত্র দশ মিনিট থাকতে আমাদের দল জয়লাভ করে, জয়সূচক রানটি করেন গুল মহম্মদ। পতৌদি ও মার্চেণ্টের অনুপস্থিতিতে অমরনাথ এই খেলায় দল পরিচালনা করেন। সারা সফরই ব্যাটিং-এর চেয়ে বোলিং-এ তিনি অধিকতর সার্থকতা অর্জন করেন। টেষ্ট ম্যাচের বোলিং-এর ক্রমপর্যায়ে তিনিই ছিলেন শীর্ষে, মোট তেরটি উইকেট নিয়েছিলেন তিনি, উইকেট প্রতি রান ছিল ২৫·৩৮ সমগ্র সফরে মানকড় নিয়েছিলেন ১২৯টি উইকেট, আর তাঁর ঠিক নিচেই অমরনাথ ও হাজারে, ৫৬টি করে উইকেট নিয়েছিলেন ওঁরাও।

ইংল্যাণ্ড সফরের কাহিনী শেষ করার আগে বেঁটে খাটো হাসিখুশি গুল মহম্মদ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। দলের মধ্যে তাঁর ফিল্ডিং-ই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। একেবারে প্রথম শ্রেণীর একথা আগে বলেছি। ওই সরল প্রকৃতির মানুষটির পিছনে লেগে আমরা অনেক মজা করেছি। তার মনে ধারণা জেগেছিল যে ফিল্ডিং-এর উৎকর্ষের জন্য মাঠের সবারই দৃষ্টি ওরই উপরে নিবদ্ধ ছিল। যখনই তাঁর মনে হয়েছে কোন তরুণী তাঁর সম্পর্কে আগ্রহ দেখাচ্ছে সরল প্রাণের উচ্ছ্বাস নিয়ে আমাদের কাছে তা ব্যক্ত করে ফেলেছেন, আর তার সেই রোমান্স প্রবণতায় আমরাও ইন্ধন জুগিয়েছি।

একদিনের খেলায় দুর্দান্ত ফিল্ডিং করে এসে গুল যখন গল্প করছেন,

কোন মহিলা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার দিকে বার বার চেয়েছিলেন. আমিও সারভাতে একটা মতলব আঁটলাম। গুলের কাছে একখানা প্রেমপত্র আসুক এমন প্রস্তাব করলাম আমি। সারভাতের মেয়েলি হাতের লেখায় চিঠিখানা লেখা হল। তাঁর খেলা দেখে কোনও বিমুগ্ধা তরুণী হৃদয়ের আবেগ উজাড় করে দিয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছে গুল যেন এসে নির্দিষ্ট সময়ে ওয়াটার্লু স্টেশনে এসে তার সঙ্গে দেখা করে। ওই পত্রেও নৈশভোজের প্রস্তাব ও করা আছে। চিঠিখানা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝড় ও তুষার বৃষ্টির মধ্যেই গুল বেরিয়ে পড়লো সেজে গুজে ওয়াটর্লু স্টেশন অভিমুখে। পরদিন দেখা হতেই মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করলাম। গুল কথাটা এড়িয়ে গেল, সংক্ষেপে উদাসীনভাবে উত্তর দিল, "ভিড়ের মধ্যে খুঁজেই পাইনি তাকে।" গুলকে আমরা রহস্যটি ফাঁক করে দিলাম, কিন্তু আমাদের কথা সে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিল। বোধহয় আজও তাঁর মনে বিশ্বাস সত্যিই একটি মেয়ে ওকে প্রেমপত্র পাঠিয়েছিল।

ভারতগামী জাহাজে জায়গা পেতে আমাদের খুব বেগ পেতে হয়েছিল, এক সময় মনে হয়েছিল যে সফর শেষ হয়তো বেশ কদিন লণ্ডনে আটক পড়ে থাকতে হবে। ক্রিকেট বোর্ডের সেক্রেটারী তথা আমাদের ম্যানেজার পঙ্কজ গুপ্ত বিমানে ফেরবার প্রস্তাব করলেন, কিন্তু আসবার সময়কার বিমানভ্রমণের কথা মনে করে অনেকেই তাতে রাজি হল না। অগত্যা গুপ্ত সাহেব বিচার করলেন যে অতিরিক্ত কদিন লণ্ডনে থাকার খরচা বিমানযাত্রার বাড়তি ভাড়ার চেয়ে কম হবে। অতএব জাহাজে জায়গা না পাওয়া পর্যন্ত লণ্ডনেই থেকে যেতে হল। খেলা ফেলা সারাবেলা ঘোরাফেরা, কেনাকাটি ও শহর দেখা, কিন্তু খবর আসতে লাগলো সারা ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডব চলছে। সকলের মনে দারুণ দুশ্চিন্তা, মিঃ গুপ্তও বাদ নয়। হাই কমিশনারের অফিস থেকে খবর এনে জানানো হল আমাদের, প্রত্যেকের ঘর বাড়ি নিরাপদে। দীর্ঘ সফর শেষে আমরা ক্লান্ত, সপ্তাহ ছ দিন হিসেবে ৩৩টি ম্যাচ খেলতে হয়েছে। সবচেয়ে ক্লান্তিকর ছিল একই পথে বারবার রেলে চড়ে যাওয়া আসা, উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে মধ্যাঞ্চলে ফেটেনবার্গ রেল স্টেশনটি আমরা বোধ হয় একশ বার পার হয়েছি। এই ধরণের নিষ্প্রয়োজন হয়রানিতে বিব্রত হয়ে গুপ্ত সাহেব প্রস্তাব করলেন ভবিষ্যৎ সফরে খেলার তালিকা অনেক ভেবে চিন্তে ও হিসেব সহকারে তৈরি করতে হবে।

সঠিক জানিনা তবে আমার ধারণা পরবর্তী ইংল্যাণ্ড সফরগুলিতে আগের চেয়ে অনেক সুব্যবস্থা হয়েছে।

অগত্যা আমাদের শেষ খেলার (১০ই সেপ্টেম্বর) আঠারো দিন পরে মালবাহী জাহাজ এস এস বার্মা আমাদের বুকে ধরে লণ্ডন থেকে ভারতযাত্রা করলো। যাত্রীবাহী জাহাজগুলি সব তখন সৈন্যদের দেশে ফিরিয়ে আনার কাজে খাটছে। জাহাজ ছাড়বে অল্প আগে। ব্যানার্জী একরাশ চীনে মাটির বাসন কিনে এনেই জানালো পকেট গড়ের মাঠ। জাহাজে আমরা মাত্র এগার জন, প্রত্যেকেরই নিজস্ব কেবিন, পতৌদি ও সি কে নাইডু আগেই হাওয়াই পথে উড়ে গেছেন। ঠিক আগের দিন মার্চেণ্টও উড্ডীন, বাড়ি থেকে জরুরী আহ্বান। নিম্বলকর বরোদার গায়েকোয়াড়ের এডিসি, তাঁর মনিবের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে থেকে গেলেন। আবদুল হাফিজও থেকে গেলেন অক্সফোর্ডে উচ্চ-শিক্ষা নেবেন, কিন্তু জাহাজ ছাড়ার মুহূর্তে তাঁর দুচোখ বেয়ে জল ঝরতে লাগলো।

আরেক জনের চোখেও হল, তিনি ৭৩ বছরের বৃদ্ধ লেভসন গাওয়ার, সারে ক্রিকেট ক্লাবের সভাপতি। সারে থেকে ছুটে এসেছিলেন তিনি আমাদের বিদায় দিতে, বললেন কারো তরফ থেকে আসেননি তিনি, এসেছেন একান্ত ভাবে ব্যক্তিগত মনের তাগিদে, যাঁরা ক্রিকেট রসিকদের এমন অনাবিল আনন্দ দিয়েছেন, তাঁদের শুভেচ্ছা জানাতে, সে আনন্দ নাকি আমরা খেলার মাঠের বাইরেও দিয়েছি। তিনি মন্তব্য করলেন যে এতখানি জনপ্রিয়তা আর কোন সফরকারী বিদেশী ক্রিকেট দল অর্জন করতে পারেনি।

সফর সম্পর্কে যে সব সামগ্রিক সমীক্ষা প্রকাশিত হল, তার মধ্যে রবার্টসন-গ্লাসগো-র লেখায় প্রতিটি খেলোয়াড়ের দোষগুণ সম্পর্কে বিশদ বিশ্লেষণমূলক আলোচনা ছিল, শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানের সম্মান দিলেন তিনি হাজারে-কে। মার্চেণ্টকে বললেন বল ঠেলিয়ে, যে দিকের বল সেই দিকেই স্ট্রোকে ঠেলে এগিয়ে দেন তিনি। লিয়ারি কনস্টাণ্টাইন লিখলেন, যেদিন ভারত ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ইংল্যাণ্ডকে হারাবে এবং শুধু তাই নয় অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্টইণ্ডিজ ও নিউজীল্যাণ্ডকেও হারাবে—এমন দিন সুদূর নয় বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

তেত্রিশ

বোল্ড আউট

অক্টোবরের শেষে ভারতের মাটিতে পা দিতেই বুঝতে পারলাম পরিবেশ একেবারে বদলে গেছে। মানুষের অন্তরের একেবারে নিচের তলা থেকে নাগিণীর দল সহস্র ফণা উঁচিয়ে হিস হিস করে বিষ ছড়াচ্ছে; সংশয়, ঘৃণা, ভণ্ডামি ও গোঁড়ামির হলকা ছুটছে সর্বত্র। ভারতে দুটি প্রধান সম্প্রদায় বহু শতাব্দীকাল সুখে দুঃখে মনের মিলে পাশাপাশি বাস করে এসেছে। ক্রিকেটকে ভালবেসেছে, ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতিকল্পে কদম মিশিয়ে এগিয়েছে, আজ তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে বিরাট ব্যবধান। সেই ব্যবধান চরমে পৌছলো, দেশকে কেটে দুটুকরো করার ব্যবস্থায়।

দীর্ঘকালের প্রত্যাশিত স্বাধীনতা। যার জন্য শত শত মানুষ প্রাণ দিয়েছে, হাজারে হাজারে কারাবরণ করেছে, কয়েক লক্ষ করুণ জীবনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সমূলে বিসর্জন দিয়েছে, সেই স্বপ্নের স্বাধীনতা এল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। তারই সঙ্গে এল দেশভাগ। আমাদের কত কত আপন জন, ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও আত্মীয় সহসা সীমান্তপারের বিদেশী বনে গেল, ভারতের অনেক ক্রিকেটারও হারালো ভবিষ্যতে ভারতের হয়ে খেলবার অধিকার। পক্ষান্তরে যেহেতু নতুন ব্যবস্থায় তারা স্বতন্ত্র জাতি তারা এবার থেকে ভারতের বিরুদ্ধে খেলবার অধিকার লাভ করলো। এই রাজনৈতিক দেশচ্ছেদ-এর প্রভাব পড়লো ভারতীয় ক্রিকেটের উপর। ১৯৪৭-৪৮ এ অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য নির্বাচিত ভারতীয় দলের অন্তত একজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় হঠাৎ অভারতীয় বনে গেলেন ১৫ই আগষ্ট।

ইংল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেটারেরা যে মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছেন তারই জোরে ক্রিকেট বোর্ডের মনে ভরসা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও আমরা ভালোই খেলবো। ইংল্যাণ্ড সফরে আমার খেলায় যে দুর্বলতা দেখা গিয়েছিল, তা অচিরেই কাটিয়ে উঠলাম এবং মরশুমের প্রথম রঞ্জি ট্রফি ম্যাচেই সেঞ্চুরী করলাম। চূড়ান্ত দল নির্বাচন উপলক্ষে পুনাতে যে ট্রেনিং ক্যাম্প বসলো, তাতে ডাক পেলাম।

দলগঠন হল : মার্চেণ্ট (অধিনায়ক), অমরনাথ (সহাধিনায়ক), মুশতাখ আলি, হাজারে, মোদি, মানকড়, সি এস নাইডু, ডি জি ফাদকর, হেমু অধিকারী, সোহানি, আমির এলাহি, গুল মহম্মদ, পি সেন, কে এম রঙ্গনেকার ও জে কে ইরানী, ম্যানেজার যোগ্যতম ব্যক্তি পঙ্কজ গুপ্ত।

ফজল মাহমুদ শুরুতেই বাতিল, কারণ তিনি এখন আর ভারতীয় নন, পাকিস্তানি। কিন্তু তার চেয়ে দুঃখের কথা চিকিৎসকদের নির্দেশে মার্চেণ্ট অস্ট্রেলিয়া যেতে পারছেন না। মার্চেণ্ট অগত্যা বিদেশে সফরকারী দলের অধিনায়কের প্রাপ্য মর্যাদা লাভ করায় সকলেই আনন্দিত হয়েছিলেন, কিন্তু সে আনন্দ বিষাদে পরিণত হল। সফরের ধকল সইবার মত তাঁর শরীরের অবস্থা নয় জেনে মার্চেণ্ট বিষণ্ণ সবচেয়ে বেশি। সরকারী সফরে ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব মার্চেণ্টের বিধিলিপি নয়। এর উপর মোদিও ডাক্তারী পরীক্ষার বাতিল সাব্যস্ত হলেন।

অধিনায়কের গুরু দায়িত্ব স্বতই অমরনাথের উপর পড়লো। সফরের ফলাফলে অমরনাথের সার্থকতা প্রমাণিত হয়েছে। সহাধিনায়ক করা হল আমাকে। আমার বেলায়ও ভবিতব্য বাদ সাধলো। আমার কিন্তু সংশয় ভবিতব্যই সবখানি কলকাঠি নাড়েনি।

কী অদ্ভুত সামঞ্জস্য ভারতীয় ক্রিকেটে সেদিনকার তিন 'ম'—মার্চেণ্ট মুশতাখ ও মোদি কারোই অস্ট্রেলিয়া সফর করা হল না। মার্চেণ্টে ও মোদির স্বাস্থ্য ছিল খারাপ, আমার স্বাস্থ্য অনবদ্য। কিন্তু আমার দাদা ইকবাল আলির অস্বাস্থ্যই হল আমার রাহু। কিন্তু ইকবাল আলির অস্বাস্থ্য নয়, আমাদের ক্রিকেট পরিবেশের অস্বাস্থ্যই হল আমার অস্ট্রেলিয়া সফরে যোগদানের বাধা।

সহাধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছি, প্রাপ্য মর্যাদালাভ করেছি, মহানন্দে কম্বলব্যাগ ও ক্রিকেট সরঞ্জাম গোছগাছ শুরু করে দিলাম। দুবার ইংল্যাণ্ড সফর করেছি, কিন্তু ক্রিকেটের দিকপালদের দেশে সফর করবো এবার এত উদ্দীপনা পূর্বে কখনো অনুভব করিনি। ব্র্যাডম্যানের সঙ্গে মোলাকাৎ হবে, তাঁর বিরুদ্ধে খেলবো সেই স্বপ্ন বুঝি এত দিনে সার্থক হতে চলেছে। কিন্তু হায় স্বপ্ন, স্বপ্ন হয়েই রইলো, বাস্তবের আঘাতে নিঃশেষে মিলিয়ে গেল।

ইকবাল আলি খুবই অসুস্থ, পক্ষকাল ধরে শয্যাশায়ী। তার ভিতরে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম চলছে, কিন্তু সেই সংগ্রাম আমার কাছে তিনি প্রাণপণে

গোপন করে চলেছেন। যখনি আমি কাছে গেছি সচেতন প্রয়াসে মুখে প্রসন্নতা ফুটিয়ে তুলেছেন এবং আমার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফর নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাবার মৃত্যুর পর থেকে তিনিই গৃহকর্তা, আমার অভিভাবক। তাছাড়া আমার ক্রিকেট জীবনে তাঁর অনেকখানি অবদান। স্বভাবতই তাঁর প্রতি আমার অপরিসীম প্রীতি ও শ্রদ্ধা।

আমার যেদিন রওনা হবার কথা তার দিন কয়েক আগে দাদা আমায় ডেকে নিয়ে বললেন আমার খেলার এখন সুসময় চলছে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস অস্ট্রেলিয়ায় খেলে আমি স্বদেশে সুনাম অর্জন করতে তথা ভারতীয় ক্রিকেটের মর্যাদা বাড়াতে পারবো। আমাকে তিনি সাবধান করে দিলেন চটকদার খেলা খেলবার লোভ যাতে সংবরণ করতে পারি এবং যেন অন্তত প্রথম দিকে একটু ধৈর্য ধরে খেলি। আমি মন দিয়ে তাঁর উপদেশ শুনলাম এবং তা মেনে চলবার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

দিন দুই বাদে তাঁর কাছে যেতেই দেখি দাদা বুকের যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে খবর দেওয়া হল, কিন্তু তিনি এসে পৌঁছবার আগেই দাদা শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন।

সমগ্র পরিবার মর্মাহত ও বিপর্যয়গ্রস্ত। দুতিনদিন বাড়ি থেকে বার হতেই মন চাইলো না। বিচ্ছেদ বেদনার ওপরেও আমার উপর হঠাৎ চেপে বসলো সমগ্র পরিবারের গুরু দায়িত্ব। এতদিন গায়ে হাওয়া লাগিয়েই বেড়িয়েছি বটগাছের ছাওয়ায়। তাই এখন দায়িত্বটা বড্ড বেশি মনে হল। শুধু অর্থকরী দায়িত্ব নয় পরিবারের সকলের সুখ সুবিধা এখন থেকে আমার উপর নির্ভর করবে, এই বোধ হল বৃহত্তর বোঝা। পরিবারের ছোট ছেলেদের মধ্যে বরাবর গণ্য। হয়ে এসেছে যে হঠাৎ যদি বৃহত্তর ও দায়িত্বের বোঝা তাঁর কাঁধে চাপে, মনের কি অবস্থা হয় ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না।

এই অবস্থায় আমি দিশেহারা হয়ে ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি অ্যাণ্টনি ডি' মেলোকে তারযোগে জানিয়ে দিলাম যে অগ্রজের মৃত্যু ঘটায় আমার পক্ষে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাওয়া সম্ভব হবেনা। এক এককরে চারজন মুখ্য খেলোয়াড় দল থেকে সরে যাওয়ার ফলে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হল, যে শূন্যতা কোন দিনই পূরণ হয়নি। উচিত ছিল সম্পূর্ণ নতুন করে দল গঠন করা, তা হলনা। কলকাতা থেকে অস্ট্রেলিয়া রওনা হবার মুখোমুখি আবোল তাবোল ভাবে ফাঁকগুলি ভর্তি করা হল, স্বভাবতই তাকে নিয়ে তীব্র সমালোচনাও হল:

নতুন করে দলে এলেন পাতিয়ালার রাই সিং, জ্যামনগরের রণবীর সিং, হোলকারের সারভাতে ও মাদ্রাজের রঙ্গচারী। আমার ধারণা নির্বাচনে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়নি। মার্চেন্ট, আমি ও মোদী ব্যাটিং-এর ক্রমপর্যায়ে এক দুই ও তিন নম্বর, সে জায়গা পূরণ নবনির্বাচিত কারোকে দিয়েই সম্ভব নয়।

অস্ট্রেলিয়ার দুর্দান্ত পেস বোলাদের বিরুদ্ধে মানকড়-কে দিয়ে ভারতীয় দলের ব্যাটিং স্থচনা করা হয়েছিল। অনভ্যস্ত সারভাতে নতুন ভূমিকা পালনে বিফল হয়েছিলেন। দলের কোন উপকারেই আসেননি শেষ পর্যন্ত, মানকড় অবশ্য নতুন ভূমিকায় প্রকৃত কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। নির্বাচকদের উচিত ছিল ইনিংস স্থচনার সমস্যা বিবেচনা করে বোম্বাই-এর ইব্রাহিম কিংবা মহারাষ্ট্রের রেগে-কে দলভুক্ত করা। আমার বিশ্বাদ যদি ঠিকমত নির্বাচন হত এবং বদলি খেলোয়াড়দের সবদিক বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা করে নেওয়া হত, তিন 'ম'-কে বাদ দিয়েও ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়ায় অনেক ভালো খেলতে পারতো। নির্বাচনের ব্যাপারে জাতীয় স্বার্থকে চাপা দিয়েছিল আঞ্চলিক মনোভাব। এমন কি মিঃ ডি' মেলো গর্ব করে বলেছিলেন অস্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয়দলে সমগ্র ভারতের মানচিত্র বিধৃত হয়েছে।

শোক পালনের গোণাগুণতি দিনগুলি শেষ হলে আমি মহারাজ হোলকারের এডি-সির কাজ যোগ দিলাম। আমি প্রাসাদে যেতেই হোলকার বাহাদুর আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার গুরুত্ব সম্পর্কে আমাকে অবহিত করলেন। সমগ্রদল তখনো কলকাতায় যাত্রার প্রস্তুতিপর্ব চলছে। হোলকার বাহাদুর কর্ণেল সি কে নাইডুকে ভার দিলেন আমার হয়ে বোর্ড সভাপতি ডি' মেলোকে তারবার্তা পাঠাতে। আমার সফরে যাওয়ার অতিরিক্ত ব্যয়ভার প্রয়োজনমত বহন করবেন একথাও বললেন তিনি।

আমি যাব এই তারবার্তা যথাসময়ে যথাস্থানে পাঠানো হল এবং আমিও যাবার আশায় আবার নতুন করে প্রস্তুত হলাম। আমার আশার কারণ বদলি খেলোয়াড় কাউকে নেওয়া হয়েছে এমন ঘোষণা তখনো হয়নি। কিন্তু মিঃ ডি' মেলোর জবাব পেয়ে থ' মেরে গেলাম। জবাবে আমাকে জানানো হল : দল গঠন সম্পূর্ণ হয়েছে, কাজেই টীমে আমার কোনো ঠাঁই নেই। যখন একজন অভিজ্ঞ ইনিংস স্থচনাকারী ব্যাটসম্যানের একান্ত প্রয়োজন সেই অবস্থায় আমাকে আমার দেশের ক্রিকেটে যথা কর্তব্য করার সুযোগে বঞ্চিত

করা হল। এই অন্যায় ও নির্মম ব্যবহারের স্মারক হিসেবে সেই তারবার্তা-খানি আমি আজও সযত্নে রক্ষা করেছি।

ভারতীয় ক্রিকেটে তখনকার একচ্ছত্র অধিপতি মিঃ অ্যান্টনি ডি' মেলো আমার প্রতি সুবিচার করেননি এই মনোভাব আমি চিরদিন পোষণ করবো। কেন বেছে বেছে আমারই উপর অতবড় নিষ্ঠুর আঘাত হানা হয়েছিল, তার যুক্তি আজো আমি ভেবে পাইনি। বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি, মিঃ ডি' মেলো ছাড়াও দলের মধ্যে বিশিষ্ট দুজন আমার অপসারণের নিমিত্ত হয়েছিলেন। কেমন যেন মনে হয় সংকীর্ণ মানসিকতা ও ঈর্ষাই ছিল ওই ব্যবস্থার মূলে। আমার মনের ভাবনা আজও পাল্টায়নি, যদি কেউ বিরুদ্ধ যুক্তি দিয়ে আমায় বোঝাতে পারেন, আমি এমন যে কারো সঙ্গে তর্কে নামতে প্রস্তুত আছি। ওঁরা অবশ্য পাঁচজন নতুন খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করেছিলেন, যদিচ বদলি হিসাবে দরকার ছিল পাঁচ জনের নয়, চারজনের। তা দিয়ে সংখ্যাপূরণ হতে পারে, উদ্বৃত্ত খেলোয়াড়ও দলে থাকতে পারে, কিন্তু টীম করা যাকে বলে, তা তাঁরা তখনো করেননি। শেষ পর্যন্ত করে উঠতে পারেননি। কাজেই দলগঠন সম্পূর্ণ হয়েছে বোর্ড সভাপতির ওই উক্তি সত্য নয়। বদলি খেলোয়াড় হিসেবে কিষেণচাঁদ ও সারভাতেকে পরে জরুরী ব্যবস্থায় অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হয়েছিল, ওরা দুজনেই অভিজ্ঞ এবং ভালো খেলোয়াড় যদিচ টীমের প্রয়োজন মেটানোর যোগ্য খেলোয়াড় তাঁরা ছিলেন না। কিন্তু দুই রাজকুমার—পাতিয়ালার রাই সিং ও জ্যামনগরের রণবীর সিং? ভারতের বিশিষ্ট খেলোয়াড় হিসেবে দেশে বিদেশে তাঁদের কোন কৃত্যের খবরই কোনদিন আমি শুনিনি। যদি কেউ আমার বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন তাঁদের কাছে আমি ওই দুজনের কৃতিত্ব খেলার বিবরণ জানতে চাইব।

সারভাতে ইনিংসের মাঝামাঝি পর্যায়ের ব্যাটসম্যান, তাঁকে ইনিংস সূচনার দায়িত্ব চাপিয়ে তাঁর প্রতি অন্যায় করা হয়েছিল। নব দায়িত্ব পালনে সারভাতের বার বার ব্যর্থতা সত্ত্বেও আমার চিন্তা করেনি বোর্ড, বিশেষ করে সংবাদপত্রগুলি বারবার প্রশ্ন করেছে মুশতাক যখন যেতে রাজি ইনিংস সূচনার দুর্বলতা কাটাতে তাঁকে পাঠানো হচ্ছেনা কেন; একথা মানতেই হবে ভারতীয় ক্রিকেটের স্বার্থ কোন হীন চক্রান্তের প্রভাবে উপেক্ষিত হচ্ছিল। নচেৎ দলের প্রয়োজনে জরুরী ব্যবস্থায় আমাকে না পাঠানোর কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। দলের শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনে পরে খেলোয়াড়

পাঠানোর নজীর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ঝুড়ি ঝুড়ি আছে, ভারতীয় ক্রিকেটেও তা দুর্লভ নয়।

কেবল ভারতের ক্রিকেট রসিকেরাই নয় অস্ট্রেলিয়ার মানুষও আমার খেলা দেখতে প্রভুত আগ্রহী ছিল। আমাদের দলের খেলোয়াড়দের মুখেই আমার অনুপস্থিতির জন্য অস্ট্রেলিয়ানদের নৈরাশ্যের সংবাদ আমি জেনেছি, কীথ মিলার নিজে আমাকে জানিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিশিষ্ট ক্রিকেট লেখক ও সমালোচক রে রবিনসন আমাকে লিখেছেন যে, অস্ট্রেলিয়ান জনতা যে আমার খেলা দেখতে পায়নি, সে দুঃখ এখনো সে দেশে অনেকেই পোষণ করেন। অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে আমার অতরঙ্গ কেউ কেউ আমার কাছে রহস্য ফাঁক করে দিয়েছেন। সেখানে যখন সবাই আশা করে রয়েছে যে বিলম্বে হলেও আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে, গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী দুই ভদ্রলোক চেষ্টা করেছেন আমি যাতে ক্রিকেট খেলার উদ্দেশ্যে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে কোনমতে পা দিতে না পারি। শেষ পর্যন্ত তাঁদেরই ইচ্ছা পূরণ হয়েছে, সার্থক হয়েছে তাঁদের চেষ্টা।

অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে আমাকে সরিয়ে রাখার হীন চক্রান্তই আমার প্রতি অবিচারের শেষ কথা নয়। সংবাদ পত্রে বিবৃতি দিয়ে অস্ট্রেলিয়াগামী দল থেকে আমার সরে যাওয়ার কারণ আমি জনসাধারণকে জানিয়েছিলাম। সেই অপরাধে অভিযুক্ত করেও কৈফিয়ৎ তলব করে ক্রিকেট বোর্ড আমাকে বম্বেতে ডেকে পাঠালো। হোলকার ক্রিকেট অ্যাশেসিয়েশন সদয় হয়ে ইন্দোরের একজন প্রধান অ্যাডভোকেট মিঃ মোতিলালকে আমার সঙ্গে বম্বে পাঠায়। বোর্ডের অধিবেশনে আমার সংবাদপত্র বিবৃতিটি পাঠ করা হল। বিবৃতির ভাষা যদি রূঢ় মনে হয় থাকে তার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টির উপর যবনিকা ফেলে দেওয়া হল। বিষয়টি সভায় আলোচনা সূচী থেকে বাতিল হয়ে গেল, ও বিষয়ে কেউ কোন কথা বলার সুযোগই পেল না তবে বুঝলাম আমার ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে, ভয়ও পেলাম, আমার ভবিষ্যৎ বোধ হয় অন্ধকার। সত্যিই তাই হল, টেষ্ট ক্রিকেটার হিসেবে সেই থেকে আমি বাদের দলে পড়ে গেলাম।

চব্বিশ

কলকাতার মানুষের মুখ চেয়ে

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের যুগে এমন কি তার ও বহু আগে থেকে ক্রিকেট বলতে আমরা ইংল্যাণ্ডে অস্ট্রেলিয়ায় খেলার কথাই বুঝতাম। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দুনিয়ার জাতিগুলির ভারসাম্য ওলটপালট হয়ে গেল, যার ফলে শেতাঙ্গদের নিজস্ব খেলা ক্রিকেটে কৃষ্ণাঙ্গ প্রাধাণ্যের সূচনা দেখা গেল। আমরা কালা ব্রাডম্যান জর্জ হীডলের কথা আগেই শুনেছি। তাঁর সম্পর্কে নেভিল কার্ডাস বলেছেন যে সব রকম উইকেটে খেলার দক্ষতা বিচার করে দেখলে হীডলেকেই বোধ হয় সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান বলে স্বীকার করে নিতে হয়, আসল ব্র্যাডম্যানেরও ওপরে। তাছাড়া ওরেল ও ওয়ালকট মিলে অসমাপ্ত চতুর্থ জুড়িতে ৫৭৪ করে যে রেকর্ড স্থাপন করেছেন, তা অনেকদিন যাবৎ যে কোন জুড়িতে সর্বোচ্চ রানের দুনিয়ার রেকর্ড হিসেবে অটুট থেকেছে।

যখন জানা গেল যে মহাযুদ্ধের পর সর্বপ্রথম যে বিদেশী ক্রিকেট দলটি ভারত সফরে আসছে সে দলটি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং সে দলে হীডলে, উইকস ও ওয়ালকট থাকছেন, ওরেল-এর থাকার সম্ভাবনাও আছে, তখন সর্বত্র প্রবল উৎসাহ জাগলো।

যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল সত্যি ভারতে হীডলের তখন সে খেলা আর নেই এবং তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য। আর ওরেল এলেনই না। কিন্তু যে এভার্টণ উইকস-এর খ্যাতি সবচেয়ে কম তিনি এমন খেলা খেললেন যেমনটি কোন বিদেশী কখনো এদেশের মাটিতে খেলেননি। আর ওয়ালকটও তাঁর বেধড়ক মারের সুনাম রক্ষা করলেন। খুবই দুঃখের কথা যে বর্ণবৈষম্যের ফলে দলের অধিনায়ক রূপে এসেছিলেন শ্বেতাঙ্গ জন গর্ডার্ড। সমগ্রদলে বর্ণবৈষম্যমূলক শ্বেতাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গী। রঞ্জিট্রফি চ্যাম্পিয়ান দলের সঙ্গে ইন্দোরে ওদের খেলায় আমি প্রথম ওদের মুখোমুখী হই এবং দলের মধ্যে বৈষম্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই, জর্জ-হীডলেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটকে সর্বপ্রথম দুনিয়া জোড়া মর্যাদা দিয়েছেন

এবং দলের মধ্যে প্রবীনতম খেলোয়াড়। এমন ব্যক্তিটিকে দলের ফোটো তোলার সময় বসবার কোন আসন না দিয়ে এক পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। অথচ স্থায়বিচার হলে তাঁরই দলের অধিনায়ক হওয়ার কথা।

দলের মধ্যে সবচেয়ে সূক্ষ্মসৌন্দর্যসম্পন্ন ব্যাটিং ষ্টেলমেয়ারের। সমগ্র দলটির খেলা উজ্জ্বল প্রাণবত্তায় ভরা, জোরালো মার, প্রাণোচ্ছল খেলা, যেমনটি আমরা আগে কখনো দেখিনি। তাছাড়া সবাই খোশমেজাজী খেলোয়াড়। কিছুটা খেয়ালীও বটে। ঘাসের উইকেটেও পাটের ম্যাটিং-এ অভ্যস্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ইন্দোরের নারকেল ছোবড়ার ম্যাটিং-এ খেলে ১৮৯ রানে নেমে গেল। হীরালাল গায়কোয়াড় ৬৬ রানে ছটি উইকেট নিলেন, তা সত্ত্বেও কিন্তু দশ উইকেটে জিতে গেল ওরা। আমাদের দু ইনিংসই সামান্য রানে শেষ হতে জয়লাভের জন্য প্রয়োজনীয় ১০৯ রান ওরা কোন উইকেট না হারিয়েই তুলে ফেললো। তবে উইকস বা ওয়ালকট কেউই না খেলাতে ইন্দোরের লোক অত্যন্ত নিরাশ হল। হীডলে তিন নম্বর হিসেবে ব্যাট করে হীরালালের বলে ফাইন লেগে আমার হাতে ধরা পড়লেন, রান করলেন মাত্র এক। খেলার পর আমি হীডলের সঙ্গে আলাপ করলাম, তাঁকে জানালাম বাল্যকাল থেকে খেলোয়াড় হিসেবে কী সম্মান পোষণ করেছি তাঁর সম্পর্কে। বললাম, খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠ দিনগুলি গত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সাক্ষাৎ লাভের, তাঁর খেলা দেখার ও তাঁর সঙ্গে একই ম্যাচে খেলবার সুযোগ পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। "আমার দুঃখ তাতেই", ম্লান হেসে জবাব করলেন হীডলে, "যখন সত্যি খেলতে পারতাম তখন ভারতে আসার সুযোগ পাইনি।" তিনি অধিনায়ক না হওয়াতে আমি যে বেদনাবোধ করেছি, সে প্রসঙ্গ তুললাম। "যা হয়েছে তা হয়েছে," মন্তব্য করে বললেন, "দেখ ওই আলোচনায় আমাদের দুঃখই বাড়বে, তার চেয়ে মনের আনন্দে ভারতবর্ষ বেড়িয়ে যাওয়াই ভালো নয় কি?" তাঁর কথার সুরে অবস্থাকে মেনে নেবার নিরুপায় মানসিকতা।

ভারতের রাজধানী দিল্লীতে প্রথম টেস্ট এবং ওখানে সর্বপ্রথম টেষ্ট খেলার আয়োজন। সে খেলার ভারতীয় দলে আমার নাম না দেখে মনে বড় আঘাত পেলাম। রঞ্জি ট্রফিতে সে বছর আমি খুব ভালো খেলেছি, উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে ২৩৫ রান সমেত গড়ে রান করেছি ৮১·০০। তবু ঈর্ষা ও ষড়যন্ত্রের বলি হলাম। ঘরে বসে খবরের কাগজ মারফত জানলাম

দুপক্ষেই প্রচুর রান তুলেছে, পাঁচটি সেঞ্চুরি হয়েছে, তবে খেলায় কোন মীমাংসা হয়নি।

দ্বিতীয় টেস্টেও আমি বাদ। কেন বাদ পড়ছি এ নিয়ে মন খারাপ ও জল্পনা কল্পনা করার মনোভাব কাটিয়ে উঠেছি এতদিনে। স্বাস্থ্যের জন্য মার্চেন্ট অধিনায়ক পদ প্রত্যাখান করেছেন, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন অমরনাথ। দল নির্বাচনে তাঁর মতামতের দাম অনেকখানি। আমার মনে হল অমরনাথ আমার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। তবে আজও আমার দৃঢ়বিশ্বাস মার্চেন্ট অধিনায়ক হলে তিনি হয়তো অন্যভাবে ভাবতেন।

আর এক বিস্ময়। সকালবেলা খবরের কাগজ খুলে দেখি কলকাতা টেষ্টের জন্য আমাকে নির্বাচন করা হয়েছে। এর পর বোর্ডের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণও পেলাম। আবার টেস্ট ম্যাচ খেলবো ভাবতেও আনন্দে মন ভরে গেল এবং সে খেলাও ছবির মত সুন্দর ইডেন গার্ডেন মাঠে। তবে কি কলকাতার জনমতকে উপেক্ষা করতে সাহস পায়নি নির্বাচন সমিতি?

কলকাতার গভর্ণরের একাদশের বিরুদ্ধে প্রথম প্রমাণ পাওয়া গেল যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ব্যাটম্যাসনেরা আমাদের বোলারদের অজেয় নন। এন চৌধুরীর মিডিয়াম পেস অফ ব্রেক বল ও এস কে গিরিধারীর ধীরগতি অফ-স্পিন বলে ওরা মাত্র ২৫৫ রানে আউট হয়ে গেল। ইনিংস সূচনা করে আমি দ্রুত ৩৪ রান করলাম। এর পর বাঙলার তরুণ ব্যাটসম্যান পঙ্কজ রায় ও গিরিধারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সমগ্র আক্রমণ ব্যাহত করে ১৭২ রান যোগ করলেন। ফলে বাঙলা দল প্রথম ইনিংসে এগিয়ে গেল। ধীরগতি খেলাটি অসমাপ্ত ভাবেই শেষ হল; কিন্তু এই খেলাটি পংকজ রায়ের জন্য বৃহত্তর ক্ষেত্রেরদ্বার খুলে দিল, কারণ বিশেষ করে অনবদ্য অফ-ড্রাইভের সাহায্যে ১০১ রান তুলে তিনি ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি উদ্ভাসিত করলেন। সে প্রতিশ্রুতি তিনি পূর্ণ করেছেন ভারতের অবিসংবাদী ইনিংস সূচনাকারী ব্যাটসম্যান হিসাবে, মানকড়ের সঙ্গে একযোগে ৪১৩ করে দুনিয়ার ক্রিকেটে প্রথম জুড়ির নতুন রেকর্ড করেছেন।

কলকাতা টেষ্টে অজস্র উত্তেজনাকর পরিস্থিতি ঘটেছে, দুপক্ষই প্রচুর সুবিধা পেয়েছে, কিন্তু কোন পক্ষই তার পূর্ণ সুযোগ নিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত নিষ্প্রাণ পরিবেশে খেলা শেষ হল অমীমাংসিত ভাবে। বিশেষ ঘটনা যা ঘটলো, তা হল, পর পর দু ইনিংসে শত রান করে উইকস-এর উপর্যুপরি চারটি

টেষ্ট ইনিংসে সেঞ্চুরী করার দুর্লভ কৃতিত্ব অর্জন। ভারতে চার ইনিংস খেলে চারটি সেঞ্চুরি করার ঠিক আগে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ওভালের খেলাতেই তিনি শেষ ইনিংস সেঞ্চুরী করে এসেছেন। পর পর পাঁচ টেষ্ট ইনিংসেই সেঞ্চুরী ইতিপূর্বে আর কেউ কখনো করতে পারেন নি। কলকাতা টেষ্টে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরীতে যে সব বিচিত্র ভঙ্গীর মার তিনি দেখালেন তেমনটি কখনো দেখিনি। তাঁর মারে যেমন ছন্দ মাধুর্য ও সৌন্দর্য তেমনি দীপ্তি ও তীব্রগতি ; তাঁকে আউট করার এতটুকু সুযোগ কেউ পায়নি। অধিনায়ক অমরনাথ কবুল করেন যে অষ্ট্রেলিয়ায় ব্র্যাডম্যানকে নিয়ে যে সমস্যায় তাঁকে পড়তে হয়েছিল, কলকাতার প্রথম ইনিংসে উইকসকে নিয়েও সেই একই সমস্যায় পড়তে হয়েছে।

ছোটখাটো ও শক্ত বাঁধুনির চেহারা, কোন বোলিংই তাঁকে কখনো বিব্রত করতে পারেনি, নির্মমভাবে পিটিয়েছেন সবাইকে, অর্ধেক ব্যাট ও অর্ধেক ড্রাইভের অনবদ্য সংমিশ্রন, যেমন সঠিক টাইমিং, তেমনি জোর সে মারের, অথচ প্রত্যেকটি মার বিচিত্র রূপময়।

তবে একথা আমি বলবো যে কলকাতায় উইকসের দ্বিতীয় সেঞ্চুরীটি মুখ্য ছিল অতিথিপরায়ণ ভারতীয়দের দান, ভারতীয় দলের সহস্র ছিদ্র ফিল্ডিং-এর ফলেই তা সম্ভব হয়েছিল।

এই খেলায় আমি নির্বাচকদের অবহেলার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পেরেছিলাম। প্রথম ইনিংসে ইব্রাহিমের সঙ্গে ইনিংস সূচনা করে আমি বিদ্যুৎ গতিতে ৫৪ রান করার পর জনৈক বন্ধু সাজঘরে নির্বাচকদের এক জনকে আমার প্রসঙ্গে সপ্রশংস মন্তব্য করলে নির্বাচক মহোদয় মুখ বেঁকিয়ে আমার খেলা নস্যাৎ করেন, বলেন ফাঁকতালে হয়ে গেছে। কথাটা কানে যেতেই বুঝলাম হাওয়া কোন দিকে বইছে, তাই তখনি সংকল্প করলাম পরের ইনিংসে মন দিয়ে খেলবো।

এমনিতেই আমার প্রথম ইনিংসের খেলা দেখে জনগণ উদ্বেল, নির্বাচক সমিতিকে দুয়ো দিচ্ছে। দ্বিতীয় ইনিংসে আমার ভাগ্য আরো সুপ্রসন্ন হল। ৪১৫ মিনিটে ৪৩১ রান করতে হবে ভারতকে। দ্রুত রান তোলার প্রয়াস করতে লাগলাম শুরু থেকেই, কিন্তু ইব্রাহিমের সাবধানী খেলার ফলে অনেক সময় নষ্ট করে সেদিনকার ১১০ মিনিটের খেলায় আমাদের উঠলো মাত্র ৬৬ রান।

পঞ্চম দিনে ৩৩০ মিনিটে ৩৬১ রান তোলার দায়িত্ব নিয়ে মাঠে নামলাম। ইব্রাহিম অল্প পরেই আউট হয়ে গেলে আমি শত রান পূর্ণ করলাম, কিন্তু মারের নেশায় ও ঘড়ির সঙ্গে রান তোলার প্রতিযোগিতার তাগিদে ভুলে গেলাম প্রতিজ্ঞা। শত রানের পরে মাত্র ছয় রান যোগ করেছি, এমন সময় অ্যাটকিনসনের একটা সোজা বল ঘোরাতে গিয়ে এল বি হয়ে গেলাম। তবু প্যাভিলিয়ানে ফিরবার সময় অভূতপূর্ব অভিনন্দন পেলাম। সেই রাত্রেই বোর্ড অব কণ্ট্রোলের ভোজ সভায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পেস বোলার প্রায়র জোনস বললেন, "মুশতাখের বিরুদ্ধে কোথায় যে বল ফেলবো বুঝে উঠতে পারিনি, মুশতাখ যদি আমার দেশে যান লোকে তাঁকে দেবতার মত পূজা করবে।" আমার ওই খেলায় বোলারদের দুর্দশা বর্ণনা করেছেন ক্রিকেট সাংবাদিকতার গুরু গুরুনাথন। ইণ্ডিয়ান ক্রিকেট গ্রন্থে তিনি লিখলেন: মুশতাখ সব সময়েই ডান পা উইকেটের সামনে রেখে শুরু করেন এবং সেই সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থান থেকে বলটি খুব ভাল করে দেখে নেন। অনুরূপ কথা হবস সম্পর্কে বলেছিলেন কনস্টাণ্টাইন। বলটি যদি উইকেট থেকে বেশ আগে পড়ে বাঁ পাটা একটু সামনে এগিয়ে দিয়ে ধীরভাবে বলটিকে ব্যাটে নেন। আর বলটির লেংথ যদি ভালো হয় ঠিক অমনি চকিতে পিছিয়ে গিয়ে খেলেন। দেখেই বোঝা যায় যে, মুশতাখ যখন মহান জ্যাক হবসের সঙ্গে ১৯৩১ সালে বেশ কিছুদিন একই দলে খেলেছিলেন, সে সুযোগের অপচয় করেননি তিনি। খুব গম্ভীরভাবে সেই ক্রিকেট মহারথীর খেলা নিরীক্ষণ করেছেন।" এর সঙ্গে গুরুনাথন আরো মন্তব্য করেছেন, "মুশতাখের দুষ্টুমিটুকু কিন্তু তাঁর নিজস্ব। তিনি ক্রিকেটের দামাল ছেলে।"

কলকাতা টেষ্টের ইতিবৃত্ত শেষ করার আগে বাঙলার বোলার মণ্টু ব্যানার্জী সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। তাঁর টেষ্ট জীবনের একেবারে প্রথম ওভারেই অ্যাটকিনসনের অফ-স্টাম্প উড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং তারপর একটি বিলম্বিত ইন সুইঙ্গার দিয়ে রে-কে এল বি ডবলু করেছিলেন (২৩ রানে ২ উইকেট)। তৃতীয় উইকেটে ওয়ালকট আউট হলেন (১০৯ রানে ৩ উইঃ) তাও শর্ট লেগে ব্যানার্জীর ক্যাচ, গোলাম আহমেদের বলে। দ্বিতীয় ইনিংসও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম জুড়ি ভাঙবার কৃতিত্ব ব্যানার্জীর। দলের ১৩ রানের মাথায় ক্যারুকে বোল্ড করেন তিনি। খুবই বিস্ময়ের কথা মণ্টু ব্যানার্জী এর পর আর টেষ্ট দলে নির্বাচিত হননি। অবশ্য আমাদের টেষ্ট নির্বাচকদের খেয়াল

খুশির ফলে এত অসম্ভব ঘটনা ঘটেছে যে তার মধ্যে বিস্ময়ের কোন অবকাশ নেই।

তবে সুখের কথা পরবর্তী দুটি টেষ্টে আমাকে ওরা বাদ দেয়নি। মাদ্রাজের চতুর্থ টেষ্টে ওদের রে ও স্টোলমেয়ার ২৩৯ রান করে অমরনাথের মন নৈরাশ্যে ভরে দেয়, সেই অবস্থায় মস্ত ভুল করে বসেন অধিনায়ক। মিডিয়াম ফাস্ট সুইং বোলার ফাদকারকে তিনি বাম্পার ছাড়ার নির্দেশ দেন। স্বভাবতই সেই বাম্পারগুলির গতি ছিল মন্থর। যার ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাটসম্যানেরা পিটিয়ে লাশ করে দেয়। অমরনাথের ওই ভুলের মাশুল অন্যভাবেও দিতে হয়েছিল। ওদের সুযোগ যখন এল গডার্ড বদলা নিচ্ছেন, তাঁর দুই ফাস্ট বোলার ট্রিম ও জোনসকে বাম্পার দেবার নির্দেশ ছাড়লেন আর সেই সঙ্গে লেগের দিকে একজন অতিরিক্ত লোক রাখলেন। ট্রিম ও জোনস দুজনেই চীপক উইকেটে গতি সঞ্চারে সমর্থ হলেন। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে খেলা বন্ধ থাকায় এক দিনের বিশ্রাম পেয়েছিলেন ওঁরা, যার ফলে দ্বিগুণ তেজে বল করে আমাদের ইনিংস পরাজয় ঘটাতে পেরেছিলেন। রেগেকে সঙ্গে নিয়ে প্রথম জুড়িতে আমি ৪১ রান ওঠাই। দ্বিতীয় ইনিংসে অবস্থা আরো খারাপ। রেগে ও মোদি সাত রান হতেই ফেরত গেলেন, আমি ২৯ রান পর্যন্ত টিকে রইলাম।

বম্বের শেষ টেষ্ট প্রসঙ্গে আমি বলতে বাধ্য যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলপতি গডার্ড ভারতের সঙ্গে ন্যায় সম্মত ক্রিকেট খেলেন নি। ভারতের জয়ের সম্ভাবনা তিনি অকারণ বিলম্ব করে করে নষ্ট করে দিয়েছিলেন। দুটি ম্যাচ জিতে রাবার পেতে গিয়ে হারবার ঝুঁকি নিতে চাননি তিনি যার ফলে রাবার সমান সমান হয়ে যাবার কথা। একটি জয়ের রাবার তখন হাতের পাখী তাকে বাঁচিয়েই তিনি খুশী। দুটি জয়ের অনিশ্চয়তার পিছনে ছুটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক হিসেবে গডার্ডের উত্তরাধিকারী ফ্রাঙ্ক ওরেলের ক্রিকেট নীতির সঙ্গে গডার্ডের কূটনীতির পার্থক্য প্রকট। এই সিরিজের খেলায় ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামের মত রান ভরা উইকেটে কোন শতরান হয়নি। মাদ্রাজে উইকস মাত্র দশ রানের জন্য ষষ্ঠ সেঞ্চুরীতে বঞ্চিত হয়েছিলেন। বম্বেতে তিনি করলেন ৫৬, মাত্র ২৮৬ রানে ইনিংস শেষ হল। ইব্রাহিমের সঙ্গে ইনিংস সূচনা করে আমি দ্বিতীয় উইকেট পড়ি ৩৭ রানে নিজস্ব ২৮ রান করে। আমাদের ইনিংস ৮৩ রানে শেষ হয়। ওদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে যায়

২৬৭ রানে। অগত্যা টেষ্ট খেলার বিলম্বিত মর্যাদা লাভ করে শুঁটে ব্যানার্জী শেষ চারটি উইকেট অল্প সময়ে নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। আর অমরনাথের বোলিং-এ ভারত বঞ্চিত হয়। আহত পি, কেনে বদলে তাঁকে উইকেট কীপিং করতে হয়েছিল।

৩৯৫ মিনিট সময় হাতে আছে, জিততে হলে ওই সময়ে ভারতকে ৩৬২ রান করতে হয়, কাজেই শুরু থেকে রানের পিছু দ্রুত ধাওয়া করলাম আমরা। চতুর্থ দিনের শেষে তিন উইকেটে ৯০, শেষ দিনে ২৭১ তোলার দায়িত্ব। চা-পানের সময় ছ'উইকেটে ২৮৯, তারপরও রান তোলায় ঢিলে পড়েনি। ব্যানার্জী ও অধিকারী বেশিক্ষণ খেলেন নি। যখন গোলাম আহমেদ ফাদকরের সঙ্গে যোগ দিলেন, তখন ৪০ রান বাকি এবং উত্তেজনা চরমে উঠেছে, এই জুড়িই শেষ, কারণ একমাত্র অবশিষ্ট ব্যাটসম্যান কেন, তিনি আহত। গর্ডাড তাঁর ঢিলেমি বাড়িয়ে দিলেন। উইকেট কীপার ওয়ালকটকে দেখলাম ধীরে পায়ে ফাইন লেগ বাউণ্ডারি থেকে বল কুড়িয়ে এনে বোলারকে দিচ্ছেন। বম্বের জনতা যে গর্ডাড ও তার দলের খেলোয়াড়দের টিটকারি ও ধিক্কার দিচ্ছিল, তাতে আমি কোন অন্যায় দেখিনি আমি। কিন্তু গডার্ড ধীর স্থির ঠাণ্ডা মাথায় খুন করবার সিদ্ধান্তে অটল, ভারতের সম্ভাবিত জয়কে হত্যা করবেনই তিনি।

দর্শকাসন ও মাঠের মধ্যেকার উত্তেজনাকর পরিবেশ অসহনীয় হয়ে উঠেছিল, নইলে ওভারের একটি বল দেড় মিনিট সময় বাকি থাকতেই আম্পায়ার স্টাম্পগুলি তুলে নিলেন কেন? আবেগ ও উত্তেজনার আতিশয্যেই তিনি ওই কাণ্ড করেছিলেন। আইনত ত্রুটি এবং বাস্তবে একটি উইকেট তখনো অক্ষত আর জয়ের জন্য প্রয়োজন মাত্র ছ'রান। গডার্ডের ক্রিকেট নীতি-বিগর্হিত কূটকৌশল সত্ত্বেও ভারতের জয়লাভ ঘটাতেই যদি অন্যমনস্ক বশত আম্পায়ার উইকেট না তুলে নিতেন। আমরা সকলেই অন্তরে আঘাত পেয়ে মন মরা হয়ে গেলাম। কিন্তু মেনে ও মানিয়ে নিতেই হল, কারণ অঘটন ও ক্রিকেটের অঙ্গ এবং জীবনেরও।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের মধ্যে আমার মনে বিশেষভাবে ছাপ রেখে গেছেন ক্লাইভ ওয়ালকট, তেইশ বছরের বিরাটবপু যুবক দিলাওয়ারের মত উঁচু হয়ে উইকেট রক্ষার ভঙ্গি, আর ব্যাটসম্যান হিসেবে দুর্দান্ত, বিশেষ করে ভালো শক্ত উইকেটে। মূলত পিছনের পায়ে ভর দিয়ে তাঁর খেলা, মারগুলি পিস্তলের

গোলার মত তীব্র ও দ্রুতগামী। সদাহাস্য মুখ ওয়ালকট জনতার প্রিয় ছিলেন সর্বত্র। তাঁর স্কোয়ার কাটগুলি ছিল অপূর্ব, আর উইকেটের সামনে-কার শটগুলি মারতেন পরম নির্ভরতায়। সুদর্শন ও এথলীটের মতন দেহগঠন সম্পন্ন ষ্টেলমেয়ারের ব্যাটিং ছিল যেন চারুকলা, মাধুর্য ও সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। তাঁর মারে অজস্র বৈচিত্র্য। বস্তুত তাঁর মত ওপেনিং ব্যাটসম্যান আমি আর দেখিনি।

গেরি গোমেজ কড়া খেলোয়াড়, সব কাজের কাজী। আর গডার্ড ছিলেন কট্টর অধিনায়ক এবং খেলোয়াড় হিসেবেও তাই। ট্রিম ও জোনস দুজন পেস বোলার আর ফার্গুসন গুগলি বোলার। সব নিয়ে ওদের আক্রমণে বৈচিত্র্যের অভাব ছিল না।

মাত্র এক ম্যাচে ওদের কাছে রাবার হারানো ভারতের পক্ষে কোন কলঙ্ক নয়। তবু লালা অমরনাথের দুর্ভাগ্য, পাঁচটি টেষ্টের একটিতেও তিনি টসে জিততে পারেননি, টসে জেতার গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ অনবদ্য উইকেটে প্রথম ব্যাটিং করতে পারলে ক্রিকেটে প্রায়শই বেশ কিছুটা সুবিধা পাওয়া যায়। আর একটি কারণে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল দুনিয়াময় সার্থকতা অর্জন করে-ছিল, সব অবস্থাতেই ওরা দীপ্ত ক্রিকেট খেলেছে।

পঁচিশ

কমনওয়েলথ দল

এম সি সি ১৯৪৯-৫০ মরশুমে ভারত সফর করার কথা ছিল, কিন্তু সে সফর বাতিল হল। এই অবস্থায় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড ইংল্যাণ্ডের অষ্ট্রেলিয়া ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ থেকে সংগৃহীত একটি দলের সফর দিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা করে ভারতে বিদেশী দলের ধারারক্ষার প্রয়াস হল।

দলের অধিনায়ক হলেন অস্ট্রেলিয়ার লিভিংস্টোন, ম্যানেজার ইংল্যাণ্ডের জর্জ ডাকোয়ার্থ। দু'জনেই উইকেটকীপার, যুদ্ধোত্তর যুগের ক্রিকেটে সারা দুনিয়ার সবচেয়ে আলোচিত খেলোয়াড় ফ্র্যাঙ্ক ওরেল হলেন সে দলে ওয়েষ্ট

ইণ্ডিজের প্রতিনিধি। প্রাক্তন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নব নামকরণ অনুযায়ী সফরকারী দলটিকে বলা হল কমনওয়েলথ টীম।

শক্তিমান চৌকষ খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত ওই দলে ব্যাটিং ও বোলিং-এ সুসম ভারসাম্য ছিল। দলের প্রধান আকর্ষণ ফ্র্যাঙ্ক ওরেল সদাহাস্যময়। প্রীতি মধুর ব্যক্তিত্ব তাঁর, দীর্ঘ, ঋজু অথচ সবল দেহের অধিকারী। তখনই তিনি সারা দুনিয়ার অন্যতম দর্শনীয় ব্যাটসম্যান রূপে খ্যাত। আমি নিজে ওরেলের সাক্ষাৎ পাবার জন্য ব্যগ্র ছিলাম, এবং সে সাক্ষাৎ যখন ঘটলো আমি স্থির বুঝলাম যে তাঁর সম্পর্কিত প্রশস্তি রচনায় কোন অতিশয়োক্তি ছিলনা। সত্যিই তিনি এক মহান চৌকষ খেলোয়াড়, ব্যক্তিত্বে ও কৃতিত্বে এক প্রতিষ্ঠান বিশেষ, তার অনুসরণে চললে যে কোন ক্রিকেটার উপকৃত হবেন, আর অনুকরণ কখনো সম্ভব নয়।

অপর এক আকর্ষণীয় খেলোয়াড় ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার জর্জ ট্রাইব, বাঁহাতের গুগলি বোলার ও দর্শনীয় ব্যাটসম্যান। আরো ছিলেন মিসিল পেপার, অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস দলের সঙ্গে যিনি ভারত সফর করে গেছেন। আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি যে পেপারের মত কূটবুদ্ধি সম্পন্ন বোলার আমি দেখিনি। ডানহাতের লেগ-ব্রেক ও গুগলি বল ছাড়া তিনি মাঝে মাঝে মোক্ষম অস্ত্র 'ফ্লিপার' ছাড়তে সুপটু ছিলেন, প্রতিটি বলে কোনো না কোনো নতুন কায়দার জন্য তৈরি থাকতে হত ব্যাটসম্যানকে। দুটি বল তিনি এক ধরণের ছাড়তেন না। শুরু হয়তো করলেন গুগলি দিয়ে, পরেরটি ঠেকানো বল, তার পরেরটা টপস্পিন, তারও পরে লেগ ব্রেক, পেপারের বিরুদ্ধে খেলতে ব্যাটসম্যানকে সবসময় অপ্রত্যাশিত ধরনের বল প্রতিরোধের জন্য তৈরি থাকতে হত। ব্যাটসম্যান হিসেবেও তিনি কোনমতে কমতি ছিলেন না। কিন্তু তিনি কিছুটা খামখেয়ালি ও দুর্বোধ্য চরিত্রের মানুষ ছিলেন। কর্তৃপক্ষের বিরক্তি উৎপাদন করে শেষ পর্যন্ত তিনি টেষ্ট ক্রিকেট থেকে বাদ পড়ে যান, অবশ্য তাতে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের ক্ষতি হয়।

কমনওয়েলথ দল আনার ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, উচুস্তরের একদল পেশাদার খেলোয়াড়ের ভারত সফরে দেশে ক্রিকেট সম্পর্কিত উৎসাহ অক্ষুন্ন ছিল এবং আমাদের তরুণ খেলোয়াড়েরা তাদের দেখে ও তাদের বিরুদ্ধে খেলে উপকৃত হয়েছিল। তবে নিখিলভারত দলের সঙ্গে কমনওয়েলথ বেসরকারী টেষ্টম্যাচ বলে অভিহিত করা আমি কোনমতেই অনুমোদন করতে পারিনি।

টেষ্ট ম্যাচ নামকরণ একমাত্র তুটি দেশের জাতীয় দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত খেলাকেই দেওয়া যেতে পারে তা সরকারী-বেসরকারী যাই হোকনা কেন। একদিকে জাতীয় দল অপরদিকে বহুজাতির সমন্বয়ে গঠিত দল, এমন খেলাকে টেষ্ট ম্যাচ বলা ভাষা ও সংজ্ঞার অপব্যবহার। সবচেয়ে তুঃখের কথা যে ব্রিটিশ সাংবাদিকতার পদাঙ্কানুসারী প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় সংবাদ পত্র ওই খেলাকে সরাসরি 'টেষ্ট ম্যাচ' বলে ঘোষণা করেছে। টেষ্ট শব্দটির তুপাশে বেসরকারী নির্দেশক কোটেশান চিহ্নটি পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়নি। এই সব খেলায় ভারতীয় দলের সদস্যদের ভারতীয় টেষ্ট দলের প্রতীক চিহ্নগুলি দেওয়া উচিত হয়নি। ঐতিহ্য সূত্রে 'টেষ্ট ম্যাচ' সংজ্ঞাটির যে মর্যাদা তা নষ্ট করা যারপর-নাই অন্যায়। যারা টেষ্ট খেললো আর যারা অপসংজ্ঞা যুক্ত টেষ্ট খেললো তুই জাতীয় খেলোয়াড়দের একাকার করে দেওয়ায় প্রকৃত 'টেষ্ট' খেলো-য়াড়ের মর্যাদা হানি ঘটে। তাছাড়া ভারতীয় টেষ্ট দলের প্রতীক চিহ্নগুলির অপব্যবহারও ঘটেছে। বিদেশীদের তা দেওয়া হয়েছে এবং গুজব বলে যে তার জন্য মূল্য নেওয়া হয়েছে। একেবারে অজ্ঞাত ব্যক্তিকে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ব্লেজার পরে বেড়াতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। অন্য দেশে জাতীয় ক্রিকেটের প্রতীকী পোশাকের অব্যবহার খুব সচেষ্টভাবে নিরোধ করা হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতীয়দের অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় জনৈক অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় সৌহার্দ্য সূত্রে রঙ্গনেকারের সঙ্গে জাতীয় প্রতীকচিহ্ন যুক্ত ক্রিকেটের টুপি বদল করেছিলেন। তারপর রঙ্গনেকার যখন অস্ট্রেলিয়ার টুপি পরে মাঠে নামেন এমন প্রতিবাদ ওঠে যে তাঁকে সেই টুপি খুলে ফেলতে হয়।

কমনওয়েলথ দলের সর্বভারতীয় খেলাগুলিকে প্রদর্শনী খেলা বলেই চিহ্নিত করাই সমীচিন হত এবং সেই খেলায় অংশ গ্রহণকারী ভারতীয়দের বিশেষ প্রতীকচিহ্ন যুক্ত পোশাক উপহার দেওয়া উচিত ছিল। সর্বভারতীয় দল যারই বিরুদ্ধ খেলুক না কেন সেটিই টেষ্ট খেলা, টেষ্ট সংজ্ঞাটির এই অপব্যবহার যারপরনাই শোচনীয়, আসল টেষ্ট ম্যাচের মহিমা তাতে ক্ষুণ্ণ হয়।

কমনওয়েলথ দলের সঙ্গে আমার প্রথম মোলাকাত ইন্দোরে অনুষ্ঠিত হোলকার দলের সঙ্গে তাদের খেলা উপলক্ষে। সি কে নাইডু টসে জিতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিলে ট্রাইব ও পেপারের মারাত্মক বোলিং-এ হোলকার দল মাত্র ৮৫ রানে আউট হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কমনওয়েলথ দল মাত্র এক উইকেটে জয়ী হয়।

আগের মরশুমে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে আমি সেঞ্চুরী করেছি, রঞ্জি ট্রফিতেও করেছি, তবু সর্বভারতীয় দলের সঙ্গে কমনওয়েলথ দলের প্রথম ও দ্বিতীয় খেলায় আমি বাদ পড়ে গেলাম। মজা এই যে কলকাতায় তথাকথিত তৃতীয় 'টেষ্টে' আবার আমি দলভুক্ত হলাম। কোন যুক্তিতে বাদ আর কোন যুক্তিতে দলভুক্ত দুইই দুর্জ্ঞেয় কারণ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খেলাটির মধ্যে এমন কিছু খেলা কোথাও দেখানোর সুযোগ আমি পাইনি। যার জোরে বাতিল আমি নির্বাচন পেতে পারি। তবে নির্বাচকেরা জানতেন অথবা তাঁদের ইঙ্গিত করা হয়ে থাকবে যে মুশতাখ দলে থাকলে কলকাতার মানুষ খেলাটিতে বেশি আকৃষ্ট হবে।

বন্ধুরা আমাকে উপদেশ দিয়েছিল আমি যেন 'ক্রিকেট নবাব'দের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাদ পড়ার কারণটা জেনে নিই। কিন্তু দড়ি ধরে উঠবার চেষ্টা আমার চরিত্র বিরুদ্ধ। এখন আমার অবস্থা 'মেলে সঙ্গী, না মেলে বালাই'। কারু কাছে কোনদিন মাথা নিচু করিনি, কারু অনুগ্রহও প্রার্থনা করিনি। নিজস্ব ক্রিকেট খেলার উপর ভর করেই চলতে চেয়েছি।

ভারতীয় দলের নির্বাচিত অধিনায়ক মার্চেন্ট দিল্লী ও বোম্বাই-এর প্রথম দুটি 'টেস্ট'-এর সময়েই ভগ্নস্বাস্থ্য। কলকাতায় তৃতীয় টেষ্টে একবারে শেষ সময়ে তিনি অক্ষমতা জানালেন। আশ্চর্য! মার্চেন্টের জায়গায় হাজারেকে দল পরিচালনার ভার দেওয়া হল, আর আমার দাবি হল সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। ভারতীয় দলের অধিনায়কতায় মার্চেন্ট ও অমরনাথের দাবি আমার চেয়ে বেশি, কারণ আমার চেয়ে একটি টেষ্ট আগে থেকে ওরা খেলছেন, কিন্তু সর্বভারতীয় ক্রিকেটে হাজারে এসেছেন আমার অনেক পরে। আমি হোলকার দলে অধিনায়কতা করিনি এমন প্রসঙ্গ তুললে হাজারের অধিনায়কতাও বাতিল হয়ে যায়। একথাও শুনেছি যে আমি নাকি দায়িত্বহীন খেলোয়াড়। শুধু খেলার আনন্দেই খেলি, দলপরিচালনার গুরুদায়িত্ব বহন করার মানসিকতা আমার নেই। কিন্তু ওঁরা কি করে ভুলে গিয়েছিলেন যে আমি যে বার সর্বপ্রথম অধিনায়কের পদ পাই সেবারেই আমি রঞ্জি ট্রফিতে আমার প্রথম শতরান করি। আত্মগরিমা প্রচারের অপযশ যদি হয়ও তবু উল্লেখ করবো যে ১৯৪৪ সালের পঞ্চদলীয় ফাইন্যাল মুসলিম দলের অধিনায়ক হিসেবে অপরিসীম শক্তিশালী হিন্দুদলের পরাজয়ে আমার সার্থকতা ছিল সর্বজন-স্বীকৃত।

ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ যে আমাকে নিঃশব্দে হত্যা করে হাজারেকে মার্চেন্টের বদলে অধিনায়কত্বের ভার দিলেন এর চেয়ে অন্যায় ও অবিচার কিছুই হতে পারে না। তবু খেলোয়াড় হিসেবে আমি ত্রুটি করিনি, দুইনিংসেই দলের শুভ ব্যাটিং-এ শুভ সূচনা করেছি (৭০ ও ৪৫)। হাজারের অধিনায়কোচিত ব্যাটিং আর ফাদকর, এন চৌধুরী ও সি এস নাইডু'র দুর্দান্ত বোলিং-এর জোরে ভারতীয় দল সাত উইকেটে জয়ী হয়। সি এস-কে সেদিনের মত এত ভালো বোলিং করতে কখনো দেখিনি, যে সংগ্রামী মনোভাব তিনি দেখিয়েছিলেন তা সি কে নাইডুর অনুজেরই যোগ্য। খেলার সঙ্গে 'টেষ্ট' আখ্যা জুড়ে দেওয়ার ফলে জনগন বিজয়োল্লাসে উজ্জল হয়ে উঠেছিল, যেন ভারত সত্যিই টেষ্ট ম্যাচ জিতেছে।

এর পর পূর্বাঞ্চলের হয়ে জামসেদপুরে আমি যাহোক খেললাম, কিন্তু তারপরই এল কানপুরে চতুর্থ 'টেষ্ট'। কানপুরকে টেষ্ট কেন্দ্রে উন্নীত করার জন্য ভিজি আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল যে ভারতে অনেক অঞ্চলেই ম্যাটিং উইকেটে খেলা হয়, অতএব অন্তত একটি 'টেষ্ট' ম্যাটিং-এই খেলা হওয়া উচিত। এই যুক্তির জোরে কানপুর টেষ্ট কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি পেল। অবশ্য সুকৌশলে কানপুরের টেষ্ট কেন্দ্রেও যথাসময়ে ঘাসের উইকেট তৈরি করা হয়েছে। একথা স্বীকার করতে হবে যে টেষ্টে খেলার ব্যাপারে মধ্য ভারতকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারত যথাক্রমে তিনটি ও দুটি খেলার অধিকার পায়, অথচ মধ্যভারতের প্রধান ক্রিকেট কেন্দ্র ও বৃহত্তম শহর হায়দ্রাবাদ উপেক্ষিত।

কানপুরে এর আগে কখনো আসিনি। গ্রীন পার্ক দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সেখানেই খেলা, আরো সুন্দর কমলা রিট্রিট, সেখানকার অনবদ্য পরিবেশে ও ব্যবস্থায় কমনওয়েলথ দলের অবস্থান।

গ্রীণ পার্কে প্রকৃতই সবুজের সমারোহ, চারপাশে দীর্ঘ মহীরূহ শ্রেণী দেহমনের ওপর স্নিগ্ধতার প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। আর কমলাপত সিংহানিয়ার কমলা রিট্রিট যন্ত্রনগরী কানপুর থেকে বেশ দূরে এক মরূদ্যান সদৃশ. সৌন্দর্য্যে ও সুব্যবস্থার পরাকাষ্ঠা সেখানে। তবু অন্য সব সৌন্দর্য ছাপিয়ে উঠেছিল ওরেলের খেলার সৌন্দর্য, কলকাতায় আমাদের নিরাশ করে কানপুরে তিনি পুষিয়ে দিলেন, তাছাড়া আমিও খেলোয়াড় হিসেবে কম আনন্দ পাইনি।

ইউ পি'র বহু দূর দূর কেন্দ্র থেকে লোক খেলা দেখতে ছুটে এসেছিল।

কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, মোরাদাবাদ, আগ্রা, আলিগড়, সর্বভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলা দেখার এই প্রথম সুযোগ পেয়ে কোথা থেকে না ছুটে এসেছে মানুষ। জানি শ্রম সার্থক হয়েছে তাদের। ওরেলের খেলা অতুলনীয়, সে খেলায় তিনিই সম্রাট, কোন বোলারকে মর্যাদা দেন নি তিনি। ম্যাটিং উইকেটে ভারতেরই শ্রেষ্ঠ বোলার হীরালাল গাইকোয়াড় ও গোলাম আহ্মেদ পর্যন্ত তাঁকে এতটুকু সংযত হয়ে খেলতে বাধ্য করতে পারেননি। এর সঙ্গে মনে রাখতে হবে ওরেল স্বয়ং ম্যাটিং উইকেটে খেলতে অভ্যস্ত ছিলেন না। বিদ্যুৎ ঝলকের মত সূক্ষ্ম অথচ দীপ্তিময় আর বিদ্যুতেরই মত শক্তি ও গতি তাঁর প্রতিটি মারে, দেখে নয়ন মুগ্ধ, মন উদ্দীপ্ত।

৪৪৮ রানে কমনওলেথ দলের ইনিংস শেষ হল, ২২৩ রান করে অপরাজিত রইলেন ওরেল, মনে হল ওদের জয়ের সম্ভাবনা প্রবল। যে সম্ভাবনাকে কার্যকরী করার পথ পরিষ্কার করে দিলে ওঁদের বোলাররা, মানকড়, মোদি ও হাজারেকে অল্পরানে আউট করে। এই অবস্থায় আমাকে মেরে খেলার সহজাত আবেগ দমন করতে হল। অবস্থা অনুযায়ী খেলাকে সংযত করে আমি দেখিয়ে দিলাম বেপরোয়া প্রদর্শনীর মনোভাব নিয়েই সবসময় খেলিনা আমি, অবস্থানুযায়ী দলের দায়িত্ব গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী খেলায়ও অক্ষম নই। জর্জ ডাকোয়ার্থ লিখলেন—কলকাতায় মুশতাখের খেলায় সে প্রতিশ্রুতি আমি পেয়েছিলাম, তার পরিপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করলাম ওই বিপদজনক খেলোয়াড়টিই প্রথম ইনিংসে ১২৯ রান করে আমাদের প্রত্যাশিত জয়লাভে বঞ্চিত করলেন।' আমাকে অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে ফাদকর, অধিকারী ও কিষেণ চাঁদের কাছ থেকে আমি সবিশেষ সহযোগিতা পেয়েছিলাম।

কানপুরে এই আমার প্রথম খেলা। তাতেই যখন সেঞ্চুরি করলাম বিরাট অভিনন্দন জানালো জনতা, পটকার পর পটকা ফাটলো, বিউগল বাজতে থাকলো দিকে দিকে, সেই সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে থেকে থেকে ধ্বনি উঠ্‌লো ভেলোকি ভাই বুম—যদিচ তার মানে কিছুই বুঝিনি আমি। খেলার শেষে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল জে কে-র পক্ষে আমাকে ও ওরেলকে একটি করে সোনার ওমেগা হাত ঘড়ি উপহার দিলে, সেঞ্চুরি করিয়েদের এই উপহার দেওয়া হবে আগে থেকেই ঘোষণা ছিল।

ভারতে আমি তখন অবহেলা পেলেও আমার খেলার সার্থকতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কানপুরে বসেই আমি সেদেশের

র‍্যাডক্লিফ ক্লাবে পেশাদার হিসেবে খেলবার জন্য টেলিফোনে প্রস্তাব পেলাম। অবশ্য ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য সে প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারিনি।

মাদ্রাজের চিপক মাঠে পঞ্চম তথা চূড়ান্ত 'টেষ্টে' ওরেল আবার মনো-মোহন খেলা খেলে ১৬২ রাণ করলেন। কমনওয়েলথ দল প্রথম ইনিংসে ১৪ রানে এগিয়ে থাকার পর চতুর্থ ইনিংসে আমাদের জয়লক্ষ্য হল ২৫৯, হাতে সময় একদিনেরও বেশী। ভিনুর সঙ্গে ইনিংস সূচনা করে আমি আমার অভ্যস্ত ধরণে খেলে যখন ৩৮ রান করেছি ফিজ মরিসের একটা বল লাফিয়ে ওঠার ফলে আমার ডানহাতের অনামিকায় দারুণ চোট লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে এক্সরে করে জানা গেল আঙুলের হাড় ভেঙে গেছে। ডাক্তার সম্পূর্ণ বিশ্রামের উপদেশ দিলেন এবং আমি বুঝলাম অন্তত এই খেলায় আর নামতে পারবো না। হাজারে ও উম্রিগর দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে রান তুললেন তিন উইকেটে ২১৬; কিন্তু এরই পর শুরু হল বিপর্যয়, ফাদারক সি, এস, যোশী ও কিষেণচাঁদ চারজন আউট হয়ে যোগ হল মাত্র ৩১ রান। যাইহোক আমাদের রান সাত উইকেটে ২৫৫ উঠলো। মাত্র চার রান বাকি, কিন্তু পি জি যোশী ও কভ্‌লার বোলার এম চৌধুরী মাত্র ব্যাট করতে বাকি। তবে মাত্র চার রানের ভরসাও এঁদের ওপর করা যাচ্ছিল না, যদিচ মধ্যপ্রদেশ গভর্ণর দলের পক্ষে অপরাজিত ১০০ রান করেছিলেন যোশী। আমি অস্থির হয়ে পড়লাম, দলের সহযোগির সাহায্য চাইলাম, প্যাড্ বাঁধতে ডান হাতে দস্তানাটা ফেঁড়ে ফেলে ফেলে সেই ফাঁকে প্লাস্টার করা আঙুলটা ঢুকিয়ে দিলাম, যাতে ব্যাটের হাতলটায় কোন মতে ঠেকা দেওয়া যায়। অধিনায়কের অনুমোদন নিয়ে মাঠে নামতে প্যাভিলিয়ন থেকে বার হলাম, হাতে তখনও নিদারুণ ব্যাথা, কিন্তু আমার গ্রাহ্য নেই, দলের এই সংকট সময়ে আমি নামছি দেখে দর্শকদের মধ্যে বিপুল হর্ষধ্বনি উঠলো এবং ক্রীজে থেকে ব্যাট ধরা পর্যন্তও করতালি থামলো না। অপর দিকে অধিকারী, আমি ওরেল ও রে স্মিথের কতকগুলি বল ঠেকালাম। তারপর যেই স্মিথ একটা জোরে ছেড়েছে, আমি ক্রীজ থেকে এগিয়ে গিয়ে কোনমতে একটা হাফ ভলি চালালাম, এক হাতের ড্রাইভে সোজা চলে গেল মিড-অফে। বলটা খটাস করে ধাক্কা খেতেই ভারতীয়দের জয় সম্পূর্ণ হল। মাদ্রাজের জনতা পাগল হয়ে, সব বাধা ঠেলে মাঠের মধ্যে ঢুকে আমায় ঘিরে ফেললো। ফাদকারের সঙ্গে ডেরায়

ফিরবার সময় আমাদের এম জি গাড়িকে বার বার থামিয়ে পথের মানুষ আমাকে অভিনন্দিত করলো।

আহত অবস্থায় খেলতে নেমে দলকে জেতানোর কৃতিত্বে আমি একক নই। অসুস্থ বা আহত খেলোয়াড় দলকে বাঁচিয়েছেন এমন উদাহরণ অনেক আছে। ১৯৩৬ এর ওভাল টেষ্টে সি কে নাইডুর অমানুষিক কৃত্যের কথা যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। নিউওভালের লাগানো বলে মাথায় চোট পেয়ে কম্পটন ঠিক ওই ভাবেই তাঁর দলের সহায়তা করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক লর্ড টেনিসন বাঁ হাতের ফাটা আঙুল নিয়ে খেলেছিল, দক্ষিণ আফ্রিকার ডাডলে নুর্স হাতের বুড়ো আঙুল ভাঙ্গা অবস্থায় রান তুলতে ত্রুটি করেননি। ভারতেও আমরা দেখেছি দিলাওয়ার হুসেন, অমরনাথ ও মার্চেণ্ট আহত অবস্থায় চিকিৎসকের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেও বীরের মত ব্যাট করেছেন। মাদ্রাজে আমি যেটুকু করতে পেরেছিলাম তার ফলে আমি ওই সব মহৎ জনদের সমকক্ষে বসতে পেরেছি বলেই আমার অতিরিক্ত তৃপ্তি।

প্রথম কমনওয়েলথ দলের সফরের সার্থকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড পরের বছরই আরেকটি কমনওয়েলথ দলের সফরের ব্যবস্থা করে। রঞ্জিট্রফি প্রতিযোগিতা জন সমর্থন অভাবে কুঁকড়ে যাক ক্ষতি নেই, বিদেশী দলের সফর একবছরও বাদ যাবে আমাদের বোর্ড তাতে নারাজ, কারণ বিদেশী দলের সফরের সঙ্গে আর্থিক মুনাফার প্রশ্ন জড়িত। ওদিকে জর্জ ডাকোয়ার্থেরও উৎসাহ, আগের বারের চেয়ে শক্তিশালী দল গঠন করে আনবেন। যাত্রার দলের অধিকারীর অনুরূপ ওই কৃত্যে ডাকোয়ার্থ যারপরনাই সফল হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় কমনওয়েলথ দলেরও অধিনায়ক হলেন একজন উইকেটকীপার লেসলি এম্‌স্। ক্রিকেটের ইতিহাসে উইকেটকীপার-ব্যাটসম্যানদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ তিনি নিঃসন্দেহে। এমস, ডাকোয়ার্থের সমসাময়িক, কাজেই বয়সে প্রবীন। ওরেল ও জর্জ ট্রাইব এবারও এলেন: আকর্ষণীয় আর যাঁরা দ্বিতীয় কমনওয়েলথ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন ডুলাণ্ড, এমেট, গ্রীভ্‌স্, ফিশলক, জিমলেকার, আইকিন ও রামাধীন, অবশ্য একটি টেষ্ট ম্যাচে ১৯টি উইকেট নিয়ে বিশ্ববিখ্যাতি তখনো অর্জন করেননি লেকার। সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সোনি রামাধীনের ওপর। জাতিতে ভারতীয়,

ওয়েস্ট ইণ্ডিজগামী ওই "রহস্যময়" বোলারটি ইংল্যাণ্ডে বিপর্যয় ঘটিয়েছিলেন ঠিক আগের মরশুমে। সফরের প্রথম শ্রেণীর খেলাগুলিতে ১৩৫টি উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। উইকেট পিছু গড়ে ১৪.৮৮ রান দিয়ে, তার মধ্যে টেষ্ট ম্যাচের উইকেট ছিল ২৬টি (গড়ে ২৩.২৩)।

আমার মতে ওরেলের পরেই অস্ট্রেলিয়ার ব্রুস ডুলাণ্ড ছিলেন দ্বিতীয় কমনওয়েলথ দলের শ্রেষ্ঠ চৌকষ খেলোয়াড়। ডানহাতের লেগ-ব্রেক ও গুগলি বোলার এবং কৃতী ব্যাটসম্যান ওই ডুলাণ্ড, রবিনস্, পীয্লস্, সিম্‌ল্, জর্জ ট্রাইব, আবভার্সন, সি. এস. নাইডু, আমির এলাহি, ফার্গুসন-এত সব গুগলী বোলারের বিরুদ্ধে খেলেছি আমি, কিন্তু ওরা কেউ আমায় দাবিয়ে রাখতে পারেননি, কিন্তু ডুলাণ্ড পেরেছিলেন।

কেন্ গ্রীভস খুব মারিয়ে ব্যাটসম্যান, ভালো গুগলি বোলার আর লেগ স্লিপে চমৎকার তাঁর ফিল্ডিং। ইংল্যাণ্ডের টেষ্ট খেলোয়াড় আইকিন প্রতিভাবান ন্যাটা ওপেনিং ব্যাটসম্যান, ধীর স্থির খেলোয়াড়। তাছাড়া কাছাকাছি ফিল্ডিং-এ তিনি ছিলেন একেবারে প্রথমশ্রেণীর।

জিম লেকার তখন নামী বোলার। পরবর্তী কালে তাঁকে নিয়ে ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেটে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাঁর স্লো-মিডিয়াম অফ-স্পিন বলের কার্যকারিতা নিয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ ছিল না, আর সবচেয়ে বিপজ্জনক ছিল তাঁর ভাসনেওয়ালা বলগুলি। ভিনু মানকড়েরই মত মাথা খাটিয়ে বল করতেন লেকার, দুজনেই বলের গতিপথে বৈচিত্র সৃষ্টিতে দক্ষ ছিলেন এবং ব্যাটসম্যানের দুর্বলতাটুকু বুঝে নিয়ে কাজ করতেন, ভিনু বাঁহাতে বল করতেন, লেকার ডান হাতে।

সোনি রামাধীন বিরাট খ্যাতি নিয়ে এসেছিলেন। ছোটখাট মানুষটি, মাথায় সাদা বেতের টুপি, শার্টের হাতার কব্জি পর্যন্ত ঢাকা, দ্বিতীয় কমনওয়েলথ দলের সফরে সবারই দৃষ্টি মূলত তাঁর উপরেই নিবদ্ধ ছিল, ডান হাতে মন্থরগতি অফ-ব্রেক ছাড়তেন তিনি, কিন্তু তার সঙ্গে ব্যাটসম্যানকে এতটুকু বুঝতে না দিয়েই মাঝে মাঝে একটা লেগব্রেক চালাতেন। দুরকমের অফ-ব্রেক ছিল তাঁর, এক ধরণের অফ-ব্রেক অফস্টাম্পের বাইরে থেকে ঢুকতো, আর একরকম মাঝের স্টাম্প থেকে লেগের দিকে আসতো, যেখানে শিকার ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে তিনজন অপেক্ষা করতো। সামান্য একটু দৌড়, অথচ অনবদ্য লেংথের কদাচ ব্যতিক্রম, পিছিয়ে খেললে

ব্যাটসম্যান গেলেন. বাঁচবার একমাত্র উপায় এগিয়ে খেলে ক্রিজের বিষ ঝেড়ে দেওয়া।

রাজধানীতে প্রথম 'টেষ্টের' ভারতীয় দলে আমার নাম দেখে খুব মজা বোধ করছিলাম। কারণ বেশ কিছুদিন যাবৎ কলকাতা টেষ্টের আগে পর্যন্ত ওরা আমায় ভুলে থাকতেন. তারপর কলকাতায় কেমন খেলি তাই দেখে পরবর্তী ব্যবস্থা। দ্বিতীয় কমনওয়েলথ দলের নিদারুণ শক্তিশালী বোলারদের মুখোমুখী হবার আগ্রহ নিয়ে আমি দিন গুনতে লাগলাম।

মার্চেন্টের সঙ্গে ইনিংস সূচনা করে নিজের অধৈর্যে আমি মরলাম, অসম্ভব রান নিতে গিয়ে আউট হলাম। অনবদ্য উইকেট সত্ত্বেও রামাধীন ও ট্রাইব ঝপাঝপ উইকেট নিয়ে আমাদের প্রথম ইনিংস ১৬৯ রানে খতম করে দিলেন, ফাদকরই যা কিছু রুখে ৪১ রান করলেন। কমনওয়েলথ দলের ২৭২ রানের মূল ভিত্তি ছিল ভুলাণ্ডের নিজস্ব ১০৮, নইলে মানকড় যেভাবে বল ফ্লাইট করছিলেন, অন্য কোন ব্যাটসম্যানই তার মোকাবিলা করতে পারেন নি। বাঙলার চৌধুরী আক্রমণে ভিনুর প্রধান সহযোগী ছিলেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে মার্চেন্ট ও আমি ৩৬ রান তুললাম। রামাধীনের বোলিং নেটে ও প্রথম ইংনিসে অনুধাবন করে তার প্রতিরোধের পন্থা ভেবে নিয়েছি। প্রথম থেকেই এগিয়ে ও মেরে খেলতে লাগলাম, যার ফলে কমনওয়েলথ দলের শক্তিমান বোলার বাহিনী আমাকে কাবু করতে পারলোনা। সাহস ও সঠিক পদচালনা সহকারে খেললে রামাধীন বা অন্য কোন বোলারই কোন সমস্যা নয়। ওই 'রহস্যময়' বোলারের বিরুদ্ধে আমি কখনো পিছিয়ে খেলিনি। এগিয়ে খেলার ফলে ওর স্পিন বোলিং-কে আমি হাফভলি করতে পেরেছি। কিন্তু নিজস্ব ৬১ রান করেও ওরেলের একটা সোজা বল এগিয়ে মারতে গিয়ে এল বি হয়ে গেলাম। ২৪৪ রান করে হাজারে দলের নোঙর ধরে রইলেন, মার্চেন্ট উমিগ্রড় ও অধিকারীর সুযোগ্য সহযোগিতার ফলে আমাদের অনেক রান উঠে গেল। খেলা যখন শেষ ততক্ষণে কমনওয়েলথ তুলেছে এক উইকেটে ২৪১। ব্যাটিং-এর জয়জয়কারের মধ্যে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ।

এর পর আমি কমনওয়েলথ দলের বিরুদ্ধে খেললাম হোলকার দলের হয়ে। ওদের রামাধীন আর আমাদের হীরালাল গায়কোয়াড় মারাত্মক বোলিং করলেন। আমাদের দলে ন্যাটা ব্যাটসম্যান রঙ্গনেকার একাই যা খেললেন, বেশি ভালো খেললেন দ্বিতীয় ইনিংসে, আমার সঙ্গে তাঁর তৃতীয় জুড়িতে

যোগ হল ১৩০, অনবদ্য বোঝাপড়ার ফলে দুজনের রান নেওয়ার প্রয়াস দর্শনীয় হয়েছিল। তবে রঙ্গনেকার আমার চেয়েও দ্রুতরান তুলে ৭৮ করলেন, আমি ৭২। চার উইকেটে ২৯৭ উঠলেই হোলকার দলের ইনিংস ঘোষণা করা হল। কমনওয়েলথকে জিততে ২২৪ করতে হয়, প্রথম ইনিংসের ওদের রান যা ছিল তাই, তবে খেলার শেষে উঠলো দু উইকেটে ১৫৭।

তবে প্রকৃত্ব মহত্ব দেখালেন ওরেল, খেলার শেষ ওভারে কিশোর স্কুলের ছাত্র এসে ওরেলকে (৬৮) বোল্ড আউট করাতে ওরেল এগিয়ে গিয়ে তাকে অভিনন্দন জানালেন।

বোম্বাই-এর দ্বিতীয় টেষ্টের প্রথম ইনিংসে আমাদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা দ্বিতীয় ইনিংসের দৃঢ় প্রতিরোধ দিয়েও ঢাকা গেল না। রিজওয়ে ও লেকারের বোলিংএ আমাদের ইনিংস ৮২ রানে খতম, আমি গোল্লা। দ্বিতীয় ইনিংসে উম্রিগড় ও হাজারে সেঞ্চুরি করে রান উঠালেন ৩৯৩। আমাদের ৮২র উত্তরে কমনওয়েলথ দল তুলেছিল ৪:৭, যদিও তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল ৮৯ কেন্ গ্রীক্সের। দশ উইকেটে হেরে গেলাম আমরা।

কলকাতায় পরবর্তী "টেষ্টে" স্বভাবতই আমি বাদ পড়লাম, কলকাতার টেষ্টে আমাকে বাদ দেওয়া সম্ভব হল। যাই হোক খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হল, তবে হাজারে উপর্যুপরি তৃতীয় সেঞ্চুরি করলেন।

পরম বিস্ময় মাদ্রাজের পরবর্তী "টেষ্টে" আমি নির্বাচিত হলাম। সেখানেও আমি শূন্যে পড়ে রইলাম, তা সত্ত্বের ভারতীয় দলের রান উঠলো ৩৬৯, জবাবে কমনওয়েলথ করলে ৩৯৩, আমাদের পক্ষে উম্রিগড় ও ওদের আইকিন ১১০ করলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে আমি যাহোক ৩৮ করলাম, হাজারে দু ইনিংসেই অল্পের জন্য শত রানে বঞ্চিত হলেন, ২০ রানে ও ১৫ রানে। অমীমাংসিত ওই খেলাটিতে মোট রান উঠলো ১২৮১, উইকেট পড়লো ৩১টি।

কানপুরে পঞ্চম "টেষ্ট" ছিল আগাগোড়া উত্তেজনায় ভরা। এ পর্যন্ত একটি মাত্র খেলা নিষ্পত্তি হয়েছে ওদের জয়ে, বাকি কটি ড্র। কাজেই কানপুরে জিততে পারলে রাবার সমান সমান করে নেবার সম্ভাবনায় আমরা অনুপ্রাণিত। কানপুরের নতুন তৈরি ঘাসের উইকেটের চরিত্র বোঝা সম্ভব হল না। তাই টসে জিতে ওদেরই ব্যাটিং দিলেন মার্চেন্ট। চারদিন আগে ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে। তৃতীয় দিন সারাক্ষণ ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে খেলা। এই

অবস্থায় আমাদের দায় চতুর্থ ইনিংস খেলার। সেই ইনিংসে আমাদের ৪৮০ মিনিটে ৪৪০ রান তোলার দায়।

তিন রান হতেই রেগে ফেরত। এরপর মার্চেন্ট ও উদ্রিগড় যখন ৭৯ মিনিটে মাত্র ৪৭ রান যোগ করলেন, ঘড়িকে দৌড়ে হারাবার আশা তখন স্তিমিত; কিন্তু পরের ৬১ মিনিটে ৬৫ রান উঠে গেল। দিন শেষে দুই কেটে উঠলো ১৪১। পরের দিন ৩০০ মিনিটে ২৯৯ রান তোলা নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়।

আমি ক্রিজে নেমে প্রথম বলেই ওয়েলকে লং-অন বাউণ্ডারিতে পাঠালাম। সমস্ত রকম ঝুঁকি নিয়ে দ্রুত রান তুলে চললাম। মার্চেন্ট ডুলাণ্ডকে ফাইন-লেগে মেরে নিজস্ব শতরান পূর্ণ করলেন। দারুণ উত্তেজনার মধ্যে স্কোরবোর্ড বেগে ঘুরে চলেছে, সবার মনে জেগেছে আশা। কিন্তু মধ্যাহ্ন ভোজের আধ ঘণ্টা আগে রামাধিন বল নিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মারলেন দুই কোপ। মার্চেন্ট হুক মারার প্রয়াসে ব্যর্থ হয়ে এল বি হলেন, ফাদকর একটা সাংঘাতিক বল সামলাতে গিয়ে লেগস্লিপে ডুলাণ্ডের হাতে ধরা পড়লেন।

মার্চেন্ট যতক্ষণ ছিলেন তিনিই দাদা, আমি ছোট ভাই। এবার আমাকেই দাদাগিরির ভার নিতে হল, সাথে ছোট ভাই গোপীনাথ। কিন্তু এসে থেকেই গোপীনাথ ঝানু খেলোয়াড়ের মত ব্যাট চালাতে থাকলেন, দেখে কে বলবে যে সর্বভারতীয় দলে এই তার প্রথম আবির্ভাব। ১৭৬ মিনিটে ২০০ রান যোগ হয়ে গেল, আর বাকি আছে ১৪০ রান, হাতে সময়ও প্রায় ১৪০ মিনিট, উইকেট হাতে আছে পাঁচটি। বিজয় রাজ্যের সীমানা দৃষ্টিগোচরে এসে গেছে, প্রবল আশা জেগেছে সবার মনে।

কিন্তু এবার রামাধিন যে আঘাত হানলেন, তা আর সামলানো গেল না। আমার ৮০ রান উঠেছে, শতরান সম্ভাবনার মধ্যে, এমন সময় রামাধিনের ইয়র্কার আমার প্যাডে ঘষে সোজা গিয়ে স্টাম্পে লাগলো। ছ উইকেটে ৩০৮ রান থেকে ৩৪০-এ সব শেষ। মানকড়, রামচাঁদ, গাইকোয়াড় ও রামেন্দ্রনাথ ঝটপট পড়ে গেলেন। একমাত্র গোপীনাথ খাড়া রইলেন নির্ভয়ে ও দীপ্ত তেজে, ৬৬ রান করে। জয়লাভ হয়েও হল না। হল না বলেই ক্রিকেট ক্রিকেট। কিন্তু যে বিরূপ পরিবেশে আমরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে অনেকখানি পর্যন্ত এগিয়ে ছিলাম, তার নামও ক্রিকেট, চরিত্রময় ক্রিকেট।

খেলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনতা ভেঙ্গে পড়লো, পুলিশ বেষ্টনি ভেদ

করে প্যাভিলিয়ানে চড়াও হল. যেখানে যা পেল ভেঙ্গে তছনছ করলো, বেতার এলাকাও রেহাই পেল না। এই উচ্ছৃঙ্খলতা পূর্বদিনের জের মাত্র। আগের দিন খেলার শেষে রটে গিয়েছিল ডুজন চিত্রতারকার উপস্থিতি. তারা কোন গাড়ি করে পালাচ্ছে দেখবার জন্য খেলোয়াড়দের জন্য রাখা মোটরগুলি ঘেরাও হয়ে গেল। শুনেছি পুলিশ লাঠিচার্জ করেছিল, আর জনতাও ইষ্টক বর্ষণ করেছিল। কোন মতে খেলোয়াড়রা ডেরায় ফিরে যেতে পেরেছিল এই যা।

পরদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণে পরিবেশ আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠলো. শহরময় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা, শেষ পর্যন্ত উত্তর প্রদেশের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিলেন, পুলিশের বাড়াবাড়ি সম্পর্কে যথোচিত অনুসন্ধান হবে, এর পর পরিস্থিতি শান্ত হল। এই সবও ক্রিকেটেরই অঙ্গ, তবে সে অঙ্গ আসলে অঙ্গ বিকৃতি, ক্রিকেটকে যেখানে পঙ্গু করে দেয়।

ছাব্বিশ

পূর্ণ মহিমায় সূর্য অস্ত গেল

এত সব বিদেশী দলের সফরের ফাঁকে ফাঁকে ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আপন বেগে অগ্রসর হয়েছে। প্রথম বার ফাইনালে ওঠার পরবর্তী এক দশক হোলকার দল ওই প্রতিযোগিতার শীর্ষে অবস্থান করেছে। এগার বছরে বোম্বাই ফাইনালে উঠেছে পাঁচবার, হোলকার দশবার, দুপক্ষই চারবার করে জয়ী হয়েছে। ১৯৪৫-৪৬-এ হোলকার দলের প্রথম সার্থকতা। তার পরের বারও আমরা ফাইনালে, যদিচ দলের পক্ষে সেঞ্চুরি ছিল মাত্র একটি। উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে আমার ২২৫। কিন্তু আমরা বরোদাদলের ধাক্কায় কাৎ হয়ে পড়লাম। বরোদা রানের পাহাড় জমা করলো, হাজারে ও গুল মহম্মদ একত্রে ৫৭৭ রান তুলে সারা দুনিয়ার জুড়ি রেকর্ড ভেঙ্গে দিলেন। আগের বছরের পরাজয়ের শোধ তুললো বরোদা দল। রেকর্ড প্রসঙ্গে বক্তব্য, ওরেল ও ওয়ালকট আগের বছর জুড়িতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের খেলায় ৫৭৪ করে-ছিলেন, হাজারে ও গুল তিন রানে তা ছাড়িয়ে গেলেন।

এতখানি আত্মবিশ্বাস নিয়ে এমন মনোহরণ খেলা আমি আর কখনো খেলতে দেখিনি। হাজারের বিজ্ঞানসম্মত খেলায় কোথাও ভুল বা ছিদ্র নেই। ছোটখাটো মানুষ গুল মহম্মদ সেই খেলায় স্ট্রোকের যে মোহন সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য দেখিয়েছিলেন, মহিমময় ড্রাইভ, ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভরা পুল—তার পাশে হাজারের খেলাও ম্লান হয়ে গিয়েছিল. গুল করেছিলেন ৩১৯, হাজারে ২৮৮।

এর পর শুরু হল হাজারে ও আমির এলাহি-র বোলিং, তার বিরুদ্ধে হোলকার দলের ব্যাটিং বালির বাঁধের মত ভেঙে পড়লো. একমাত্র সারভাতে ৯০ ও ৮৭ রান করে যেটুকু প্রতিরোধ সম্ভব করেছিলেন। তা বলে বরোদা দলের ৭৮০ রানের বিরুদ্ধে খেলে ইনিংস পরাজয় এড়ানো সম্ভব হয়নি।

পরের বছরটি আমাদের পক্ষে স্মরণীয়, কারণ ফাইনালে বম্বেকে হারিয়ে ছিলাম। জয়সূচক রানটি করেন চাঁদু সারভাতে, আমার অবদান ছিল ৫২ ও অপরাজিত ৪৪। নিজের মাঠে ন উইকেটে জিতেছিল হোলকার দল। আমাদের পক্ষে বোলিং-এর প্রধান কৃতিত্ব ছিল হীরালাল গায়কোয়াড়ের (১০৯ রানে ৯ উইঃ)। শ্রেষ্ঠ ব্যাটিং ছিল সি, এস নাইডুর ৯৬।

এ বছরের প্রতিযোগিতাটি আমার পক্ষে আরো এক কারণে বিশেষভাবে স্মরণীয়। জীবনের একমাত্র দ্বিশতাধিক (২৩৩) রান আমি এবারের প্রতিযোগিতায় করেছিলাম উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে, আমায় সবচেয়ে সহযোগিতা দিয়েছিলেন সি, এস (৯৮)। দুজনে মিলে চতুর্থ জুড়িতে ২৬৫ রান যোগ করেছিলাম।

পরের বছর হোলকার সেমি-ফাইনালে বরোদার কাছে হেরে যায়, এগার বছরে ওই একবারই যা ফাইনালে বাদ পড়ে। দলের প্রথম খেলায় মধ্যপ্রদেশ ও বেরার দলের বিরুদ্ধে আমি শত রান করেছিলাম, কিন্তু পরবর্তী চার ইনিংসে আমার মোট রান ছিল ৫৪। হাজারে, সোহানি ও সিন্ধে ব্যাটে-বলে সমান পারদর্শিতা দেখিয়ে আমাদের কাবু করেছিলেন, ইন্দোরের উইকেটের সুযোগ বরোদা দলই বেশি করে নিতে পেরেছিল।

ওই বছরটি (১৯৪৮-৪৯) ভারতীয় ক্রিকেটে বিশেষভাবে স্মরণীয়, যে কৃতিত্ব সাধিত হয়েছিল এবং যা হয়নি উভয় কারণেই। মহারাষ্ট্রের হয়ে ব্যাট করে বি বি নিম্বলকার নিজস্ব ৪৪৩ রান করেও বীরদর্পে চলছিলেন, কিন্তু বিপক্ষ কাথিওয়াড় দলের অধিনায়ক খেলা চালাতে অস্বীকার করে টিম নিয়ে চলে

যান, কারণ ততক্ষণে মহারাষ্ট্র দলের রান চার উইকেটে ৮২৬ উঠে গেছে। তৃতীয় দিনের মধ্যাহ্ন ভোজন সময়ে হঠাৎ খেলা থেমে না গেলে, নিম্বলকারের পক্ষে আর দশ রান যোগ করা অতি সহজেই সম্ভব হত, আর তা যদি হত দুনিয়ার ক্রিকেটে ব্যক্তিগত রানের সর্বোচ্চ রেকর্ড তিনি সেদিন প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন ডন ব্র্যাডম্যানের ৪৫২ রানের রেকর্ড ভেঙে। পরবর্তী কালে অবশ্য পাকিস্তানের হানিফ মহম্মদ তাদের জাতীয় প্রতিযোগিতায় ৪৯৯ রান করেছেন (১৯৫৮-৫৯)। কিন্তু নিম্বলকর ও ভাণ্ডারকর দ্বিতীয় জুড়িতে ৪৫৫ রান তুলে ব্র্যাডম্যান-পনসফোর্ড প্রতিষ্ঠিত ৪৫১ রানের রেকর্ড ভাঙতে পেরেছিলেন এবং সে রেকর্ড আমার এই গ্রন্থ রচনার সময় পর্যন্ত অক্ষত ছিল।

এই প্রসঙ্গে রেকর্ড দিয়ে খেলোয়াড়ের যোগ্যতা বিচার না করতে আমি পাঠকদের অবহিত করছি। রেকর্ড খেলার খবর পুরোপুরি প্রকাশ করে না, বলে না বিপক্ষ দল কতখানি শক্তিশালী ছিল, খেলার পরিবেশ কি ছিল তাও জানাতে পারে না। ব্যক্তিগত রানের রেকর্ডে হানিফ ব্রাডম্যানকে হারিয়েছেন, নিম্বলকার হারাবার সুযোগে বঞ্চিত হয়েছেন, তা বলে কেউই কি হানিফ কি নিম্বলকারকে ব্র্যাডম্যানের সমগোত্রীয় ব্যাটসম্যান বলে ভুল করবেন? কত রান উঠেছে এটি হল ক্রিকেটের এক দিক, তার চেয়েও বড় দিক হল সে রান কি ভাবে ও কোন অবস্থায় উঠেছে।

পরের বছর (১৯৪৯-৫০) হোলকার আবার ফাইনালে বরোদার কাছে হেরে গেল। এবার চার উইকেটে। প্রথম ইনিংসে আমার ৪০ই সারা ম্যাচে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান, কিন্তু হাজারেই ১৩০ ও ১০৩ রান করে ব্যাটিং-এর প্রধান মর্যাদা লাভ করেন এবং বরোদায় জয়লাভ তারই ফলে সম্ভব হয়। নক্ষত্রখচিত বোম্বাই দলকে একেবারে প্রথম খেলায় এক ইনিংসে হারিয়ে বরোদা বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। ফাইনালের আগে পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে আমি ইন্দোরে ১৯১ করেছিলাম এবং সমগ্র প্রতিযোগিতার ন'টি ইনিংসে আমার মোট রান ছিল ৪৬৭। আমার চেয়ে বেশি রান ছিল সারভাতের ৫৩০, তার মধ্যে প্রধান ছিল দিল্লীর বিরুদ্ধে ২৩৫-এর ইনিংস। তবে আমি এবারে দ্বিতীয়বার প্রমাণ দিয়েছিলাম যে অধিনায়কত্বের বোঝায় আমার ব্যাটিং ভেঙে পড়ে না, সি, কে'র আঙুল ভাঙা ছিল বলে আমিই ছিলাম অধিনায়ক এবং তা সত্ত্বেও ১৯১ রান করেছিলাম।

১৯৫০-৫১ রঞ্জি প্রতিযোগিতাই আমার শ্রেষ্ঠ বছর। পর পর চারটি খেলাতে সেঞ্চুরি করে আমি মোট ৬০৭ রান তুলেছিলাম এবং তার গড় ছিল ১০১.১৬। মার্চেন্ট যেবার (১৯৪৪-৪৫) রঞ্জিতে শ্রেষ্ঠ খেলা খেলেন তাঁর সঙ্গে আমার এবারকার হিসেব ছিল সমান, তবে আমার সর্বোচ্চ ১৯৭, মার্চেন্টের ছিল ২৭৮। উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে আমি করি ২২৫, পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে অপরাজিত ২০০, হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে ২০০ ও গুজরাটের বিরুদ্ধে ১৮৭, ফাইনালে গুজরাটকেই হারিয়েছিল হোলকার।

পরের বছর ফাইনালে আমরা বম্বের কাছে হেরে গেলাম, কিন্তু তারও পরের বছর (১৯৫২-৫৩) পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে যে ফাইনাল খেলায় জয়ী হই, সব দিকের বিচারে সেটিকে রঞ্জি প্রতিযোগিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যে অবস্থায় যে ভাবে হোলকার জয়ী হয়েছিল তা একা মাত্র সি, কে নাইডুর প্রেরণা ও পরিচালনাতেই সম্ভব হয়েছিল। বিশেষ স্মরণীয় যে ওই তিনি শেষবার হোলকার দল পরিচালনা করেন। সেদিন বিদায়ী সূর্যের ছটায় ভারতীয় ক্রিকেট তখন সত্যিই উদ্ভাসিত হয়েছিল।

ফাইনালে যাবার পথে সারভাতে দুটি সেঞ্চুরি করেন, আর একটি করে করেন নিভসরকার, নিম্বলকর ও রঙ্গনেকার। তরুণ নরি কণ্ট্রাক্টার দু ইনিংসে সেঞ্চুরি করে গুজরাটের পক্ষে বরোদার পরাজয় সম্ভব করে তোলেন। গুজরাট হারে মহারাষ্ট্রের কাছে, বম্বেও তাই। মহারাষ্ট্রকে সেমি-ফাইনালে হারায় হোলকার বিশেষ করে নিম্বলকার ও রঙ্গনেকারের ভালো ব্যাটিং-এর জোরে।

ইডেন গার্ডেনে ফাইনাল। মহারাজ হোলকার সকন্যা এবং আমার স্ত্রী ও পুত্র খেলায় আগাগোড়া সাগ্রহে উপস্থিত ছিলেন। শুধু ওরাই নয়, প্রতিটি দর্শক পরম উৎকণ্ঠা সহকারে সমগ্র খেলাটি দেখেছেন, যারা দেখেন নি, তাঁরাও সাগ্রহে অনুধাবন করেছেন। অনেকে জানতেই পারেন নি তাঁরা কি হারিয়েছেন।

টসে জিতে পশ্চিমবঙ্গ পি বি দত্ত'র শতরান সহযোগে ৪৭৯ রান ওঠালো, জবাবে হোলকার তুললো ৪৯৬ এবং ওই ১৭ রানের অগ্রগতির জোরে শেষ পর্যন্ত আমাদের দলের জয়লাভ সম্ভব হল। বি বি নিম্বলকর-এর ২১৯-এর জোরেই হোলকার দলের ওই অগ্রগতি। তবে যথেষ্ট ভালো খেলেও নিম্বলকর রঞ্জির খেলায়। ইডেনে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানে উজির আলির রেকর্ড (২২৩)

ভাঙতে পারলেন না। আমি মাত্র এক রাণের জন্য শতরানে বঞ্চিত হলাম। নিম্বলকার ও আমি চতুর্থ উইকেটে ১০৮ রান যোগ করলাম। রঙ্গনেকারের সঙ্গে নিম্বলকার পঞ্চম উইকেটে করলেন ১৫৮।

কলকাতার দর্শক চিরকাল আমাকে ভালবাসে। তবে এক্ষেত্রের নিজেদের দলের জয়লাভ স্বভাবতই তাদের কাম্য। এই প্রথম কলকাতার দর্শক আমাকে চেঁচিয়ে আউট করার চেষ্টা করেছে। জনতার আচরণে আমার স্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন, মুশতাখ সেঞ্চুরি না করতে পারে, তবে হোলকার জিতবেই। তাঁর কথাই সত্য হয়েছিল। ৯৯ রানের মাথায় প্রাক্তন টেষ্ট উইকেটকীপার তথা পশ্চিমবঙ্গ দলের অধিনায়ক পি সেন অসাধারণ দক্ষতায় আমাকে ক্যাচ আউট করেন।

অসম্ভব দ্রুত রান করে পশ্চিমবঙ্গ দল তিন ঘণ্টায় তিন উইকেট হারিয়ে ৩২০ রান তুলে ফেলে। কিন্তু আমাদের দলপতি সি কে সকলের মনেই জয়ের আশা জাগিয়ে রেখেছিলেন এবং সকলকে দৃঢ় সংকল্পে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ক্রিকেটের প্রাণবত্তার মূলে যে অনিশ্চয়তা তা পূর্ণরূপে প্রতিভাত হল আমাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং-এ। স্থানীয় দলের তীব্র আক্রমণাত্মক বোলিং ও নিরেট ফিল্ডিং। তার বিরুদ্ধে হোলকার দলের উইকেট পড়তে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ তথা বাঙ্‌লার বিরুদ্ধে আমি বহুবার খেলেছি, কিন্তু এমন একান্ত ও একাগ্র প্রয়াস আর কোনবার তেমন দলের খেলায় চোখে পড়েনি। হোলকারের ব্যাটসম্যান একের পর এক প্যাভিলিয়ানে ফিরে আসে, আর স্থানীয় সমর্থকবৃন্দের আশা ও আনন্দ বাড়তে থাকে।

খুব ধৈর্যসহকারে গেলেও আমি ৪৬ রানে আউট হলাম, ততক্ষনে মনে নৈরাশ্য জেগে গেছে। স্বয়ং হোলকার বিচলিত। পশ্চিমবঙ্গ দলের জয় ক্রমেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে আসছে, একমাত্র যদি সময় পার করে দেওয়া যায় তবেই রক্ষা।

তখনো ৭০ মিনিট বাকী, শেষ জুড়ি হীরালাল গায়কোয়াড় আর ধনওয়াড়ে কি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? অসম্ভব। আমি হতাশ হয়ে হোটেলে চলে এসেছি, যার সঙ্গে দেখা হয়েছে বলেছি আমরা হেরে গেছি। কিছুক্ষণ পরে যখন টেলিফোন পেলাম প্রথম ইনিংসের ১৭ রানের জোরে আমরা ম্যাচ জিতেছি, আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম এবং আনন্দোৎসবে ও পারিতোষিক বিতরণে যোগদানের উদ্দেশ্যে ইডেনে ছুটে এলাম। শুনলাম ভাগ্য আমাদের

সাহায্য করেছে, এম কে গিরিধারীর একটা বল ধানওয়াড়ের প্যাডে লেগে স্টাম্পে গিয়ে লেগেছিল কিন্তু বেইল পড়েনি। কিন্তু ভাগ্যদেবী বীরের প্রতিই সুপ্রসন্ন হন। পরম বীরত্বে গায়কোয়াড় ও ধানওয়াড়ে পশ্চিমবঙ্গ দলের সংহত আক্রমণ প্রতিরোধ করেছেন দীর্ঘ ৭০ মিনিট। বোলিং যতই তীব্র হয়, যত বুদ্ধি খাটিয়ে বল ছাড়া হয়, দুজনের একজন ব্যাটসম্যানও ব্যাট চালান না, মরা ব্যাট পেতে রাখেন। আজ ধানওয়াড়ে আমাদের মধ্যে নেই, মৃত্যুর হাত অকালে তাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। বিজয়ান্তে হোলকার বাহাদুর গ্রাণ্ড হোটেলে আমাদের আপ্যায়িত করেন এবং দলে প্রত্যেককে নগদ টাকা পুরস্কার দেন।

পরবর্তী রঞ্জিট্রফি যখন শুরু হল, সি কে নাইডু চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে হোলকার দলের অধিনায়ক পদেও ইস্তফা দিয়েছেন। হোলকার দল গঠিত হওয়া থেকেই আমি সহাধিনায়ক ছিলাম, স্বভাবতই অধিনায়কের দায়িত্ব আমার উপরেই পড়লো। তবে জীবনের শেষ লগ্নে সে সম্মানের আকর্ষণ লোপ পেয়ে গেছে, উৎসাহ গেছে মরে। তবু হোলকার বাহাদুরের অনুরোধ এড়াতে পারলাম না।

আমার নেতৃত্বে হোলকার দলের প্রথম খেলা মধ্য প্রদেশের বিরুদ্ধে জব্বলপুরে, আমি সামান্য কয় রানের জন্য নিজস্ব শতরানে বঞ্চিত হলেও আমাদের দল ভালোভাবেই জয়ী হল। আজমীঢ় মেয়ো কলেজ মাঠে রাজপুতানাকে এক ইনিংসে হারিয়ে আমরা কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠলাম। এবার খেলা প্রবীন ক্রিকেটার পৃথ্বিরাজ চালিত পূর্ব পাঞ্জাবের সঙ্গে। আমি শতরান করলাম, কিন্তু বেশি আনন্দ পেলাম কিশোর ক্রিকেটার বিজয় মেহরার খেলা দেখে, নির্ভুল পদ্ধতিতে ও শান্ত মনে তাঁর ইনিংস সূচনার খেলায় প্রচুর প্রতিশ্রুতি দেখেছিলাম। ১৯৫৫-৫৬ সালে নিউজীল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে বিজয় টেষ্ট দলে নির্বাচিত হন, তখন তাঁর বয়স ১৭ বছর ২৬৫ দিন। এর আগে আমিই সবচেয়ে কম বয়সে ভারতের প্রথম টেষ্ট খেলেছিলাম, তখন আমি ১৯ বছর ৯ দিন পার করেছি মাত্র। দুঃখের বিষয় বিজয়কে বেশিদিন টেষ্ট খেলতে দেখা যায়নি। আমার অধিনায়কতার প্রথমবারেই আমার দল ফাইনালে গেল, এবারও পশ্চিমবঙ্গকে হারালাম। বিপক্ষ বম্বের দলে সমসাময়িক সাতজন টেষ্ট খেলোয়াড়, অভিজ্ঞ সোহোনি অধিনায়ক, মোদির সেঞ্চুরি সমেত প্রচুর রান উঠলো। তারপর মানকড় ও

বালু গুপ্তের বোলিং-এর জোরে আমাদের অল্প রানে নামিয়ে ওরা জয়ী হল।

পরের বছরও আমার পরিচালনায় ফাইনালে খেলা। এবারকার খেলা মাদ্রাজ রাজ্য দলের বিরুদ্ধে। মাদ্রাজে খেলাবার অন্যায় চেষ্টা এবং তার সপক্ষে প্রচার সত্ত্বেও খেলাটি ইন্দোরেই অনুষ্ঠিত হয়। এমনিতে সেবার আমার ব্যাটিং ভালো হচ্ছিল না, তবু ফাইনালে আমি ৫৫ ও ৫১ করলাম, এখন আর এক নম্বর বা দু নম্বর নামছি না, একেবারে তিন নম্বরে খেলছি। সামান্য ৫৬ রানের ব্যবধানে আমাদের হারিয়ে মাদ্রাজ সেবার সর্ব প্রথম রঞ্জি ট্রফি লাভ করলো। সেই তরুণ দলে মাদ্রাজ জনতার প্রিয় খেলোয়াড় সি ডি গোপীনাথ ১৩৩ রানে দর্শনীয় ইনিংস খেললে আর এ জি রাম সিং-এর পুত্র কৃপাল সিং ৭৫ ও ৫১ রান করা ছাড়াও সাতটি উইকেট নিলেন। সারঙ্গপানিকে অর্জুন নাইডু ক্যাচ ধরলে আম্পায়ার সে আউট নাকচ করে দেওয়ায় সংবাদপত্রসমেত সর্বত্র বিরূপ সমালোচনা হয়, কিন্তু আম্পায়ারের ভুলও ক্রিকেটের অঙ্গ।

হোলকার দলের পক্ষে ওই আমার শেষ রঞ্জি ট্রফি খেলা। পরের বছরই সারা ভারত জোড়া রাজ্য পুনর্গঠন ব্যবস্থায় হোলকার রাজ্য মধ্যভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং সেই সুবাদে হোলকার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনেরও অস্তিত্ব লোপ পায়। এই সময় সর্দার প্যাটেলের ইন্দোরে উপস্থিতির সুযোগে কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারীরা ক্রিকেটের পুরাতন ব্যবস্থা বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে নতুন ব্যবস্থায় ক্রিকেটের ব্যবস্থায় ক্রিকেটের কি ক্ষতি হবে তা বোঝাবার চেষ্টা করেন। সর্দার প্যাটেল মৃদু ভর্ৎসনা করে তাঁদের ক্রিকেটকে রাজনীতি দিয়ে বিষাক্ত না করার নির্দেশ দেন। আমি নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলাম, ছিলেন সি কে নাইডু ও শ্রীমতী মানবেন প্যাটেল। কিছু দিনের মধ্যে মধ্য ভারত ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশানের স্থান নেয় মধ্য প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশান। হোলকারের পোষকতায় বঞ্চিত মধ্য ভারত এবং পরে মধ্য প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশান প্রথম থেকেই অর্থাভাবে পীড়িত। তাছাড়া যে সব বড় বড় ক্রিকেটার হোলকার রাজসরকারে চাকরির সুবাদে হোলকার দলে খেলতেন, মধ্যপ্রদেশ দলের হয়ে খেলতে তাঁদের পাওয়া গেল না। স্বভাবতই দলটি খুব দুর্বল হয়ে পড়লো। পয়সার অভাব হয়তো সরকারী বদান্যতায় মিটে যেতে পারে, এতদিনে মিটে গিয়েও থাকবে, কিন্তু হোলকার রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত

করেও মধ্য ভারত ও মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট শক্তি হিসাবে হোলকার দলের কাছাকাছিও পৌঁছতে পারেনি।

ভারতীয় জনগণের বৃহত্তর কল্যাণে হোলকার রাজ্যের বিলোপের হয়তো ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ভারতে যতদিন ক্রিকেট খেলা ও আলোচিত হবে হোলকার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশানের অবদান স্মৃতি পটে উজ্জ্বল হয়ে থাকবেই। হোলকার দল ক্রিকেট ইতিহাসের অমোঘ বিধানে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে হতে অবশেষে অবলুপ্ত হয়নি। অস্তিত্বের শেষ দিন পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেটে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে মর্যাদা রক্ষা করে চলেছে। এ যেন পূর্ণ মহিমায় সূর্যের অস্তাচলে গমন।

সাতাশ

আমি বাতিল

চল্লিশ দশকের শেষের দিকে আমার রঞ্জি ট্রফির খেলায় উত্তরোত্তর উন্নতি হতে থাকলেও তা তুঙ্গে উঠলো ১৯৫০-৫১-র মরশুমে। ভারতে ক্রিকেট পরিচালনায় কর্তৃত্ব যাঁরা কব্জা করে রেখেছিলেন, তারা কিন্তু আমায় বাতিল করে দিলেন, তাঁদের মতে আমার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কমনওয়েলথ দলের বিরুদ্ধে চারটি সর্বভারতীয় খেলায় ওঁরা আমায় নির্বাচন করেছিলেন এবং দিল্লীর চূড়ান্ত টেষ্টে আমি আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলা খেলেছিলাম। কিন্তু পরের মরশুমে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে টেষ্টগুলিতে আমাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা হলনা।

একেবারেই গ্রাহ্য করা হয়নি তা অবশ্য ঠিক নয়, মাদ্রাজে পঞ্চম টেষ্ট দলে আমাকে নেওয়া হয়েছিল, সেই খেলায় ভারত এক ইনিংসে জয়ী হয়েছিল— অবশ্য আসলে ইংল্যাণ্ডের বি টীম ছিল সেটি, কিন্তু আমি সে খেলায় মোটেই সুবিধা করতে পারিনি। সে জয়ের ফলে রাবার ৩-২ ভাবে সমান সমান হয়ে যায় এবং সে জয়ের বোলিং কৃতিত্ব মানকড়ের, ব্যাটিং-এ উম্রিগড় ও ভারতের নব আবিষ্কৃত ওপেনিং ব্যাটসম্যান পঙ্কজ রায়ের, দু'জনে দু'খানা সেঞ্চুরি করেন।

একেবারে শেষ টেষ্টে আমাকে নির্বাচন উদ্দেশ্যবিহীন ছিল না। চার চারটে টেষ্টে যাকে নির্বাচনযোগ্য মনে করা হলনা, সে হঠাৎ পঞ্চম টেষ্টে যোগ্য হয়ে গেল কোন সুবাদে! ওঁরা আমাকে কোতল করবার সিদ্ধান্ত আগে থেকে নিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু অন্তত লোক দেখানো একটা বিচার না করে ফাঁসী দেওয়াটা ওঁদের কাছে সমীচিন মনে হয়নি। সেই মরশুমের শেষেই ভারত ইংল্যাণ্ড সফরে যাবে, সেই দলে মুশতাখ আলিকে নেবার দাবী যাতে না ওঠে তার ব্যবস্থা হিসেবে তাকে চার চারটে টেষ্ট থেকে সরিয়ে রাখা হল। তবু যে পঞ্চম টেষ্টে তাকে ডাকা হল তার মূল উদ্দেশ্য ছিল, ইংল্যাণ্ড দলের বোলিং সম্পর্কে অনভিজ্ঞ মুশতাখ ব্যর্থ হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা এবং তা যদি হয় ফর্ম নেই বলে ইংল্যাণ্ড সফরকারী দল থেকে সহজেই তাকে বাদ দেওয়া যায়। নইলে চতুর্থ টেষ্টের পরে ও পঞ্চম টেষ্টের আগে কোন খেলার সুবাদে ওরা আমায় অবশেষে টেষ্ট দলভুক্ত করেছিলেন, তা আমি ভেবে পাইনি।

তবে আমার প্রতি ওঁদের 'দয়ার অন্ত ছিল না, 'সুবিচার' করার আগ্রহও ছিল। তাই পুনায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ শিবিরে আমায় ডাকা হয়েছিল। ওই ধরনের শিবিরে প্রবীন ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের ডাকার যুক্তি আজও আমার হৃদয়ঙ্গম হয়নি। ওখানে কি শেখানো সম্ভব মার্চেন্টকে ও আমাকে? তবু আমাদের দুজনকে এক গুরুমশাইএর অধীনে রাখা হল। গুরু মশায় জীবনে টেষ্ট খেলেননি, তিনি শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ এবং সাসেক্সের পেশাদার বলেই কি এত বড় গুনধর বলে তাঁকে মেনে নিতে হবে যে কুড়ি বছর টেষ্টে খেলে খেলে বুড়িয়ে যাওয়া মুশতাখ আলিকে, এবং ভারতীয় দলের অধিনায়ক মার্চেন্টকে খেলা শেখাবেন! ওখানে আমরা উপযুক্ত ব্যায়াম করে শারীরিক পটুতা রক্ষা করবো এবং তরুণ খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলে একটা বোঝাপড়া গড়ে তুলবো। কিন্তু তার জন্য প্রশিক্ষক ওয়েনসলি আমাদের উপর মাষ্টারি ফলিয়ে ক্রিকেট সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান দিতে আমার তা অসহ্য হয়েছিল এবং প্রতিবাদও করেছিলাম। বিজয় মার্চেন্ট কি করে নীরবে তার ঔদ্ধত্য সহ্য করেছিলেন, আমি ভেবে পাইনি। অবশ্য বোর্ড নির্বাচিত একজন ইংরেজ কোচের প্রতি আমার ঔদ্ধত্য সহ্য করতে রাজি ছিলনা স্বাধীন সার্বভৌম ভারতের ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড।

খিটিমিটি লেগেই ছিল। অবস্থাটা চরমে পৌঁছলো মার্চেন্টের দল আমার দলের মধ্যে একটি নির্বাচনী খেলায়। কাকে কার পরে ব্যাটিং করতে পাঠাবো আমি, যে বিষয়ে বিজ্ঞের মত উপদেশ দিতে এসেছিল ওয়েনস্লি। আমি

তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, কোন অধিকারে আমার দলের ব্যাটিং অর্ডার-এর ব্যাপারে তিনি নাক গলাতে আসেন।

ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড এর জন্য আমার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করলে আমি সবিনয়ে জানালাম যে আমি তখন ভারতের প্রবীনতম ক্রিকেটারদের অন্যতম, আমার অধিকারে হস্তক্ষেপের কোন অধিকার কোচের নেই। এই অপ্রিয় সত্যভাষণের অপরাধেই আমার টেষ্ট জীবনের উপর যবনিকা পড়লো। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষপুটে আশ্রিত যে সামন্ত সমাজকে স্বাধীন ভারত সরকার উচিতবোধে গদীচ্যুত করেছিল, তাঁদেরই হাতে তখন ভারতীয় ক্রিকেট পরিচালনার কর্তৃত্ব। তাঁদের ভূতপূর্ব প্রভুদের একজন স্বজাতির মৌলিক শ্রেষ্ঠত্ব আমি প্রশ্ন করেছিলাম, ফাঁসির যোগ্য অপরাধ নিশ্চয়ই। তবু আত্মসম্মান বজায় রেখেই সেদিন ওদের ফাঁসির মঞ্চে আরোহন করেছিলাম, এই আমার তৃপ্তি।

রঞ্জিট্রফির জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা দেখে যদি যোগ্যতা নির্ণয় না করা যায়, তবে অমন প্রতিযোগিতা বাতিল করাই উচিত। আর রঞ্জির প্রতিযোগিতায় কে কেমন খেলছে তাকেই যদি জাতীয়দলে নির্বাচনের নিরিখ বলে ধরতে হয় তবে পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে আমার নির্বাচন ছিল স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু ভারতের ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের বিবেচনা ছিল অন্যরকম এবং তার দ্বারাই নির্বাচকবৃন্দ চালিত হতেন। ১৯৫২ সালের ইংল্যাণ্ডগামী দল থেকে আমি বাদ পড়লাম, তার কমাস বাদেই যখন পাকিস্তান দল ভারত সফরে এল তখন ও আমার ডাক পড়লো না। কাজেই পাকিস্তানি সফরের অব্যবহিত পরে যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে সফর তাতে আমার নির্বাচনের কোন প্রশ্নই ওঠেনা। জনসাধারনের মধ্যে ও সংবাদ পত্রে আমাকে বার বার বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হল, আমাদের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ আমাকে বধ করতে তখন কৃতসংকল্প, তাই কানে তুলো দিয়ে যা করবার তাই করে গেল। ১৯৫২ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় দলের ব্যর্থতা প্রসঙ্গে উইজডেন-এ প্রকাশিত মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তাতে বলা হয়েছিল, ‘একজোড়া স্বীকৃত ওপেনিং ব্যাটসম্যানের অভাবই ছিল দলের প্রধান দুর্বলতা’। তবু পাকিস্তানের সঙ্গে যে একটিমাত্র খেলায় আমি অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলাম, আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম তাতে ফাষ্ট বোলারদের কেমন করে

পেটাতে হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই ভারত সফরকারী সব বিদেশী দলই পাকিস্তানে খেলে যাচ্ছিল, কিন্তু তা বলে ১৯৫২-র আগে পাকিস্তান ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের পূর্ণ সদস্য বলে স্বীকৃতি পায়নি এবং ওই স্বীকৃতি এল ভারতেরই প্রস্তাবে। কাজেই পাকিস্তান যে প্রথম টেষ্ট সীরিজ ভারতের বিরুদ্ধে ভারতেই খেলবে এটিই সঙ্গত ব্যবস্থা।

পাকিস্তান দল অবিভক্ত ভারতের বিশিষ্ট খেলোয়াড় আব্দুল হাফিজ কারদারের নেতৃত্বে ভারতসফরে অনবদ্য দলগত সংহতি ও দুর্লভ সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় দেয়। ওদের খেলার খবরাখবর আমাকে দূর থেকেই সংগ্রহ করতে হয়েছিল, কারণ আমার মাত্র একটি ম্যাচ খেলার সৌভাগ্য হয়েছিল। ওদের বিরুদ্ধে নাগপুরে মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে পাকিস্তান ৩৫৬ রান তোলে, তার মধ্যে অপরাজিত থেকে অবিস্মরনীয় খেলায় ২৩৩ রান করেছিলো ওদের দলের প্রধান ব্যাটসম্যান ইমতিয়াজ আহম্মদ। তাঁর দুর্ধর্ষ ব্যাটিং-এ হীরালাল গায়কোয়াড়ের মত বোলার পর্যন্ত শিশু বলে প্রতিভাত হয়েছিলেন। প্রত্যুত্তরে মধ্যাঞ্চল যে ২৭১ রান তোলে তার মধ্যে আমার ৭৩ই ছিল সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান।

পাকিস্তান দলে দুজন প্রকৃত ফাস্ট বোলার ছিলেন—খান মহম্মদ ও মেহমুদ হুসেন। ফাস্ট বোলারকে পেটাবার আমার শখ মাত্র অর্ধেক পরিতৃপ্ত হয়েছিল, কারণ খান মহম্মদ ওই খেলায় অংশগ্রহণ করেন নি। পেস বোলারদের শায়েস্তা করার বরাবরই আমার নিজস্ব পদ্ধতি ছিল, গতানুগত বর্জ্জিত কৌশলে প্রচলিত ধরণ ধারণ অগ্রাহ্য করেই আমার খেলা। আমি নিজস্ব ক্রীজ থেকে প্রয়োজনমত এককদম এগিয়ে বা এককদম পিছিয়ে যাই, স্ট্রোকটা ঠিকমত চালাব সুবিধা করবার জন্য এপাশে কি ওপাশে একটু সরে আসি। বোলার তাঁর দৌড়ানো অবস্থায় থাকতেই আমি নিজেকে সামলিয়ে নিই। ওই ধরণের একটি ঘটনা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘটে। মহম্মদ হুসেন দু দুবার বলটা ঠিক ছাড়ার মুহূর্তে হঠাৎ থেমে গেলেন, ভাবলেন আমি বুঝি তৈরি নই। তখন আমি তাঁকে বল করবার ইঙ্গিত জানালাম। হুসেন এতে বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে বাম্পার ছাড়তে লাগলেন আর আমিও মনের সুখে ঠেঙাতে লাগলাম, চারের পর চার হয়ে চললো। কারদার আমার খেলার ধরণ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তিনি তাঁর বোলারকে আমাকে বাম্পার ছাড়ার বিপদ বুঝিয়ে দিলেন, বললেন যত বাম্পার পড়বে আমার ব্যাটে, তত দ্রুত

রান উঠবে। হুসেন বাম্পার দেওয়া বন্ধ করলেন। এমনি ঘটনা আমার জীবনে আগেও ঘটেছে। ইংল্যাণ্ডের পিটার লোডার, অস্ট্রেলিয়ার শ্যাম লক্সটন, নিউজীল্যাণ্ডের হেয়জকে নিয়েও একই অবস্থা, দর্শকরা দেখে মজা পেয়েছে।

পাকিস্তান মধ্যাঞ্চলকে হারিয়েই দিচ্ছিল। কারদার এর দীপ্তিভরা ৪৫ ও খুরশিদ আহমেদ এর ধীরগতি ১০৬-এর সাহায্যে ওরা পাঁচ উইকেটে ২৭৫ করে দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। এর পর আমাদের অবস্থা হল শোচনীয়, আট উইকেটে ৯৮ করতেই সময় পার হয়ে গেল, কোনমতে বেঁচে গেলাম।

ওই খেলাতে আমি বিস্ময়কর বালক ক্রিকেটার হানিফ মহম্মদের সাক্ষাৎ লাভ করি। তার খেলা দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি, কারণ নাগপুরের খেলায় সে বিশ্রাম নিয়েছিল। তবে মাত্র ১৭ বছর বয়সে যে সুনাম সে অর্জন করেছিল তা যে অমূলক নয়, তার প্রমাণ সে দিয়েছে পরবর্তী জীবনে দুনিয়া-জোড়া খ্যাতি লাভ করে। পুরাতন বন্ধু হাফিজের সহৃদয়তায় অভিভূত হয়েছিলাম। তাছাড়াও ছিলেন পুরনো যুগের খেলার সাথী ফজল মাহমুদ এবং নজর মহম্মদ।

বছরের পর বছর স্বভাবতই আমার খেলা তখন পড়তি। তাছাড়া হোলকার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশানের বিলোপ ঘটার ফলে খেলার সুযোগও খুব কমে গেছে। সেই দলগত সংহতি, সেই মানসিকতা, সেই পরিবেশ— সব কিছুতেই আমি বঞ্চিত।

১৯৫৫-৫৬তে ইন্দোর মধ্যভারতের অন্তর্ভুক্ত হল এবং ইন্দোরের খেলোয়াড়েরা মধ্য ভারতদলের অন্তর্ভুত হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে অংশগ্রহণ করতে লাগলো। প্রথম বছর দলের অধিনায়ক চাঁদু সারভাতে। আমি সানন্দে তার অধীনে খেললাম। অবশ্য আমাকেই অধিনায়ক হতে বলা হয়েছিল। কিন্তু আমি তরুণদের সুযোগ দেওয়ার অনুরোধ জানাই।

প্রথম খেলাতেই ইন্দোরে খেলে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে আমরা শোচনীয় ভাবে হেরে যাই। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম। দ্রুত উইকেট পতনের মুখে নিজস্ব আক্রমণাত্মক খেলা সংযত করে ৬৫ রান করেছিলাম এবং তাই ছিল আমাদের দলের সবচেয়ে বেশি ব্যক্তিগত রান। তবে কোন সুরাহা তাতে হয়নি। মধ্যপ্রদেশ দলের অধিনায়ক রহিম খানের মারাত্মক বোলিংএর

সামনে আমাদের ব্যাটসম্যানেরা দাঁড়াতেই পারেনি। ব্যাটিং-এও রহিম খান কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলেন। মধ্যপ্রদেশ দলের জয়লাভে তিনি ছিলেন প্রধান স্থপতি।

ক্রমেই আমার মনে বিশ্বাস দানা বাঁধছিল যে ভারতের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ আমাকে একেবারে বাতিল করে দিয়েছে। ভারতের জন্য প্রকৃত শক্তিশালী দল গঠনের দিকে তখন লক্ষ্য কম, কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মত এবং তার সঙ্গে নির্বাচকদের ব্যক্তিগত খেয়াল খুশি মত দলগঠন হচ্ছে। তাদের কাণ্ডকারখানা আমার এবং অনেকের চোখে অসংলগ্ন মনে হলেও তাদের 'পাগলামি'ও যে উদ্দেশ্যমূলক ছিলনা, সে কথাই বা বলি কি করে।

আমার তো মনেই পড়ে না আমার প্রতি লোকে বৈরীভাব পোষণ করবে এমন কিছু আমি কখনো করেছি। আমি এখনো বিশ্বাস করি আমার প্রতি বিদ্বেষ সম্পন্ন ব্যক্তি কেউ ভারতীয় ক্রিকেট জগতে নেই। খেলোয়াড় বা কর্মকর্তা সকলেরই সঙ্গে আমায় হৃদ্যতার সম্পর্ক। সেই কারনেই আজও আমার বিস্ময় লাগে, কেন আমার ক্রিকেট জীবন এমন অকালে খতম করে ফেলা হল। আমার ক্রিকেট বাতিল করা দেহ ও আত্মা উভয়ত আমাকে হত্যা করারই সামিল। হয়তো আমার অতিরিক্ত জনপ্রিয়তা কারো কারো মনে ঈর্ষা জাগিয়েছিল, অথবা আমি কখনো কারুর প্রতি হাত কচলানো হেঁ হেঁ ভাব দেখাইনি বলেই আমার প্রতি কারো কারো বিরূপতা। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে জাতীয় দল গঠনের বেলায় মূল বিবেচ্য ছিল ভোট সংগ্রহ, সেই বিবেচনায় মুশতাক আলি যদি কোতল হয়ে যায়, জোট বাঁধাবাঁধির রাজনৈতিক খেলোয়াড়েরা নিরুপায়।

ভারতীয় দলে নির্বাচন যখন আর হবেই না, তখন প্রথম শ্রেণীর খেলা থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত করলাম। বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে আমি ক্রিকেট বোর্ডকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলাম যে আমার জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ খেলার আয়োজন হয়। আরও জানালাম যে সেই খেলাটি হয়ে গেলেই আমি অবসর ঘোষণা করবো, তবে ডাক পড়লে প্রদর্শনী খেলায় আমি অবশ্যই যোগ দেব।

আমার নিজের এলাকায় ক্রিকেটের ধারা ক্ষীণতর, বর্তমানে শুষ্কপ্রায়। এককালের সুপরিচিত যশোবন্ত ক্লাবের ক্রিকেট মাঠেরও সে চেহারা আর নেই। ১৯৫৬ সালের গোড়ার দিকে ভিজিয়ানাগ্রামে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট

বোর্ডের এক সভায় সভাপতি ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমার জানালেন যে উত্তর প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশানের সভাপতি হিসেবে তিনি আমার জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি খেলার আয়োজন করতে চান, অবশ্য সেই সঙ্গে ইঙ্গিত দেওয়া হল যে রঞ্জিট্রফিতে আমি যেন উত্তর প্রদেশের হয়ে খেলি। এর পর ভিজির কাছ থেকে উত্তর প্রদেশের হয়ে খেলবার আমন্ত্রণলিপি পেলাম এবং আমার সম্মতিও জানিয়ে দিলাম। আমার কথা রেখে আমি উত্তর প্রদেশের হয়ে খেললাম বটে, তবে ভিজি বা উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশান আমার জন্য প্রস্তাবিত খেলাটি সম্পর্কে আর উচ্চবাচ্য করলেন না।

যে কোন যোগাযোগে সে বছর সি কে নাইডু এবং সি এস নাইডুও উত্তর প্রদেশের পক্ষে খেললেন, তবে সি কে দলে থাকলে তিনিই সবসময় অধিনায়ক হন। মধ্যভারত দলকে হারিয়ে উত্তরপ্রদেশ রাজস্থান দলের সম্মুখীন হয়। রাজস্থানের বিরুদ্ধে আমি ১০১ রান করলাম, রঞ্জি ট্রফিতে আমার সতের নম্বর তথা শেষ সেঞ্চুরি। যদিও এর পরের বছরও রঞ্জিতে খেলেছিলাম আমি। সি কের বয়স তখন ৬১, সেই সময়ও ৮৪ রান করলেন এবং সি এস (৩৫)-এর সঙ্গে পঞ্চম জুড়িতে ১১৪ রান যোগ করলেন। উত্তর প্রদেশের ৩১০-এর উত্তরে রাজস্থান করলো ২০৬, তার মধ্যে রামচাঁদ ১০৬। দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ উইকেটে ৩৪২ করলো উত্তর প্রদেশ, কিন্তু চতুর্থ দিন খেলা শেষের পর রাজস্থান পরাজয় বরণ করে নিল, আর খেলতে চাইলোনা, যদিচ মানকড় ওদলে ছিলেন।

সেমি-ফাইনালে যখন আমরা অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশ বম্বের কাছে এক ইনিংস ও ১৯৯ রানে হারলাম, আমাদের পক্ষে বরমাল্য সি কে-রই, তাঁর ৫২ রান হল আমাদের দ্বিতীয় ইনিংসে সর্বাধিক ব্যক্তিগত রান। তাছাড়া ওই বয়সেও তিনি ২৬ ওভার বল করে ৯২ রানে তিনটি উইকেট নিলেন। এমন খেলার কাছে শ্রদ্ধাভরে কার না মাথা নিচু হবে, সুদীর্ঘ কাল সি কে-ই ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের অপরনাম। জীবনের ও শেষ খেলাটিতে তিনি ভারতীয় ক্রিকেটকে উপযুক্ত বিদায় উপহার দিয়েছিলেন।

আমি রঞ্জিট্রফি থেকে বিদায় নিই পরের বছর আমার রাজ্যদলের হয়ে খেলে। আমার জীবনের বিদায়ী রঞ্জিট্রফি খেলাটি ইন্দোরে যশোবন্ত ক্লাবের মাঠে। প্রতিযোগিতামূলক ব্যাট ও প্যাড যদি আমাকে অন্য কোথাও

ছাড়তে হত, বাকি জীবন অশান্তি ভোগ করতাম। অবশ্য এবার আর মধ্য-ভারত দলে নেই। মধ্যভারত উঠে গিয়ে এখন নতুন করে গড়া মধ্যপ্রদেশ। বিধির বিধানে আগের বছর খেলেছি উত্তরপ্রদেশের হয়ে মধ্যভারতের বিরুদ্ধে। এবার মধ্যপ্রদেশের হয়ে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে। সারভাতে অসুস্থ, তাই মধ্যপ্রদেশ দল পরিচালনার ভার আমাকেই নিতে হয়েছে, আর উত্তরপ্রদেশ দলের অধিনায়ক সি, এস নাইডু। আমি ও সি, এস একসঙ্গে একই দলে ক্রিকেট খেলা শুরু করি, একই সঙ্গে টেষ্ট দলে প্রবেশাধিকার পাই, একই সফরে প্রথম ইংল্যাণ্ডে খেলি, রঞ্জিট্রফির খেলাও একই সঙ্গে শুরু করি ও দীর্ঘ দিন একই দলে খেলি, জীবনের শেষ ক্রিকেট সংগ্রামে সেই সি, এস ও আমি পরস্পর প্রতিপক্ষ সেনাপতি। এর নাম দৈবের খেলা।

প্রথম ইনিংসের রানের ভিত্তিতে আমরা পরাজিত হই, আমার নিজের রান হয় ১৬ ও ৩৩। হঠাৎ আবার জীবনের শেষ খেলায় বোলার হিসেবে সার্থকতা লাভ করে বিশেষ আনন্দ পেয়েছিলাম। আমার বোলিং-এর হিসেব ছিল ২১-৩-৬৫-৩। জীবনভোর ব্যাটিং-এ সার্থকতা লাভ করেও মনের মধ্যে একটা শূন্যতা আমাকে পীড়া দিয়েছে, তা হল বোলার মুশতাখের উপবাসজনিত মৃত্যু। নইলে চৌকষ ক্রিকেটার বলতে যা বোঝায় আমার স্থান তো তাদের দলেই হওয়ার কথা ছিল। ভারতের প্রকৃত চৌকষ ক্রিকেটারের সংখ্যা উপেক্ষার নয়, সি, কে, অমরনাথ, হাজারে, ভিনুমানকড়, এবং আরো অনেকে ব্যাটে-বলে সমান পারদর্শী। পুরানো যুগের রোড্‌স ও ম্যাকর্টনি-জাতীয় চৌকষ খেলোয়াড় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালে কীথ মিলার, ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ও গ্যারফিল্ড সোবার্সের মধ্যে মহান চৌকষ খেলোয়াড়ের নবজন্ম ঘটেছে।

বোলার হিসেবেই আমি ক্রিকেট জীবন শুরু করেছিলাম, এবং আমার সবচেয়ে গর্বের স্মৃতিচিহ্ন বোলিং-এর জন্য হব্‌স-এর কছে থেকে পাওয়া পুরস্কার-উপহার। যখনি আমাকে বোলিং-এর সুযোগ দেওয়া হয়েছে, আমি সঠিক লেংগথ রক্ষা করেই বোলিং করেছি এবং রানও বেশি দিইনি। রঞ্জিট্রফিতে আমি মোট ৫৮টি উইকেট পেয়েছি, গড়ে রান দিয়েছি ২৯.৮৭. দেশে ও বিদেশে প্রথম শ্রেণীর খেলায় আমার সংগৃহীত উইকেটের সংখ্যা ৮৮, উইকেট পিছু রান দিয়েছি ৩৬.১৪।

তবু সব কিছু মিলিয়ে দেখতে গেলে আমি পরম পরিতৃপ্তি নিয়েই

ভারতের জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানশিপ থেকে অবসর গ্রহণ করতে পেরেছিলাম। এই প্রতিযোগিতায় আমি সবচেয়ে বেশি ইনিংস খেলেছি, মোট ১০৮টি, আর সর্বসাকুল্যে রান করেছি ৫০৩৩, আমার চেয়ে বেশি রান করেছেন বিজয় হাজারে—১০৩ ইনিংসে ৬৩১২ রান। তাছাড়া সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ক্যাচ—৬৩—আমিই নিয়েছি। আর বিদেশী দলের বিরুদ্ধে খেলা ও টেষ্ট ম্যাচ সমেত মোট রান দাঁড়ায় ১০,৮৬৩, ইনিংস পিছু গড়ে ৩৭.৭১।

অবসর গ্রহণের পর আমি প্রদর্শনী ও সৎউদ্দেশ্যমূলক চ্যারিটি ম্যাচ খেলে বেড়িয়েছি ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে। আমার শেষ সেঞ্চুরী ১৯৬০ সালে ভালি শীল্ড ফাইনালে, ইন্দোর খৃষ্টান কলেজের বিরুদ্ধে হোলকার কলেজের হয়ে খেলছিলাম। একটা ছোট হাতলের ব্যাট নিয়ে নেমেছি, খেলা শুরুর অল্প পরে ক্যাচ তুললাম। অবশ্য সে ক্যাচ ধরতে পারলো না ওরা। তবে একজনের শ্লেষাত্মক মন্তব্য কানে যেতেই মনে ব্যথা পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে সংকল্প দৃঢ় করে নতুন প্রেরণা নিয়ে ব্যাট ধরলাম। ফলে সেদিনের খেলা হল আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলা। ১১৬ করে দলের জয়লাভের নিমিত্ত হলাম।

অনেক টেষ্ট ম্যাচে আমি খেলেছি, কিন্তু যেদিন প্রথম টেষ্টের টুপি মাথায় পরেছি সেই থেকে দর্শক হিসেবে টেষ্ট ম্যাচ দেখার আনন্দ উপভোগ আর সম্ভব হয়নি। নিজের ক্রিকেট ব্যাগে বরাবরের মত তালা পড়তেই আগ্রহ জাগলো আমাদের তরুণ ক্রিকেটারদের টেষ্ট ম্যাচে খেলতে দেখবো। ইন্দোর থেকে বোম্বাই নিকটতম টেষ্ট কেন্দ্র। তাই আমার এককালের সহখেলোয়াড় তথা ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক কেকি তারাপোরকে চিঠি লিখলাম। মাইক স্মিথ পরিচালিত ইংল্যাণ্ডের টেষ্ট ম্যাচটি (১৯৩৬) সালে দেখবার জন্য একখানি কমপ্লিমেণ্টারি কার্ডের জন্য অনুরোধ জানালাম। বিশ্বাস করুন, এতখানি মানসিক আঘাত জীবনে পাইনি। তারাপোরের কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেলাম। অত্যন্ত দুঃখিত, কমপ্লিমেণ্টারী কার্ড দেওয়া যাবে না। যে সি, সি, আই-তে অজস্রবার খেলেছি, যাদের অর্থকোষ স্ফীত হয়েছে আমার খেলার আকর্ষণে, তাদের কাছ থেকে এই ব্যবহার আমাকে মর্মাহত করলো। ব্যাপারটা আমি ছেড়ে দিলাম না, দিল্লী ও বোম্বাইতে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের গোচরে আনলাম, খবরটি জেনে সকলে বিস্মিত হলেন। অপর দিকের ব্যবহার দেখুন। এম সি সি আমাকে বিনাশুল্কের আজীবন সদস্য করে

নিয়েছে। আর আমার স্বদেশের এক প্রধান ও প্রাচীন ক্লাব একটি টেষ্ট ম্যাচ দেখতে দেবার অনুরোধ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করলো। শুনেছি বর্তমানে ওদের সুবুদ্ধি হয়েছে, নতুন ব্যবস্থায় যে কোন টেষ্ট খেলোয়াড়কে বিনা পয়সায় টেষ্ট ম্যাচ দেখতে দেওয়া হয়।

আটাশ

বিদায় অভিবাদন

পরবর্তী দুই মরশুমে দুটি বিদেশী দল ভারত সফর করেছে। প্রথমে এম সি সি, তারপরে পাকিস্তান! কিন্তু এর আগে ১৯৫৩-৫৪ সালে কোন সরকারী সফরের ব্যবস্থা ছিলনা বলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আবার ডাকোয়ার্থকে ধরে একটি শক্তিশালী পাঁচমিশেলী দলের সফর ঠিক করে ফেললো, বিশেষ করে ডাকোয়ার্থ এই ব্যাপারে এতদিন একজন পাকা "অধিকারী" হয়ে উঠেছেন।

ডাকোয়ার্থের এই তৃতীয় দলেও অধিনায়ক জনৈক উইকেটকীপার। অস্ট্রেলিয়ার বেন কর্ণেট। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই সফরকারী দলটির নামকরণ হল সিলভার জুবিলি ওভারসীজ ক্রিকেট টীম (সংক্ষেপে এস জে ও সি) অর্থাৎ রজত জয়ন্তী বিদেশী ক্রিকেট দল।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল এই উপলক্ষ্যে সর্বভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে আমি পুনর্জীবন পেলাম। অথচ এর আগে তিনটি সরকারী টেষ্ট সীরিজে আমাকে বিস্মৃতির গহ্বরে ফেলে রাখা হয়েছিল, ইংল্যাণ্ড ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত।

লক্ষ্মৌর প্রথম "টেষ্টের" নির্বাচনে যখন আমার নাম ঘোষিত হল, সংবাদ-পত্রগুলিতে দেখা গেল কিছুটা বিস্ময়ের ভাব। কারণ সরকারী টেষ্টগুলিতে খেলবার সুযোগ আমাকে দেওয়া হয়নি। প্রথম টেষ্টের ঠিক আগে এলাহাবাদের খেলায় দুবারই আমি ভাল ব্যাট করেছিলাম বলেই "টেষ্টে" আমার নির্বাচন, এমন মন্তব্য ছিল সংবাদপত্রে। তবে আমার ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে

তাদের উক্তি ছিল নির্ভুল। আরও মজার ব্যাপার ঘটলো। ছাত্রবিক্ষোভ উপলক্ষ্যে যখন প্রথম "টেষ্ট' লক্ষ্ণৌর পরিবর্তে দিল্লীতে খেলা স্থির হল, নতুন করে দল নির্বাচন করা হল এবং এবার আমি বাদ পড়লাম। যখন পঞ্চম তথা চূড়ান্ত টেষ্ট লক্ষ্ণৌতে খেলা হল, আমি আমার দলভুক্ত হলাম।

এস জে, ও সি দলের সফর উপলক্ষ্যে আমি জীবনে প্রথম বিদেশী দলের বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্বমূলক দলের অধিনায়ক হতে পেরেছিলাম। জানিনা সি কে অবসর গ্রহণ করার ফলে হোলকার দলে আমার অধিনায়কত্ব লাভেরই ফলশ্রুতি এটি কিনা।

বস্তুত এস জে ও সি-র বিরুদ্ধে তিনটি খেলায় আমি অধিনায়ক হয়েছিলাম. আহমেদাবাদের ভারতীয় একাদশের খেলায় আমি প্রথম অধিনায়ক নির্বাচিত হলাম। পরবর্তী খেলায় হোলকার দলের বিরুদ্ধে আমিই অধিনায়ক। তৃতীয় ঘটনা হল লক্ষ্ণৌ "টেষ্টে" অধিনায়ক দাতুফাদকার আহত অবস্থায় খেলতে না পারার ফলে দেড় দিন কাল আমাকেই দল পরিচালনা করতে হয়েছিল, ফলে জীবনের শেষে বড় খেলায় সাময়িকভাবে হলেও "টেষ্ট" খেলার অধিনায়কত্ব জুটে গেল বরাতে। ওই বিদেশী দলের বিরুদ্ধে সব কটি খেলায়, বিশেষ করে লক্ষ্ণৌতে আমি ভালো খেলা সত্ত্বেও পরবর্তী সরকারী বা বেসরকারী কোন খেলাতেই আর আমি আহ্বান পাইনি। কাজেই আমার ধারণা হয়েছে যে আহমেদাবাদের খেলায় অধিনায়ক পদ আমাকে সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবেই দেওয়া হয়েছিল। আর এতদিন পরে "টেষ্ট" খেলার জন্য লক্ষ্ণৌতে আহ্বান ছিল বিদায়ী উপহার।

প্রথম দুটি "টেষ্ট" উম্রিগড়ের নেতৃত্বে খেলা হবার পরবর্তী তিনটি টেষ্টে কেন যে পৃথক পৃথক তিনজনকে অধিনায়ক করা হয়েছিল তার জবাব আজও কেউই খুঁজে পায়নি। উম্রিগড় দুটি "টেষ্টে" দক্ষভাবে দল চালনা করা সত্ত্বেও কলকাতার তৃতীয় টেস্টে অধিনায়ক পদে হঠাৎ এনে বসানো হল হেমু অধিকারীকে। মাদ্রাজের পরবর্তী টেস্টে সে মুকুট চালান করে দেওয়া হল গোলাম আহমেদের মাথায়, পঞ্চম "টেষ্টে" তা পেলেন দাতু ফাদকার।

ওই সময় ও পরবর্তী বেশ কয়েক বছর ভারতের ক্রিকেট অধিনায়ক উম্রিগড় এবং সে পদে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে অধিকারী, গোলাম আহমেদ ও ফাদকারকে এক একটি "টেষ্টে" অধিনায়ক নিয়োগ করা একান্তই অর্থহীন। সমগ্র সীরিজটিকে অধিনায়ক নির্বাচনের

জন্য পরীক্ষা হিসেবে ব্যবহার করা হাস্যকর, কারণ পরবর্তী ঘটনাবলীতে প্রমাণ হয়েছে যে টেস্ট দলে ওই তিনজনের মধ্যে কারোবই নির্বাচন তখন আর নিশ্চিন্ত নয় এবং সেই জন্যই তাদের অধিনায়ক নিয়োগ করার সত্যি করে উদ্দেশ্য থাকতে পারে না, অবশ্য অনেক বিরূপ পরিবেশ সত্ত্বেও গোলাম আহমেদ বার কয়েক অধিনায়ক পদে নির্বাচিত হন, কিন্তু ১৯৫৮-৫৯-এ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের সময় বিরক্ত হয়ে তিনি পদত্যাগ করেন এবং পরের ম্যাচে উম্রিগড়ও অধিনায়ক পদে ইস্তফা দেন। এস-জে ও সি দলের বিরুদ্ধে যে চারজন অধিনায়কত্ব করেছিলেন পরবর্তী বছরে পাকিস্তান সফরে তাদের কারো দাবিই বিবেচিত হয়নি, সে সফরে অধিনায়ক হন ভিনু মানকড়। অথচ নানা কারণে ভিনুকে এস জে ওসি'র বিরুদ্ধে একটির বেশি ম্যাচ খেলতে ডাকা হয়নি।

অধিনায়কের বেলায় যাই করা হয়ে থাক না কেন এস জে ও সি'র বিরুদ্ধে খেলোয়াড় নির্বাচনে পাকিস্তান সফরের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছিল, পাঁচটি "টেষ্টে" ২৬ জন খেলোয়াড়কে ডাকা হয়েছিল কেন? আমি, অধিকারী এবং আরো ১১ জন একটি মাত্র টেস্টে নির্বাচিত হয়েছিলাম, ফাদকার দুটিতে, রামচাঁদ, সুভাষগুপ্তে ও উম্রিগড় পাঁচটিতেই খেলেছিলেন।

এস জে ও সি বা তৃতীয় কমনওয়েলথ দলে আকর্ষণীয় খেলোয়াড়ের সমাবেশ ঘটেছিল। ছিলেন ওরেল, রেজ সিমসন, পিটার লোডার, ম্যাম লক্সটন, সুব্বা রো, পি এ গিব, এ জে ওয়াটকিনস ও সোনি রামাধীন, তা সত্ত্বেও খেলায় সে দল বিশেষ সার্থকতা অর্জন করেনি, কারণ অধিকাংশ খেলাতেই দলের অনেকে অনুপস্থিত। ওরেল ও সিমসন খুবই ভালো খেলছিলেন, কিন্তু সফর শেষ না হতেই তাঁদের দেশে ফিরে যেতে হয়, সেই সঙ্গে রামাধীনও যান, কারণ তখন এম সি সি'র ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর আসন্ন। তবে রামাধীন তাঁর সুনাম রক্ষা করতে পারেন নি। দুটি "টেস্ট" খেলে একটিও উইকেট পাননি। বরং রামাধীনের বদলি যিনি এলেন অস্ট্রেলিয়ার দুর্বোধ্য কায়দার বোলার জ্যাক আইভার্সল, তিনটি "টেস্ট" খেলাতেই তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, উইকেট পিছু ১৮·১৭ রান দিয়ে মোট ১৭টি উইকেট পেয়েছিলেন এবং বোলিং-এর ক্রমতালিকায় সবার উপরে স্থান পেয়েছিলেন।

একটি মাত্র "টেষ্টে" নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও এস জে-ও সি'র বিরুদ্ধে আরও তিনটি ম্যাচ খেলবার সুযোগ আমার হয়েছিল। আহমেদাবাদে আমি সর্ব-

ভারতীয় একাদশের অধিনায়ক হয়েছিলাম। সে খেলায় ওয়েলের ব্যাটিং দেখে অপূর্ব আনন্দ লাভ করেছিলাম। কিন্তু নিজস্ব ১৪৩ রান করে ওয়েল যখন চতুর্থ উইকেট হিসেবে দলের ২১৬ রানের মাথায় আউট হলেন, তারপর বাকী সবাই মিলে মাত্র ৯৯ রান যোগ হয়। আমার দলের জয়লাভে আমার নিজস্ব অবদান ছিল স্বকীয়তাভরা ৫৭ ও ৩১ রান মাত্র। তবে জয়লাভের মুখ্য কৃতিত্ব ছিল জেমু প্যাটেল (১৫১ রানে ১০ উইঃ) ও সুভাষ গুপ্তের (১৬৯ রানে ৮ উইঃ)।

পরবর্তী যে খেলায় আমি অংশ গ্রহণ করি সেটি আমার নিজস্ব ইন্দোর মাঠে হোলকার দলের হয়ে। এস জে ও সি দলের এই পঞ্চম খেলাতে সিমসনের ভারতের মাটিতে প্রথম অবতরণ, ইনিংস সূচনা করে অনবদ্য কৌশলে তিনি প্রথম দিনে মধ্যাহ্ন-ভোজের আগেই নিজস্ব ১২৫ রান করেন। বিদেশীদল পাঁচ উইকেটে ৪১৭ রান তুলে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। হোলকার দলের ২১৩ রান উঠতেই যখন আটটি উইকেট পড়ে যায় মনে হয়েছিল সফরে এস জে ও সি'র প্রথম জয়লাভ বুঝি ঘটেই গেল। কিন্তু তারপর জাগডেল ও ধানওয়াড়ে মিলে ১১৮ মিনিটে ১৩০ রান যোগ করে ফলো-অন বাঁচিয়ে দিলেন, পরাজয়ও এড়ানো সম্ভব হল।

সর্ব ভারতীয় একাদশের দ্বিতীয় খেলাটি হয় নাগপুরে। আমি এবং ধানওয়াড়ে দুজনেই সে খেলায় ছিলাম। দ্বিতীয় ইনিংসে ধানওয়াড়ের লেগ স্পিন ও গুগলি বল বিপর্যয় ঘটায় (৪২ রানে ৬ উইঃ) এবং এস, জে ও, সি চার উইকেটে হেরে যায়। তা সত্ত্বেও প্রথম ইনিংসে ওদের ব্যাটিং দেখে লোকে আনন্দ পেয়েছিল। সিম্পসন (৯৭) ও ওরেল (১৬৫) তৃতীয় উইকেটে জুড়ির খেলায় ১১৪ মিনিটে ১৬৬ রান যোগ করেন, তার মধ্যে ১২২ রান হয় মধ্যাহ্নভোজের পূর্ববর্তী এক ঘণ্টায়; ওরেল শুধু বাউণ্ডারি মেরেই শতরান তুলেছিলেন। কিন্তু এই দুজনের পরবর্তী সর্বোচ্চ রান ব্যারিকের ১৬। পলি উম্রিগড়ের নেতৃত্বে আমাদের দলের সকলেই ভালো ব্যাটিং করেন; ফলে আমরা ৪৫ রানে এগিয়ে থাকি, অবশ্য অসুস্থতার জন্য আমি ব্যাটিং করতে পারিনি।

লক্ষ্ণৌতে পঞ্চম 'টেষ্টে'র জন্য নির্বাচিত খেলোয়াড় দলে আমার নাম দেখে আমি বরং বিস্মিতই হয়েছিলাম। ফাদকার অধিনায়ক হয়েছেন দেখে আমার আনন্দ হয়েছিল। দুঃখ পেয়েছিলাম এই ভেবে যে ফাদকার যথাসময়ে তাঁর

প্রাপ্য সম্মান লাভ করেননি। আমার বরাবরই মনে হয়েছে হাজারের পর দাতুরই ভারতের ক্রিকেট অধিনায়ক হওয়া উচিত ছিল। তীব্র ব্যক্তিত্ব ছিলনা ফাদকারে'র, কিন্তু অমন সুভদ্র ক্রিকেটার দুর্লভ, আর ক্রিকেট সম্পর্কে জ্ঞানে কারো চেয়েও কম ছিলেন না। মাত্র এক বার বেসরকারী টেষ্ট দল পরিচালনার সুযোগ পেয়ে যেভাবে তিনি তাঁর কর্তব্য করেছিলেন, ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে থাকার যোগ্য। কিন্তু সার্থকতা সত্ত্বেও আর একবার সুযোগ দেওয়া হয়নি ফাদকারকে। তাই ওই সান্ত্বনা পুরস্কারটি একযোগে আঘাত ও অপমান হয়ে বিঁধেছে তাঁকে।

লক্ষ্নৌ পৌঁছে দেখলাম আকাশ মেঘে ভরা। সকালে ক পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় মাঠ পঙ্ক কুণ্ডে পরিণত। ম্যাচ শুরু হবার আগের দিন বিকেলে প্রথম দিন কোন খেলা হবে না। খেলা একদিন বাড়াবার প্রস্তাব আইনে নাকচ হয়ে গেল। ভারতীয় দল তখন ২—১ ম্যাচে এগিয়ে আছে, খেলা ড্র হলে আমাদের কোন মাথাব্যথা থাকার কথা নয়। জেতার চেষ্টা করা এস-জে-ও-সি'র স্বার্থ। বেসরকারী 'টেষ্ট' হলে কি হয়, দেশ জোড়া মনোভাব তখন এমন, যেন এই খেলার সঙ্গে জাতির মানসম্মানের প্রশ্ন জড়িত। আমি নিজে কিন্তু বুঝি যে সরকারী টেষ্টেও যার মান সম্মানের প্রশ্ন জড়িত থাকে তা ক্রিকেটের এবং ক্রিকেটার মাত্রেরই উচিত সেই সম্মান রক্ষার জন্য যথাসাধ্য করা। উইজডেনে পর্যন্ত এস-জে-ও-সি'র সীরিজ বেসরকারী 'টেষ্ট' আখ্যায় পূর্ণ বিবরণসহ প্রকাশিত হতে দেখে আমি বিস্ময়বোধ করেছি।

লক্ষ্নৌ ম্যাচের কথায় ফিরে আসি। দুঃসংবাদ যে গোলাম আহমেদ মাদ্রাজ 'টেষ্টে' অধিনায়ক পদের মর্যাদা রক্ষা করে ৯৩ রানে ১২টি উইকেট নিয়েছিলেন, তিনি অসুস্থতার জন্য আসতে পারছেন না, তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করছেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকষ খেলোয়াড় প্রকাশ ভাণ্ডারী।

দ্বিতীয় দিন ৪০ মিনিট দেরিতে খেলা শুরু হল। টসে জিতে ফাদকার, পঙ্কজ রায় ও 'টেষ্টে' নবাগত গুজরাটের পি এল পাঞ্জাবীকে গোমতী মাঠের সবুজ পাটের ম্যাটিং-এ ইনিংস সূচনা করতে পাঠালেন। রায় তিন রান হতেই আউট। আমি এল পাঞ্জাবীর সঙ্গে যোগ দিলাম। আমি স্বকীয় ভঙ্গিতে খেলে দশ হাজার দর্শকের অভিনন্দন পাচ্ছি, পাঞ্জাবীও সুন্দর সহযোগিতা দিচ্ছেন, হু হু করে রান উঠছে, আমাদের জুড়ি শত রান পূর্ণ করলো বলে। কিন্তু বোর্ডে মোট শতরান দেখা গেলেও জুড়ির রান তখন

৯৭, এমন সময় আমি রান আউট হয়ে গেলাম। লোভার ও মার্সাল ফাস্ট বল ছাড়ছিলেন, ব্যারী ও আইভারসনের বোলিং-এ প্রভূত চাতুরী। তা সত্বেও দিন শেষে ভারতীয় দলের রান উঠলো তিন উইকেটে ২১৪। পরদিন পাঞ্জাবী নিজস্ব শত রান পূর্ণ করলেন। সর্ব ভারতীয় ক্রিকেটে নবাগত এই পাঞ্জাবী যে মনঃসংযোগ ও স্থিরপ্রজ্ঞা নিয়ে পাঁচঘণ্টা উইকেট আগলে রান তুলেছেন, তা যে কোন অভিজ্ঞ টেষ্ট খেলোয়াড়ের ঈর্ষার উদ্রেক করতে পারে।

উম্রিগড় দ্রুত রান করে নিজস্ব ৮৭ তুললেন, ৩২১ রানে পঞ্চম উইকেট পড়তে যোগ দিলেন ফাদকার এবং শুরু থেকেই পিটিয়ে খেলতে লাগলেন। লম্পটনের একটা ইনস্যুইঙ্গারে চিবুকে আঘাত পাওয়া সত্বেও ফাদকার সমান তালে খেলে চললেন। তার খেলা সম্পর্কে সংবাদপত্র পরদিন লিখলো, 'ফাদকারের খেলায় সূক্ষ্ম শিল্প সৌকর্য ও সাহসিকতা আগের দিনের মুশতাকের খেলাকেও ম্লান করে দিয়েছিল।' নিজে আউট হয়ে গেলে প্রতিরোধের আশা থাকবে না বুঝতে পেরে ফাদকার নিজেই বোলারদের সঙ্গে মোকাবিলা করে চললেন এবং দলের রান ৪১৬ পর্যন্ত টেনে নিয়ে তারপর আইভার্সনের বলে বোল্ড হলেন, যদিচ উইকেটকীপার যোশীর কাছ থেকে শেষ জুড়িতে তিনি প্রশংসনীয় সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। তাঁর নিজস্ব রান হল ৬৩, ইনিংস শেষ হতেই ফাদকারকে হাসপাতালে পাঠানো হল, পরীক্ষায় জানা গেল তার হাড় ফেটে গেছে. খেলতে পারবেন না। দল পরিচালনার ভার আমার উপর ন্যস্ত হল।

এস, জে, ও, সি'র দু উইকেটে ৬৫ রান নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু হল। আমার দলের আক্রমণ শক্তি সীমিত বলে নিজেই বল নিলাম, অবশ্য অধিনায়কত্ব করার সুযোগ নিয়ে বোলিং করার অতৃপ্ত আকাঙ্খা মিটাতে চাইলামও বলা চলে। যাই হোক দুর্ভেদ্য ওয়াটকিন্সের উইকেট যখন পেলাম, তখন আমার হিসেব ১৯-১০-২৬-১। মিউএলমান ধ্রুপদী ব্যাটিং-এ ১৩১ রান করলে, দিন শেষে ওদের রান হল ছ উইকেটে ৩১৫। পরের দিন খেলা শেষ। ফাদকার এসে যোগ দিলেন। প্রথম দিকে আক্রমণের দায়িত্ব পালন করতে না পারার ত্রুটি সম্পূর্ণরূপে পুরিয়ে নিলেন তিনি, মাত্র ৩০ রান যোগ হতেই এস, জে, ও, সি'র ইনিংস শেষ করে দিলেন। আট রানে তিন উইকেট নিলেন পাঁচ ওভারের বোলিং-এ।

দ্বিতীয় ইনিংসে খুব মন্থর গতিতে ৪৪ রান করে পাঞ্জাবী আউট হতে আমি পঙ্কজ রায়ের সঙ্গে যোগ দিলাম। রায় বীরদর্পে স্লো বোলার ব্যারী ও ব্যারিকের বলে ব্যাট ও ড্রাইভ মেরে চললেন, রান করলেন ৫৮, আমাদের দুজনের জুড়িতে যোগ হল ৯৯। সর্ব ভারতীয় দলে স্থান পাবার যোগ্যতা তখনো আমার ছিল কিনা তার প্রমাণ হিসেবে আমি সংবাদপত্রের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি ঃ "মুশতাখ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দীপ্তিময় খেলা দেখিয়েছেন। সূক্ষ্ম সৌকর্য কাট ও গ্লান্স করেছেন, মনের সুখে মেরেছেন।" ১৮৮ রানে যখন আমি দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান আউট হলাম, আমার নিজস্ব রান তখন ৭০। ফাদকার ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

চা-পানের বিরতির পর ওদের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হল। খেলাটির মীমাংসা সুদূর পরাহত, ভারত রাবার লাভ করেছে। অতএব শেষের দিন হাল্কা চালে খেলা চললো। ওদের হয়ে ইনিংস সূচনা করলেন আইভার্সন ও ব্যারী। তিন নম্বর এলেন লোভার। সেই আনন্দময় পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ফাদকারও কেনি, রায়, পাঞ্জাবী ও সূর্যনারায়ণকে দিয়ে বোলিং করালেন।

সমগ্র সীরিজে আমাদের স্পিন বোলিং-এর সার্থকতা প্রতিষ্ঠিত হল। মোট ৭৩টি বিপক্ষ উইকেটের মধ্যে ৫০টিই গোলাম আহমেদ ও সুভাষ গুপ্তের প্রয়াসের ফল।

তবু এস জে ও সি দলের সফরে সবচেয়ে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হল কলকাতায় একটি অতিরিক্ত প্রদর্শনী খেলা, জাতীয় বন্যাত্রাণ ভাণ্ডারের সাহায্যে। অমরনাথের নেতৃত্বে চালিত প্রধান মন্ত্রীর দলের হয়ে আমি সে খেলায় অংশ নিয়েছিলাম। ক্রিকেট মনোভাব ও উৎসবের মেজাজ এই দুইএর অনবদ্য সমন্বয় ঘটেছিল খেলাটিতে, তিনদিনের ওই খেলায় প্রধান মন্ত্রীর দল চার উইকেটে জয়ী হয়েছিল।

এস জে ও সি দ্রুত রান তোলার নজীর সৃষ্টি করে। সেই অনুসরনে প্রধান মন্ত্রীর দল প্রয়াসে শেষ দিনের পাঁচঘণ্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় ৩৬৯ রান তোলার খেলা দেখে দর্শকদের মাতিয়ে দেয়। আমি ৬০ রান করি, মানকড় ৫৮, এরপর ৭৫ মিনিট বাকি তখনও আমরা ৯৩ রান পিছিয়ে, চা-পানের পরের এক ঘণ্টায় ৭৫ রান তোলার দায়, ৯২ রান করে কেনি তখন আউট হলেন তখন মাত্র ২৫ রান আর বাকি। বি ফ্রাঙ্ক শূন্য হাতে ফিরে যেতে অমর নাথ

এসে রামচাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। মার্শালের নেতিমূলক বোলিং সত্বেও খেলা শেষ হবার ১২ মিনিট আগেই রামচাঁদ একটি বাউণ্ডারী মেরে প্রধানমন্ত্রীর দলকে জিতিয়ে দিলেন। প্রথম ইনিংসে এস জে ও সি'র ৩৬২র জবাবে আমরা মাত্র ১৫০ রান করতে পেরেছিলাম। দ্বিতীয় ইনিংসে ওরা চার উইকেটে ১৫৭ তুলে ছেড়ে দিয়েছিল, সাধ্য থাকে তো জিতে নাও এই চ্যালেঞ্জ দিয়ে।

পরের বছর যখন নিউজীল্যাণ্ড সরকারীভাবে ভারত সফরে এল, একটি টেষ্টেও খেলবার আহ্বান পেলাম না আমি। ১৯৪৮—৪৯এ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সফরের পরে আমি কম করে আটটি বেসরকারী 'টেষ্টে' খেলবার জন্ত নির্বাচিত হয়েছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট ভালো খেলেছি, সংবাদপত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছি এবং দলগত সংগ্রামে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছি। কিন্তু এই যুগে যখনই সরকারী পর্যায়ের টেষ্ট খেলা হয়েছে, আমাকে ওরা অবহেলা করেছে, যেন ভুলেই গিয়েছে আমাকে। এই সুযোগ একমাত্র সরকারী পর্যায়ের টেষ্ট খেলতে পেয়েছিলাম। ১৯৫২ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে মাদ্রাজের পঞ্চম টেষ্ট। বহুবার আমি নির্বাচনী পরীক্ষা দিতে নেটে আসতে চেয়েছি, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। অবশ্য বেসরকারী 'টেষ্ট' ও অন্যান্য খেলায় আমার কৃতিত্ব যারা দেখেনি, নেটে আমি ভালো করলেও তারা চোখ বুজেই থাকতো।

যাই হোক নিউজীল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যে দুটি খেলার আমি সুযোগ পেয়েছিলাম তাতে যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছিলাম যে আমার এ খেলার এখনো যথেষ্ট তেজ অবশিষ্ট আছে। মধ্যাঞ্চলের অধিনায়ক হয়েছিলেন চাঁদু সারভাতে, তবে যে দুটি খেলায় আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম সে দুটিতেই আমি ছিলাম অধিনায়ক।

আহমেদাবাদে ভারতীয় একাদশের হয়ে অধিনায়ক আমাকেই প্রথম বোলিং করতে হয়, কারন দলের প্রতিষ্ঠিত বোলার জেমু প্যাটেল, গুপ্তে, প্রকাশ ভাণ্ডারী ও সারভাতে সবাই স্পিনবোলার, তাদের তুলনায় সুইং বোলার মুশতাখ আলির বোলিং সূচনায় বেশি অধিকার। আমি অবশ্য মাত্র ছ'ওভার পরেই ছেড়ে দি।

ওদের ফাস্ট বোলার কেভ-এর আক্রমণে আমাদের প্রথম ইনিংস অল্প রানেই শেষ হয়ে যায়। চতুর্থ ইনিংসে আমরা যখন ৩৭৩ রান পিছিয়ে, পাঞ্জাবীর সঙ্গে ব্যাটিং সূচনা করে বিনা রানেই সেলিম দুরানী আউট, এরপর নরি কণ্ট্রাক্টর এসে পাঁচ রান করার পরেই হেয়জ-এর সম্মুখীন। প্রথম বলেই

আঙুলে চোট, অতএব অপসৃত। আমি যখন পাঞ্জাবীর সাথে যোগ দিলাম স্কোর বোর্ডে মাত্র ১১ লেখা। এসেই আমি বোলিং-কে আক্রমণ করলাম। হেয়জ-এর ৪'৫ ওভারে আমরা যোগ করলাম ৪৩ রান, তারমধ্যে ৪১ই আমার ব্যাট থেকে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত হেয়জই আমাকে আউট করেন, আমার নিজের রান তখন ৬৭।

আমিও আউট হবার পর যখন নবম ব্যাটসম্যান জেমু প্যাটেল ভাণ্ডারীর সঙ্গে যোগ দিলেন, তখন বোর্ডে ৭ উইকেটে ১১০। একমাত্র কে পাওয়ার ব্যাটিং করতে বাকি, কাজেই শোচনীয় পরাজয় এড়ানো অসম্ভব এমন ধারণায় সবাই ম্রিয়মাণ। দুঘণ্টা সময় বাকি ততক্ষণ আমার দল টিকে থাকতে পারবে এমন অসম্ভব আশা আমিও পোষণ করিনি।

কিন্তু অসম্ভবই সম্ভব হল। পাকা ব্যাটসম্যানের মত উইকেট বাঁচিয়ে খেলে চললেন প্যাটেল, অন্যদিকে ভাণ্ডারী, দুজনে মিলে শত রান যোগ হয়ে গেল। নিজস্ব ৯৩ রান করে ভাণ্ডারী যখন আউট হলেন, দলের রান তখন ২১৫ উঠে গেছে, কিন্তু নৈরাশ্য কাটেনি। পাওয়ারকে সঙ্গে নিয়ে সে নৈরাশ্যের পর্দা পাতলা করে দিলেন প্যাটেল, আর পাওয়ার আউট হতে ফিরে আবার মাঠে নামলেন নরি কণ্ট্রাক্টর। খেলার শেষে যখন ঘোষিত হল আমাদের তখন ৯ উইকেটে ২৯২, প্যাটেল করেছেন ৬৯, কণ্ট্রাক্টার সকালের পাঁচ রানে আরেক রান যোগ করলেন। আহমাবাদের লোক নিঃশ্বাস বন্ধ করেছিল, ষ্টাম্প তোলার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে ফেটে পড়লো। এই সংগ্রামী মনোভাবই ক্রিকেটের মজা। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দিল্লী টেষ্টে গোলাম আহমেদ ও অধিকারীর দশম জুড়িতে ১০৯ রানের রেকর্ড প্রতিষ্ঠার কথা মনে পড়লো।

নিউজীল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আমার পরবর্তী খেলা কাশী বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে বোর্ড প্রেসিডেণ্ট একাদশের অধিনায়ক হিসেবে। সে খেলাও অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে আমি ৭৪ রান করেছিলাম মহীপতকে সঙ্গে নিয়ে, তৃতীয় জুড়িতে ২০২ মিনিটে ১১৮ রান যোগ করেছিলাম।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এই খেলাতেই আমাকে বিদায় অভিনন্দন জানতে হয়েছিল। মাঝখানে অস্ট্রেলিয়ান দল ১৯৫৬ সালে ভারতে যে তিনটি মাত্র টেস্ট খেলে গেল, তার বাইরে বিদেশী দলের প্রথম ভারত সফর যখন হল, ততদিনে আমি রঞ্জিট্রফি থেকেও অবসর ঘোষণা করেছি।

ঊনত্রিশ

বৈচিত্র্যময় চিত্রপট

আমার ক্রিকেট খেলার জীবনে যবনিকা নেমে এসেছে, আর আমার স্মৃতিচারনেরও শেষ অধ্যায়ে এসে পৌঁছে গেছি, অজস্র অতীত কথা আর ভবিষ্যৎ স্বপ্ন আমার মনে এসে ভিড় করছে।

ক্রিকেট তো খেলা মাত্র নয়; ক্রিকেট চরিত্রের বিশিষ্ট বিধান, জীবনদর্শন ও সৌভ্রাতের সূত্র। দেশে বা বিদেশে যেখানে ক্রিকেট খেলেছি, গভীর স্নেহ প্রীতিভালোবাসা সবার কাছ থেকেই পেয়েছি। প্রথম ইংল্যাণ্ড সফরে আমি তখনও বালকমাত্র, কিশোর ও তরুণ ক্রিকেট উৎসাহীদের সঙ্গে প্রবীন ক্রিকেট রসিকরা আমাকে ঘিরে ধরেছে যেখানে গিয়েছি সেখানেই। দ্বিতীয়বারের সফরে আমি খেলার কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি, তবু পুরাণো পরিচিতরা এসেছেন, একত্রে স্মৃতিরোমন্থন করেছি। ভারতের হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি, কিন্তু স্বদেশে বা বিদেশে যেখানেই অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে সহৃদয় ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছি সবারই কাছ থেকে। অগণিত ক্রিকেটার বন্ধুদের মধ্যে কীথ মিলার-এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আন্তরিক।

দুবার ইংল্যাণ্ডে ছাড়াও আমি সিংহল সফর করেছি তিনবার, সিংহলে গিয়ে একবারও মনে হয়নি যে ভারতের বাইরে এসেছি। তাছাড়া ১৯৫৭ সালে বম্বের সুন্দর ক্রিকেট ক্লাবের উদ্যোগে যে দলটি পূর্ব আফ্রিকা সফর করে, সে দলের অধিনায়ক ছিলাম আমি। পূর্ব আফ্রিকার লোকেদের ক্রিকেট খেলা তথা আমাদের দল সম্পর্কে উৎসাহ আমাকে অভিভূত করেছে। অবশ্য স্থানীয় উৎসাহীদের অধিকাংশই ছিল প্রবাসী ভারতীয়। আমার সঙ্গে সে দলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জেমু প্যাটেল, নরি কণ্ট্রাক্টার, নয়ালচাঁদ, ঘোড়পড়ে, কেনি, তামানহে ও আমরোলিওয়ালা, পরে সে দলে পঙ্কজ রায় এবং ভিনু মানকড়ও যোগ দেন।

কেনিয়ার নাইরেবি, কাম্পালা দার-এস-সালাম এবং টাঙ্গানায়িকা ও জাঞ্জিবারের—যেখানেই গিয়েছি সেখানেই চূড়ান্ত আতিথেয়তা ও বিপুল

অভিনন্দন লাভ করেছি। তখন পর্যন্ত ওরা ক্রিকেটের চেয়ে জয়লাভকে বড় করে দেখতে শেখেনি। মনোমোহন প্রাকৃতিক দৃশ্য আর অপরিমেয় স্বাদু ও শুদ্ধ খাদ্য আমাদের স্বাস্থ্য ও আনন্দ বর্ধন করেছে এবং আমরাও দীপ্তিময় ক্রিকেট খেলে তাদের আনন্দদানে ক্রুটি করিনি।

তাছাড়া আমি ক্রিকেট খেলতে পাকিস্তানেও গিয়েছি, সঠিক বলতে হলে বলা উচিত গিয়েছি করাচীতে, দেশ বিভাগের পর যে শহর আমার ও বহুকোটি ভারতীয়ের কাছে বিদেশ বনে গিয়েছে। ১৯৫২ সালে সেখানে বন্যাত্রাণ সাহায্য-কল্পে আয়োজিত খেলায় অশংগ্রহণ করতে গিয়েছিলাম, সঙ্গে ছিলেন কীথ মিলার। দেশবিভাগের আগে পর্যন্ত করাচীর নাগরিকসহ বর্তমান পাকিস্তানের প্রতিটি অধিবাসী আমার খেলার সার্থকতায় জাতীয় শ্লাঘা বোধ করতেন। আজ আমাকে নিয়ে সে গৌরব বোধে ওদের বাধা থাকলেও আমার প্রতি প্রীতি ও হৃদ্যতার এতটুকু ঘাটতি হয়নি—এ সত্য আমি অনুভব করেছি, অবশ্য পাকিস্তানের প্রধান খেলোয়াড়দের অনেকেই এই খেলায় অংশগ্রহণ করেননি দেখে আমি বিশেষ ব্যথিত হয়েছিলাম। শুনলাম কারো গলায় ব্যথা, কারো পিঠে ব্যথা ইত্যাদি। কিন্তু কীথ মিলার পাকিস্তানের দুর্গতদের সাহায্য কল্পে অস্ট্রেলিয়া থেকে ছুটে এসেছিলেন। ওই খেলাতেই আমি প্রথম মুশতাখ মহম্মদকে দেখি এবং তার খেলার পদ্ধতি ও কৌশল দেখে আশান্বিত হই, অত্যন্ত সুখের কথা মুশতাখ মহম্মদ আমার সে আশা পুর্ণ করেছেন। ক্রিকেটের সাহায্যে অনেক সদুদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহ হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও অর্থসংগ্রহের জন্য নানা স্থানে ক্রিকেট খেলা হয়েছে।

একবার যুদ্ধ তহবিলে অর্থ সংগ্রহের খেলা উপলক্ষে জনাকয় ইন্দোর থেকে কর্ণেল নাইডুর নেতৃত্বে অমরাবতী যাচ্ছি। খাণ্ডোয়ায় গাড়ী বদল, যে গাড়িতে উঠবো কোথাও পা গলাবার জায়গা নেই। একখানা মহিলা প্রথম শ্রেণীর জনশূন্য কামরা দেখতে পেয়ে গার্ডের অনুমতি নিয়ে আমরা সেইটায় উঠলাম। ভুসাওয়াল স্টেশনে এক ফিরিঙ্গি রেলওয়ে পুলিশ সার্জেন্ট আমাদের উপর তম্বি শুরু করে দিল। কর্ণেল নাইডু তাঁকে বোঝালেন যে গভর্নরের আমন্ত্রণে আমরা চলেছি, যথাসময়ে পৌছনো দরকার এবং নিরুপায় হয়েই আমরা গার্ডের অনুমতিক্রমে মহিলা কামরায় উঠেছি। সার্জেন্ট অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বললো বাহানা রেখে দাও, বে-আইনি ভ্রমণের জন্য তোমাদের সবাইকে আমি গ্রেফতার করলাম। এবার নাইডুর স্বরও রূঢ়, তিনি বললেন যে আমরা যথাসময় খেলায়

পৌছতে না পারলে, তার জন্য সার্জেণ্টটিকেই দায়ী হতে হবে। লোকটা আমাদের চিনেও মাতব্বরীর সুযোগটি ছাড়ছে না। সৌভাগ্যবশত জনৈক উচ্চপদস্থ রেল অফিসার এসে পড়ায় আমরা নিরাপদে ও যথাসময়ে অমরাবতী পৌছতে পেরেছিলাম।

কলকাতার মানুষের হৃদয়ে আমার যে উচ্চাসন তাও নাকি আমি অর্জন করেছিলাম যুদ্ধ তহবিলের এক খেলায়। লর্ড টেনিসন দলের বিরুদ্ধে 'টেষ্টম্যাচে' কলকাতায় আমি সেঞ্চুরি করেছিলাম ১৯৩৭-৩৮ এ। তাতে নাকি তেমন ভাবে কলকাতায় জনচিত্ত জয় করতে পারিনি। যেমনটি নাকি পেরেছিলাম চল্লিশের প্রথমে সেই যুদ্ধ উপলক্ষ্যে খেলাটিতে। সে খেলার সামান্য রাণই করেছিলাম, বিবরণ আমার মনেই নেই। কিন্তু কলকাতার রসিকদের কাছে বহুবার শুনেছি যে নিসার যখন তীব্র গোলা ছেড়ে আক্রমণ শুরু করেছিলেন, ঘণ্টায় ৮০ মাইল বেগে বল ছুটছিল, আমি বেপরোয়া মারে তাঁর প্রথম বলই চারে পাঠিয়েছিলাম, ক্রীজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে মেরে চারের পর চার করেছিলাম।

অনেক যুদ্ধ তহবিলের খেলার মধ্যে বিশেষ স্মরণীয় চিত্রতারকারদের সহযোগিতায় চীনাযুদ্ধের সময়। কলকাতার ইডেন গার্ডেনে খেলা উপলক্ষ্যে টিকেট বিক্রি এবং সইসমেত ব্যাট নিলাম ছাড়াও অনেক সময় আমরা ঘুরে ঘুরে দর্শকদের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করেছি। এ ছাড়াও ভূমিকম্পে, ও বন্যায় ও খরায় দুর্গতদের জন্য অর্থসংগ্রহের আয়োজনে রাষ্ট্রপতির কিংবা প্রধানমন্ত্রীর দলের হয়ে খেলেছি। ১৯৪৬-এর ইংল্যাণ্ড সফরান্তে কলকাতায় ইডেনগার্ডেনে ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় দল বনাম অবশিষ্ট দলের একটি খেলায় লালা অমরনাথের অবিস্মরণীয় ইনিংস দেখেছিলাম। যতদূর মনে হয় ক্রিকেটের ওই ঐতিহাসিক মাঠে প্রথম শ্রেণীর খেলায় অত বেশি ব্যক্তিগত রান আর কেউ করতে পারেন নি এবং অমরনাথের পক্ষেও বোধ সে ২৬২ ছিল জীবনের সর্বোচ্চ রান।

এসব ছাড়াও উৎসব উপলক্ষে খেলা হয়েছে, ১৯৫৬ সালে বাঙলা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশানের রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে একটি বিদেশী দলকে কলকাতায় খেলতে ডাকা হয়। সেই সি জি হাওয়ার্ডের দলে ছিলেন টম গ্রেভেনি, বিল এডরিচ, জর্জট্রাইব, রেজ সিমসন, ক্রুস ডুলাণ্ড, ফ্রেডি ট্রুম্যান ইত্যাদি। মুখ্যমন্ত্রীর দলের সঙ্গে ওই দলের খেলায় আমি কলকাতার লোককে নিরাশ করেছিলাম। তবে সুভাষ গুপ্তে (৯৯ রানে ৫ উইঃ) ও গোলাম

আহমেদ (১০৬ রানে ৮ উইঃ) বোলিং-এর জোরে হাওয়ার্ডে শক্তিশালী দল ১৪২ রানে পরাজিত হয়েছিল।

ওই খেলা উপলক্ষ্যেই কলকাতার লোকের আমার প্রতি ভালোবাসার এক জলন্ত প্রমাণ পেয়েছিলাম। খেলার শেষে আবাসে গিয়ে আবিষ্কার করলাম হাত ঘড়িটা নেই। যতদূর মনে পড়ছিল, ঘড়িটা হাতে বাঁধবো বলে মুঠোয় করে প্যাভিলিয়ান থেকে বেরিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি ধরে ইডেন-গার্ডেনে ফিরে এসে সাজঘর ও প্যাভিলিয়ানের সর্বত্র তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোন হদিশ করতে পারলাম না। একবার প্যাভিলিয়ানের গেটে দেখতে লাগলাম সেখানে ফেলেছি কিনা, কারণ যাবার সময় গাড়িতে উঠবার আগে ওইখানের অপেক্ষমান বহুলোকের সঙ্গে করমর্দন করতে হয়েছিল। বড় খেলার যা নিয়ম, কিছু লোক তখনো জড়ো হয়ে আছে। আমি চোখ নিচু করে এদিক ওদিক দেখছি, ভিড়ের ভিতর থেকে এক যুবক এগিয়ে এসে হঠাৎ আমায় জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি হাতঘড়ি হারিয়েছেন? সঙ্গে সঙ্গে হাতের মুঠো খুলে ঘড়িটা আমার দিকে এগিয়ে দিল।

হাওয়ার্ডের দল কলকাতার পরে বম্বেতে সি সি আই সভাপতির দলকে ১৫২ রানে হারায়, গ্রেভনি ১২০ রান করেন। স্থানীয় দলে সর্বোচ্চ রান ৫৭, উম্রিগড়ের। সে ম্যাচেও আমি বিশেষ সুবিধা করতে পারিনি। কলকাতার লোকের আমার প্রতি ও আমার কলকাতা প্রতি বিশেষ পক্ষপাত থাকলেও, ভারতে ও ভারতের বাইরে যেখানেই খেলেছি, ক্রিকেট রসিক মাত্রই আমার খেলার প্রতি ও আমার প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ করেছে। কিন্তু ওই প্রীতি ও জনপ্রিয়তা আমার সহযোগী ও সঙ্গীদের ঈর্ষার উদ্রেকও করেছে। রঞ্জি ট্রফিতে হোলকার বনাম ইউ পি ম্যাচ খেলেছি ডেরাডুনে। আমি আউট হয়ে দলের অন্যান্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে বসে খেলা দেখছি। একটি ছেলে এসে আমাকে একটা লেখা চিরকুট দিয়ে গেল সেখানে এক ভদ্রলোক—সম্ভবত হাইকোর্টের জজ বসেছিলেন। তিনি অনুরোধ পাঠিয়েছেন তাঁর সন্তানদের জন্য যদি আমি স্বাক্ষর দিতে রাজি থাকি। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেলাম, পাশে একটা চেয়ারে তিনি আমায় বসালেন। ছেলেদের স্বাক্ষরগ্রন্থে সই করে দিয়েও এসে তাঁর সঙ্গে একথা ওকথা গল্প করতে লাগলাম। সফরের সময় আমার দলের কেউ কেউ উষ্মা প্রকাশ করলো। খেলা চলাকালীন অন্যত্র বসে আমি নাকি দলগত শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছি। আমি প্রতিবাদ করে বললাম যে অধিনায়ক

ছাড়া অন্য কারো অভিযোগ শুনতে আমি রাজি নই। তারপর বোঝালাম কি করে এক ভদ্রলোকের অনুরোধ উপেক্ষা করা যায়, আর তাছাড়া আমি যখন আউট হয়ে গেছি, অধিনায়কের অনুরোধ নিয়ে, ফিল্ডিং-এর ডাক না আসা পর্যন্ত, আমি মাঠের বাইরেও চলে যেতে পারি। অধিনায়ক আমাকে আশ্বস্ত করলেও মনটা খিঁচিয়েই রইল। অভিযোগকারিদের মুখের মত জবাব দিলাম পরের ইনিংসে সেঞ্চুরি করেই শুধু নয়, পর পর তিনটি রঞ্জি ম্যাচেই সেঞ্চুরি হাঁকড়িয়ে। মনে হয় অনেকের ঈর্ষাভাজন হওয়ার ফলেই আমাকে যা কিছু দুঃখ পেতে হয়েছে। খেলার শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকতেই টেষ্ট থেকে নির্বাসন, অধিনায়ক পদের দাবি প্রসঙ্গে উপেক্ষা, বিদেশ সফরে বাদ পড়া, জনপ্রিয়তার ঈর্ষাজাত অনেক মূল্য আমাকে দিতে হয়েছে। যত আনন্দ আমি জনসাধারণকে খেলা দেখিয়ে দিয়েছি, তার জন্য অর্থকরী উপহার পরবর্তী জীবনেও আমি নানা জায়গা থেকে পেয়েছি। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আমাকে বঞ্চিত করেছে। বাঙ্‌লার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশান আমার জন্য টাকা তোলার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ ম্যাচ আয়োজন করতে চেয়েছিল, কিন্তু বোর্ড তার অনুমতি দেয়নি। কারণ দেখানো হল, আমার নিজস্ব অ্যাসোসিয়েশান ইন্দোর অনুরূপ একটি ম্যাচ খেলিয়েছে। ইন্দোর ঘরোয়া অনুষ্ঠান করেছিল, সেইটেকে অজুহাত দেখিয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে আমাকে সম্মান প্রদর্শন ও অর্থোপহার ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। ক্রিকেট বোর্ডের অর্থভাণ্ডার স্ফীত হওয়ার ব্যাপারে আমার অবদান নগণ্য নয়, তার জন্য আমাকে পুরস্কৃত করতে কেন এই কার্পণ্য! বোর্ডের প্রদত্ত অর্থোপহার আমার বৃদ্ধ বয়সের পেনশানের সামিল হত, দীর্ঘকাল ক্রিকেটের সেবা করে অবসর গ্রহণের পর অভাবগ্রস্ত জীবন যাপন করতে হত না। আমি একাই যে বেনিফিট ম্যাচ চেয়েছি তা নয়; একই খেলোয়াড়কে কোন না কোন ছলনায় একাধিক বেনিফিট ম্যাচ দেওয়ার নজীর আছে। তবে বৈষম্যমূলক ব্যবহার জীবনের কোন ক্ষেত্রেই বা নেই!

বোর্ড প্রেসিডেণ্ট স্বয়ং আমাকে বিভ্রান্ত করেছেন। ভিজ্জি যখন ইউ পি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে ইউ পি'র হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেললে বেনিফিট ম্যাচ কবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি তখন বোর্ড প্রেসিডেণ্ট। আমি ইউ পির পক্ষে খেলে তাদের সেমি-ফাইনালে উঠতে সাহায্য করেছিলাম। কিন্তু ভিজি তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি বেমালুম চেপে গিয়েছেন।

অবশ্য মধ্য প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশান যতটুকুই করে থাকুক, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তবে কোনও টেষ্ট কেন্দ্রের খেলায় যত টাকা উঠতো, তার তুলনায় অর্থ সংগ্রহ যদি নগণ্য হয়েই থাকে, তাদের প্রয়াসের আন্তরিকতায় সে দান শুদ্ধ। জানুয়ারী ১৯৫০-এর সেই খেলায় অংশ গ্রহণের আমন্ত্রণে যে সব ক্রিকেটার সাড়া দিয়েছিলেন তাঁদের কাছেও আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। হাজারের নেতৃত্বে গঠিত হোলকার দলে বি বি নিম্বলকার, সারভাতে, জগদেল, নিভ সরকার, অর্জুন নাইডু, হীরালাল গায়কোয়াড়, রাজ সিং, হনুমন্ত সিং প্রভৃতি খেলেছিলেন, আমি তো সে দলে ছিলামই, ভিনু মানকড় চালিত অপর দলে ছিলেন এম কে মন্ত্রী, ডি কে গায়কোয়াড়, উম্রিগড়, সেলিম দুরানী আরো অনেকে। বিশেষ দুঃখের কথা, আমার বহু সংগ্রামের সঙ্গী ও দীর্ঘ দিনের বন্ধু অমরনাথ ইন্দোরের খেলায় অংশ গ্রহণের একাধিক অনুরোধ পত্রের কোন জবাব পর্যন্ত দেননি, অথচ তাঁর বেনিফিট ম্যাচ খেলতে আমি ইন্দোর থেকে বোম্বাই পর্যন্ত গিয়েছিলাম।

এদিক ওদিক আরো যে সব ম্যাচ খেলেছি, তার মধ্যে ১৯৫৭ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত অতীত বনাম বর্তমান দলের খেলাটি মনে পড়ছে। খেলাটি প্রতি বছর হবার প্রস্তাব ছিল, হয়নি। মনে আছে বিশেষ করে রাষ্ট্রপতির একাদশের পক্ষে ওয়াই এম চৌধুরীর উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ১২৮ রানের ইনিংস, যদিচ সে প্রতিশ্রুতি অপূর্ণই থেকে গেছে, মনে আছে ৬৩ বছর বয়সে সি কে নাইডু'র সংগ্রামী ৬০ রান।

বস্তুত আমি যে সব ক্রিকেটারকে দেখেছি, জেনেছি এবং যাঁদের সঙ্গে খেলেছি তাঁদের মধ্যে সি কে নাইডু নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ক্রিকেটের সামন্তরাজ বা মহারাজ নন, তিনি ছিলেন শাহানশা বাদশা, তিনি ছিলেন একাধারে ক্রিকেটের সৃষ্টি ও স্রষ্টা। রেকর্ড বই দিয়ে সি কে-র খেলার পরিমাপ হয় না, তাঁর সেঞ্চুরির সংখ্যা দিয়েও তাঁর মহত্বের পরিমাপ হয় না। আজকের যুগের খেলোয়াড়েরা সি কে-র খেলার ধরন কল্পনাও করতে পারবেন না। বর্তমান যুগের মত মখমলী উইকেটে খেলবার সুযোগ তিনি কমই পেয়েছেন, তাও অধিকাংশ খেলাই ছিল অগ্নিস্রাবী উইকেটে অথবা নারকেল ছোবড়ার উইকেটে। বহুবার পেস বোলারের বোলিং-এ তিনি দারুণ আঘাত পেয়েছেন, কিন্তু কখনো চিকিৎসকের সাহায্য চাননি, আহত অঙ্গে সংবাহন করার জন্য লোক ডাকেননি, নিজের হাত পর্যন্ত

বোলাননি সেখানে। সাহসী এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ অজস্র জাতির চরিত্র ও ঐতিহ্য রক্ষা করেছেন আজীবন। নাইডুর খেলা যখন তুঙ্গে তখন যদি টেষ্ট খেলা থাকতো, রেকর্ড বই ভরে যেত তাঁর কৃতিত্বে ও দুঃসাহসিকতার কাহিনীতে।

সি কে নাইডুর ক্রিকেট মনীষা ছিল সহজাত। যা কিছু শিখেছেন নিজে নিজে, বাবা-কাকার বাইরে কেউ কিছু শেখায়নি তাঁকে। তার ছিল সীমিত সম্পদ, সীমিত সুযোগ। রাজপুত্রদের মত সম্পদ ও সুযোগ যদি তিনি পেতেন, তাহলে ক্রিকেট গগনে তিনি যা দীপ্তি বিকীরণ করতে পারতেন অন্য যে কোন ভারতজাত ক্রিকেটার তাঁর কাছে ম্লান বলে প্রতিভাত হতেন।

অনেকের ধারণা সি কে নিছক পিটিয়ে খেলোয়াড় ছিলেন, কিন্তু সেটা ভুল। অফ-সাইড বল অফে মারতে যে কোন খেলোয়াড়ই পারে, লেগ সাইড বল লেগে; তাঁরা স্ট্রোক করিয়ে খেলোয়াড় নয়, রবার্টসন গ্লাসগো বলেন বল ঠেলনেওয়ালা। কিন্তু অফ-সাইড বল লেগে মারতে যথেষ্ট প্রতিভার দরকার। সি কে হয়তো কখনো-সখনো ক্রস ব্যাট চালাতেন, কিন্তু তাতে রান উঠতো ঠিকই এবং রান ওঠাই আসল কথা। প্রথম প্রথম ইংল্যাণ্ডের লোক তাঁর খেলা দেখে অসমর্থন জানিয়েছিল, অচিরে সে গুঞ্জন কলকণ্ঠ অভিনন্দনে পরিণত হয়। সি কে যখন সে দেশে টেট, গিয়ারি, মার্সার, কনস্টাণ্টাইন, অ্যালেন, ভোম, ভেরিটি ও গ্রিমেট-এর বল লেগে টেনে মারতেন আর বলটা চকিতে গিয়ে বেড়ার গায়ে ধাক্কা খেত, অথবা বেড়া টপ্‌কে মাটিতে পড়তো, আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠতো ইংরেজ দর্শক। ইংল্যাণ্ডে একটা কথা প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল! একই সময়ে যদি ভিন্ন ম্যাচে সি কে এবং ব্র্যাডম্যান খেলতে থাকেন, সি কে-র খেলা দেখতেই বেশি লোক ভিড় করবে। সি কে কখনও বোলিং-এর নির্দেশে ব্যাট চালান নি, রাজকীয় মহিমায় যথেচ্ছ ব্যাট চালিয়েছেন, বোলারের খ্যাতি ও নৈপুণ্য কিংবা পিচের দুরবস্থা গ্রাহ্য করেননি।

শিল্পসম্মত ব্যাটিং ছাড়া বোলিং-এ তাঁর কার্যকারিতা কিছু কম ছিল না, অনবদ্য লেংগথ রক্ষা করে সঠিক পথে তার বল চলতো, আর বোলিং-এর গতির বলে বলের পরিবর্তন ঘটতো। মাঠের যে কোন জায়গাই ফিল্ডিং ছিল তার একেবারে প্রথম শ্রেণীর, যদিও কাছের ফিল্ডিং-এই ছিল তার বৈশিষ্ট্য।

সব চেয়ে বড়গুণ ছিল তার গগনস্পর্শী ব্যক্তিত্ব, মাঠের মধ্যে চলাফেরায় সিংহ বিক্রম। খেলার প্রতিটি বিষয়ে তাঁর সূক্ষ্ম বিচারবোধ, নিজের কথা না ভেবে সমগ্র দলের কল্যাণ চিন্তা—এত সব গুণাবলীর জোরে সি কে নাইডু

আদর্শ অধিনায়ক হতে পেরেছিলেন। পরম আত্মসংযমী সেই পুরুষের শৃঙ্খলা ছিল কঠোর। নিজের দলের খেলোয়াড়দের মধ্যেও তিনি শৃঙ্খলা চাইতেন অনমনীয় মনোভাবে। অযোগ্য খেলোয়াড়দের তিনি সহজেই বাতিল করে দিতেন, কিন্তু কারো মধ্যে প্রতিভা থাকলে তাও তিনি অতি সহজেই ধরে ফেলতেন এবং সে প্রতিভা লালন করে পূর্ণ বিকাশে সহায়তা করতেন। সব কিছু মিলে সি কে-র মধ্যে ছিল পৌরাণিক যুগের এক মহিমময় রূপ, আজকের যুগে যা একান্তই দুর্লভ।

খেলার মাঠে বিচরণের দৃপ্ত অথচ ছন্দমধুর ভঙ্গিমায় যদি আর কেউ আমাকে মোহিত করে থাকেন, তবে তিনি ফ্র্যাঙ্কি (পরবর্তীকালে স্যর ফ্র্যাঙ্কি) ওরেল। কেবলমাত্র খেলোয়াড় হিসাবে তাঁর গুণাবলী দিয়েই তাঁর মহত্বের পরিমাপ যে হয়না, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক হিসেবে তার প্রমাণ মিলেছে। ক্রিকেটকে অনেকে মিলে এক রাজনৈতিক ঝাণ্ডা লড়াইয়ের স্তরে নামিয়ে এনেছিল, সেই ক্রিকেটের অবলুপ্ত মহিমা পুনরুদ্ধার করেছিলেন ওরেল, কারণ ক্রিকেটের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ছিল গভীর, আন্তর্জাতিক খেলাধূলার যে একটা মিথ্যা দেশপ্রেম মাথাচাড়া উঠেছে, সেই মনোভাবকে কখনো তিনি ক্রিকেটের মর্যাদা হানি করতে দেননি। ক্রিকেটে ওরেলের মহনীয় অবদান স্মরণ করেই অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে তাদের টেষ্ট খেলার প্রতীক পুরস্কারটিকে "ওরেল ট্রফি" আখ্যা দিয়েছে। খেলার জগতে এই অভূতপূর্ব সম্মান লাভ করেছেন ওরেল আপন যোগ্যতায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কর্ণধাররূপে ওরেল পরবর্তী জীবনে আর একবার ভারতে আসেন। কিন্তু তার অল্পকাল পরেই তাঁর অকাল মৃত্যুর সংবাদ সমগ্র ক্রিকেট জগৎকে মর্মান্তিক আঘাত হানে।

আরো একজন ক্রিকেটার, যার কথা বলতে আমি কখনো ক্লান্তিবোধ করিনা, এবং আনন্দ পাই, ওরেলেরই মত আকর্ষণীয় চরিত্র ও মহনীয় ব্যক্তিত্বের সেই পুরুষ কীথ মিলার, সর্বদা হাসিখুশি ও সুদর্শন। ব্যাটস-ম্যান হিসেবে তিনি ছিলেন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অনন্য। একবার হাত জমে গেলে যে কোন বোলিংকে নির্মমভাবে হত্যা করতেন তিনি। যেমন তাঁর ব্যাট ধরার ভঙ্গি, তেমনি শটের বৈচিত্র্য, বিশেষ করে উইকেটের সামনে ভর দিয়ে মারতে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। গোলার মত তীব্র গতি সম্পন্ন তাঁর বোলিং-এর লেংথ বা গতিপথ সবসময় অব্যাহত থাকতো। লিণ্ডওয়ালের সঙ্গে তাঁর

মিলনে ক্রিকেট ইতিহাসের সব চেয়ে ভয়াবহ আক্রমণের সূচনা সম্ভব হয়েছিল। স্লিপে তাঁর ফিল্ডিংও ছিল চমকপ্রদ, খুব কঠিন ক্যাচ তিনি এমন সাবলীল ভঙ্গিতে ধরতেন, সেটি যে কত কঠিন তা বোঝাই যেতনা। দুঃখের কথা আমাদের বিজয় মার্চেন্টের মত মিলারকেও ক্রিকেট কূটনীতির বলি হয়ে অকালে মরে যেতে হয়েছিল।

আর একজন ক্রিকেটার আমার মনে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত, তিনি বিজয় মার্চেন্ট। তাঁর ব্যাটিং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিতে পরিচালিত হলেও প্রভূত প্রশংসার যোগ্য। যে কোন ধরণের উইকেটে যে কোন অবস্থায় খেলবার সঠিক কৌশল ও মানসিকতা মার্চেন্টের যেমন আয়ত্তে ছিল তেমনটি আর কোন ভারতীয় ব্যাটসম্যানের ছিলনা। যখন যেমন প্রয়োজন সেইমত খেলতেন তিনি।

ক্রিকেটের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার কথা যদি ধরতে হয়, তবে অপর বিজয়ের জুড়ি নেই। বিজয় স্যামুয়েল হাজারে ব্যাটসম্যান হিসেবে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডেরই মত নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন, দলের আসন্ন ভরাডুবির মুখে তিনি ছিলেন নিশ্চিত পরিত্রাতা। কোলাপুরে প্রথম সাক্ষাতের পর থেকে বিজয় হাজারেকে আমি ভালোভাবে জেনে এসেছি, যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নিয়ে তিনি যে কোন ক্রিকেট খেলায় তাঁর কর্তব্য করতেন তার জোড়া আর কারো মধ্যে আমি পাইনি। টেষ্ট ম্যাচই হোক আর জাহাজের মধ্যে শখের খেলাই হোক, হাজারে ক্রিকেটের পূর্ণ গাম্ভীর্য বজায় রাখতেন সব অবস্থায়।

পলি উম্রিগড় সম্পর্কে কিছু না বলেও পারছি না। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ভারত সফরের সময় আমরা তাঁর প্রতিভার প্রথম পরিচয় পেয়েছিলাম। আমাদের ঠিক পরবর্তী যুগের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে এমন জোরালো মার খুব কম খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। আর দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর যুগের ক্রিকেটারদের মধ্যে এমন সবল সুগঠিত দেহও আর কারো ছিলনা, দৈহিক পটুতা তাঁর সবকিছুর মধ্যে প্রকট ছিল। অপর প্রতিভাধর পার্শী ক্রিকেটার রুসি মোদির পায়ের কাজ উম্রিগড়ের চেয়ে অনেক ভালো ও সূক্ষ্মতর ছিল এবং মারে কব্জির ব্যবহার বেশি করতেন, যার জন্য তাঁর মারগুলি দেখতে অনেক বেশি ভালো লাগতো। উম্রিগড়ের মারের শক্তি সঞ্চার হত তার দুকাঁধ থেকে, কব্জি থেকে নয়। তবু তার তেজোদৃপ্ত মারগুলি দর্শকদের মধ্যে উদ্দীপনা জাগাতো।

আরো একজন ক্রিকেটার যার সম্পর্কে আমরা অনেক আশা পোষণ করেছি, সেই ন্যাটা ব্যাটসম্যান কে এম রঙ্গনেকার আমাদের পূর্ণ অবদানে বঞ্চিত করেছেন। যেমন অনবদ্য স্ট্রোকের খেলা তেমনি দ্রুত রান তোলার মনোভাব ও দক্ষতা। একবার আমার সঙ্গে জুড়ি খেলার সময় দ্রুত রান তোলার ব্যাপারে আমাকে পিছনে ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। ভারতের একজন অগ্রগণ্য ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়ও ছিলেন ওই রঙ্গনেকার, দুনৌকায় পা দিয়ে চললেও, কোন একটিতে নিষ্ঠা সহকারে রইলেন না।

আমার প্রিয় ক্রিকেটারদের মধ্যে অমর সিং এর নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। তাঁর নিজস্ব ধরণের বোলিং-এ তিনি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠদের অন্যতম ছিলেন এবং যে কোনও বোলিং-কে এমন নির্মম ভাবে মেরে মেরে ছত্রখান করতে আমি আর কাউকে দেখিনি। কোন কোন ইংরেজ সমালোচক অমর সিংহের ব্যাট চালনায় ব্যাকরণ ভুলের অভিযোগ করেছেন, তবে তাদের ব্যাকরণ অমর সিং অগ্রাহ্য করেই ব্যাট চালিয়েছেন, বোলিং-এর মেরুদণ্ড পঙ্গু করে দিয়েছেন ও রান তুলেছেন। ১৯৪০ সালে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে অমর-সিংএর অকাল মৃত্যুতে ক্রিকেটের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। দোহাত্তা মারে অমর সিংএর পরেই এবং বেশ কাছাকাছি ছিলেন সি এস নাইডু যদিচ বোলার হিসেবেই তার মুখ্য কৃতিত্ব। রঞ্জি ট্রফিতে সবচেয়ে বেশি উইকেট (২৯৫) তিনি নিয়েছেন এবং মোট রান করেছেন ২,৫৪১।

যে সব ইংরেজ ক্রিকেটারের প্রতি ঐকান্তিক আকর্ষণ বোধ করেছি তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান ডেনিস কম্পটন। অমন রোমান্টিক ব্যক্তিত্ব আর কোন ইংরেজের মধ্যে আমি দেখিনি। ক্রিকেট তাঁর কাছে হিসেবী সঠিক পরিমাপের খেলা নয়, তাঁর খেলার মধ্যে সহজাত নৈপুণ্য ও প্রেরণাই ছিল মুখ্য।

আমার প্রিয় ক্রিকেটার প্রসঙ্গের আলোচনায় একটা কথা আমি অকপটে স্বীকার করছি যে আমার বিচারের মূল মাপকাঠি খেলা সম্পর্কে খেলোয়াড়ের দৃষ্টিভঙ্গী। আমার প্রিয় খেলোয়াড়ের খেলায় এবং ব্যক্তিত্বে সমান দীপ্তি ও মাধুর্য থাকতে হবে। খেলার মধ্যে যদি কঠোর সংগ্রাম চলে, সে কাঠিন্য তাঁর মুখমণ্ডলে ও ব্যক্তিগত আচরণে একেবারেই প্রকাশ পাবে না। তাছাড়া তিনি তরুণদের সব সময়ই অকৃপণভাবে সাহায্য করবেন ও উৎসাহ দেবেন।

আজ যদি আমাদের মধ্যে প্রাণবন্ত ক্রিকেট দুর্লভ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে যাঁরা মাঠ ও পিচ তৈরি করেন তাঁদের দোষ দেওয়া উচিত নয়, যে সব

ক্রিকেটার খেলতে নেমে কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নন, তাঁরাই প্রকৃত দোষী, তাঁদের নীতি হল, আপনা বাঁচিয়ে খেলো। সাহস আর ঝুঁকি নেবার মনোভাবের মিলনের ফলেই ক্রিকেট প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। পুরাণো যুগে ছোবড়ার ম্যাটিং উইকেট অথবা প্রাণবন্ত ঘাসের উইকেট যেখানেই খেলা হোক না কেন, বোলারদের যোগ্য প্রতিপক্ষ হবার আর স্বকীয় দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ ব্যাটসম্যানেরা পেত। ইংল্যাণ্ডের পিচগুলির মধ্যে ওভালকে আমার কিছুটা ব্যাটসম্যানের অনুকূল মনে হয়েছে, আর কোনো কোনও উইকেট মনে হয়েছে মন্থরগতি। ১৯৩৬ পর ১৯৪৬ সালের সফরে উইকেট ব্যাটসম্যানের বেশি অনুকূল মনে হয়েছিল। এর অন্যতম কারণ বোধ হয় ম্যাচ আয়োজনকারী সংস্থার আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গী, কারণ টেস্ট ম্যাচ পুরো পাঁচদিন যাতে চলে তার ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে।

লর্ডসই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট মাঠ, সমস্ত এলাকাটিকে বৃত্তাকারে ঘিরে আছে দীর্ঘ মহীরুহের সারি, কি মনোহর সে দৃশ্য, কি মহিমময় পরিবেশ। তবে পিচের বাইরেকার মাঠ—আমার যুগের ইডেন গার্ডেনের মত কোথাও দেখিনি।

যে সব ক্রিকেটারদের সঙ্গে আমি খেলেছি আর যাঁদের খেলতে দেখেছি, সংক্ষেপে তাঁদের মূল্যায়ন করার সহজ উপায় আমার নিজের পছন্দ অনুযায়ী দুটি দল গঠন করা : (১) আমার যুগের খেলোয়াড়দের নিয়ে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় দল আর (২) যে সব বিদেশীদের বিরুদ্ধে আমি খেলেছি তাঁদের নিয়ে একটি অবশিষ্ট দল :

এই কাল্পনিক দলগঠনে অপার আনন্দ, সে দল সবার মনঃপূত হবে এমন দাবি আমি করি না, কারণ আমার নিজস্ব পছন্দই নির্বাচনের মাপকাঠি। আমার নির্বাচিত ভারতীয় দলটি হবে : সি কে নাইডু (অধিনায়ক), ডি ডি হিণ্ডলেকার (উইকেট কীপার), উজির আলি, বিজয় মার্চেণ্ট, লালা অমরনাথ, বিজয় হাজারে, ভিনু মানকড়, রুসি মোদি, অমর সিং, নিসার ও সুভাষ গুপ্ত।

আমি এগার জন নির্বাচন করেছি, কিন্তু দলে দ্বাদশ ব্যক্তি একজন থাকতে হয়, যদি পাঠকবর্গ সে পদে আমাকে নির্বাচিত করতে চান, আমাকে তা প্রসন্নচিত্তে মেনে নিতেই হবে। ভক্তিফদার, দেওধর, জয়, ... ভলের মত মহান খেলোয়াড়দের প্রসঙ্গ আমি বিচার করিনি, কারণ আমি যখন তাঁদের খেলতে দেখেছি তখন তাঁরা পড়তির মুখে।

এবার অবশিষ্ট দল নির্বাচনে নামছি। অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় প্রসঙ্গে

যাঁরা ভারতে খেলেছেন তাঁদের মধ্যেই আমার বিবেচনা সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছি, কারণ অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে খেলবার সৌভাগ্যে আমি বঞ্চিত হয়েছিলাম এবং সেই কারণেই আমার নির্বাচিত দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দলে ডন ব্র্যাডম্যান অনুপস্থিত, অথচ আমার যুগে ডনই ছিলেন সমগ্র ক্রিকেট জগতের সর্ববিস্তারী মহীরুহ, বিরাটতম পুরুষ। দুর্ভাগ্য সন্দেহ নেই, অবশ্য ডনের দুর্ভাগ্য মোটেই নয়, বেচারা মুশতাখ আলি'র।

আমার নির্বাচিত দল হল: ফ্রাঙ্ক ওরেল (অধিনায়ক), ক্লাইভ ওয়ালকট (উইকেট কীপার), এম লেল্যাণ্ড, ওয়ালি হ্যামণ্ড, এভার্টন উইক্স্, লেন হাটন, জেস্টেল মেয়ার, ডেনিস কম্পটন, কীথ মিলার, এ ভি বেডসার, এইচ ভেরিটি ও ক্রম ডুলাণ্ড (দ্বাদশ ব্যক্তি)।

এখানেও আমি হবস্, সাটক্লিফ, পেইন্টার, লারউড, রাইডার, ম্যাকার্টনিকে বাদ দিয়েছি সেই একই কারণে, ওদের পড়তি খেলাই শুধু আমি দেখেছি। অস্ট্রেলিয়ার হ্যাসেটের কথা আমি ভেবেছি, কিন্তু ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত তাঁর বদলে ইংল্যাণ্ডের ন্যাটা ব্যাটসম্যান লেল্যাণ্ডকেই আমি মনোনীত করেছি।

প্রাণবন্ত ক্রিকেট যাঁরা খেলেছেন তাঁদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য কোন কৈফিয়ৎ কেউ দাবি করবেন না আমার কাছ থেকে। প্রতিযোগিতামূলক বা প্রদর্শনী খেলে যাই হোক না কেন, ক্রিকেটকে যদি বেঁচে থাকতে হয় এবং বাড়তির পথে চলতে হয়, তাকে আকর্ষনীয় হতেই হবে। খেলায় যদি দর্শকদের আনন্দ না দেওয়া যায়, তবে তা দেখতে আসবে কেন লোকে? যে সময় ও অর্থ ব্যয় করে আসবে, তাতো উশুল হওয়া চাই। তা বলে প্রাণবন্ত ক্রিকেট বলতে কেউ যেন খেলার যে কোন অবস্থায় তেড়ে গিয়ে চোখ বুজে ব্যাট হাঁকড়ানো বুঝবেন না। খেলার মধ্যে এমন অবস্থা আসে যখন মাটি কামড়ে ঠেকা দেওয়াও প্রাণবন্ত ক্রিকেট হয়ে ওঠে। তার মধ্যে প্রতি মুহূর্ত কি হয়, কি হয় উত্তেজনায় দর্শকদের শ্বাসরোধ হবে। ১৯৫৩-র রঞ্জি ফাইনালে বাঙ্‌লা দলের বোলারদের বিরুদ্ধে হীরালাল গায়কোয়াড় ও ধনওয়াড়ের দুর্জয় প্রতিরোধ ভারতীয় ক্রিকেটের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়, সেখানে প্রতিমুহূর্তে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম, ইদানীং স্যর ডোনাল্ড ব্রাডম্যান যে একটি কথা উদ্ভাবন করেছেন তার মধ্যে ক্রিকেটের প্রকৃত মূল্যায়ণ খুজে পাওয়া যাবে। তিনি বলেছেন: চরিত্র সমন্বিত ও উদ্দেশ্যপূর্ণ ক্রিকেট।

আগেই কোন সম্ভাব্য অপ্রিয় ভাষণের আশঙ্কায় মাপ চেয়ে নিচ্ছি, কারণ

এবার আমি বিদেশে ভারতীয় দলের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দুচার কথা বলবো। পঙ্কজ গুপ্তকে আমার বিশেষ কৃতী ম্যানেজার বলে মনে হয়েছে, সব সময় সব দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল, ছিল দলের প্রত্যেক সদস্য সম্পর্কে তাঁর চিন্তা। দলের যে কোন সমস্যার মোকাবিলার করার অসাধারণ যোগ্যতা তাঁর ছিল। তাছাড়া যে কোন কট্টর প্রতিপক্ষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তিনি নিজ মত প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন।

পঙ্কজদার কাজের সর্বাঙ্গীণ প্রশংসা করেও বলবো তাঁর ব্যক্তিগত দুই একটি কৃত্য আমি অনুমোদন করতে পারিনি। তাঁর সব সময় পান চিবোনোতে যাঁরা আপত্তি করতেন, আমি তাদের সাথে একমত নই। বিদেশীরা যাই বলুক না কেন, পশ্চিমী অভ্যাসমত অবিরত সিগারেট না টেনে ভারতীয় অভ্যাসমত পান চিবোনোর স্বাধীনতা অবশ্য তাঁর ছিল।

কিন্তু যে কোন সমাবেশে বা যে কোন অনুষ্ঠানে যখন তিনি একটা পা চেয়ারের ওপর তুলে দিতেন, আমাদের অনেকের চোখে তা অশালীন বলে মনে হয়েছে। অন্যেরা ব্যাপারটাতে অখুশী হচ্ছে বুঝতে পারা সত্ত্বেও ভব্যতার খাতিরে আমাদের চুপ করে থাকতে হত।

আরেকটা ব্যাপারে হয়তো আমি ছাড়া আর কেউ দুঃখবোধ করেনি, কারণ গুপ্ত সাহেবকে আমি চিরদিনই ভালোবেসেছি ও শ্রদ্ধা করেছি। ম্যানেজার হিসেবে গুপ্ত সাহেবের মর্যাদা লঙ্ঘনে কারো যখন কোন সচেতন প্রয়াস নেই, সেখানেও সে মর্যাদা প্রসঙ্গে তাঁর অতিসচেতনতা আমাকে পীড়া দিয়েছে, ইংল্যাণ্ডে দলের একটা ফোটো যখন ওঠানো হয় গুপ্ত সাহেব তাতে এককোনে দাঁড়িয়ে। মহা হট্টগোল তুলে সেই ফোটোটা বাতিল করে দিলেন তিনি, বললেন 'ফোটোর একপাশে আমি দাঁড়িয়ে, আরপাশে ফার্গি, তাতে ম্যানেজার আর মাল তদারককারী দুজনকে একই পর্যায়ে ফেলা হয়েছে'। অধিনায়ককে বলে তিনি নতুন ফোটো তোলালেন এবং নিজে সামনের সারিতে অধিনায়কের পাশে চেয়ারে বসলেন। এই ব্যবস্থাই অবশ্য হওয়া উচিত। তবে আমি মনে করি পঙ্কজ গুপ্ত পঙ্কজ গুপ্ত। সামনে দাঁড়ান বা বসুন, এককোণেই থাকুন বা সামনের সারিতে কেন্দ্রস্থলে বসুন, পঙ্কজ গুপ্তর ব্যক্তি মর্যাদা কখনই ওসবে ক্ষুণ্ণ হয় না, পঙ্কজ গুপ্ত দলের ম্যানেজার না হলেও না। আমি বুঝি ছোট হয়ে গেলাম এই চিন্তা পঙ্কজ গুপ্তর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের পক্ষে বড়ই বেমানান মনে হয়েছে আমার, অথচ মাল তদারককারীকে তিনি কোন

দিনই হেয় করেন নি, আর ফার্গিকে তো সব সময়ই 'ডিয়ার ফার্গি বলেই সম্বোধন করেছেন।

মিঃ গুপ্তর কথা আলাদা, ভারতীয় ক্রিকেট তথা ভারতীয় স্পোর্টসের ব্যাপকতম ক্ষেত্রে তাঁর ত্নুনিয়ার সর্বত্র স্পোর্টস মহলে ঘনিষ্ঠ সংযোগ। অন্যথায় একজন ভূতপূর্ব টেষ্ট খেলোয়াড়ই দলের ম্যানেজার হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। সুখের বিষয় বর্তমান যুগে কমবেশী সেই ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে।

আমার ক্রিকেট খেলা শেষ হয়েছে, আমার পুত্রস্থানীয় নতুন যুগের খেলোয়াড়দের মধ্যে আমি বেঁচে থাকতে চাই। আমাদের যুগে যা সম্ভব হয়নি, এ যুগের ভারতীয় দল ইংল্যাণ্ডে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ও ভারতের মাটিতে পরপর তিনটি রাবার লাভ করেছে। এই নতুন সার্থকতা বিরাটতর নতুন দায়িত্বও এনে দিয়েছে। এ যুগের ক্রিকেটারদের সে দায়িত্বের বোঝা বীরের মত বহন করতে হবে।

ইংরেজ সমালোচকবৃন্দ ভারতীয় ক্রিকেটারও যে বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেছেন, সে 'দকে আমি বর্তমান যুগের ক্রিকেটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যে আনন্দে আমি ক্রিকেট খেলেছি এবং খেলে বহুকে যে আনন্দ দিয়েছি তার বন্দনামূলক আমার এই স্মৃতিকথার যোগ্য সমাপ্তি হবে ১৯৩৬ সালে আমাদের ইংল্যাণ্ড সফরের সামগ্রিক মূল্যায়নে নেভিল কার্ডাসের নিম্নে বিবৃত মন্তব্য :

'ভারতীয়রা যখন উৎকৃষ্ট পর্যায়ে খেলেছেন, ক্রিকেটের সৌন্দর্য বিকাশের লক্ষ্যেই খেলেছেন তাঁরা। ইংল্যাণ্ড কি অস্ট্রেলিয়ান দল অতি দ্রুত ও বিজয়-গর্বে লক্ষ্যস্থলে পৌছবার উদ্দেশ্যে নির্মিত যন্ত্রবিশেষ। ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ভারতীয় দল যে গভীর ছাপ রেখে গেছে কোন ইংল্যাণ্ড দল বা অস্ট্রেলিয়ান দল কখনো তা পেরেছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। মাত্র তিন দিনের খেলায় ভারতীয় দল যত অনুরাগী বন্ধু অর্জন করতে পেরেছিল, তা যে আর কোন দলই পারেনি, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।'

সম্মান অর্জনের চেয়ে অধিকতর বাঞ্ছনীয় কোনই পুরস্কারই নেই জীবনের কোন প্রয়াসে। আমার বিশ্বাস আমার ক্রিকেট খেলা আমাকে সে পুরস্কার অর্জন করিয়েছে। তা যদি হয়ে থাকে তবে সার্থক হয়েছে আমার জীবন ও আমার ক্রিকেট খেলা। আমাদের মত কত ক্রিকেটার আসবে ও যাবে, কিন্তু ক্রিকেটের প্রানবন্ত ধারায় কোনোদিন ছেদ পড়বে না।

মুশতাখ আলির খেলার পরিসংখ্যান

ব্যাটিং

	ইনিংস	মোট রান	সর্বোচ্চ রান	ইনিংস প্রতি গড় রান
ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় দলের পক্ষে	৭৩	১৭৫১	১৪১	২৪.০০
ভারতে সর্বভারতীয় দলের পক্ষে	৫০	১৪৩৪	১২৯	৩০.৫১
অবশিষ্ট ভারতীয় দলের পক্ষে	৬	২০৪	৯০	৪০.৮০
ভারতীয় একাদশের পক্ষে	৬	২'০	৭৭	৪৩.৩৩
মুসলিম দলের পক্ষে	২৩	৯৮৭	১৫৭	৪২.৯১
পূর্বাঞ্চলের পক্ষে	১১	৪০৫	১০৭	৩৬.৮১
মধ্য ভারতের পক্ষে	২২	৬১২	৭৫	২৭.৮১
মধ্য প্রদেশের পক্ষে	৬	৯৭	৩৩	১৬.১৬
গুজরাটের পক্ষে	১	১৫৬	১৫৬	১৫৬.০০
হোলকারের পক্ষে	৯২	৪৩৭৭	২৩৩	৫১.৫৯
যুক্তপ্রদেশের (অধুনা উত্তর-প্রদেশ)-এর পক্ষে	৮	২১৬	১০১	৩০.৮৫
ভিজিয়ানাগ্রাম একাদশের পক্ষে	১০	১৯৪	৫৫	১৯.৪০
বিভিন্ন একাদশের পক্ষে	৬১	১৯৬৭	১০৮	৩৩.৯১
মোট	৩৬৯	১২,৬৬০	২৩৩ (ন.আ:) ১৬	৩৫.৮৬

শতরান বা সেঞ্চুরি (৩০)

রান	পক্ষে	বিপক্ষে	স্থান	সাল
১৩৫	সর্বভারতীয় দল	মাইনর কাউন্টিজ	লর্ডস	১৯৩৬
১০২	,,	সারে	ওভাল	,,
১১২	ভারত	ইংল্যাণ্ড	ম্যাঞ্চেস্টার	,,
১৪০	সর্বভারতীয় দল	লেভসন-গাওয়ার একাদশ	স্কারবরো	,,

রান	পক্ষে	বিপক্ষে	স্থান	সাল
১৩৫	মুশলিম দল	ইয়োরোপীয়ান দল	বোম্বাই	১৯৩৭-৮
১০১	সর্ব ভারতীয় দল	লর্ড টেনিসনের দল	কলকাতা	,,
১৫৭	মুশলিম দল	ইয়োরোপীয়ান দল	বোম্বাই	১৯৩৮-৯
১১০	মুশলিম দল	অবশিষ্ট দল	বোম্বাই	১৯৪০-১
১৫৬	গুজরাট	মহারাষ্ট্র	আহমেদাবাদ	,,
১০০	সি কে নাইডুর একাদশ	গভর্নরের একাদশ	এলাহাবাদ	,,
১১৩	হোলকার	ইউ পি	লক্ষ্ণৌ	১৯৪২-৩
১১৯	,,	বাঙ্‌লা	ইন্দোর	,,
১৬৩	,,	ইউ পি	ইন্দোর	১৯৪৪-৫
১০৯ } ১৩০ }	,,	বোম্বাই	বোম্বাই	১৯৪৪-৬
১০৮	সামন্তরাজ একাদশ	অস্ট্রেলিয়াস সার্ভিসেস দল	দিল্লী	১৯৪৫-৬
১০৭	পূর্বাঞ্চল	উত্তরাঞ্চল	বোম্বাই	,,
১২৫	হোলকার	বিহার	জামশেদপুর	১৯৪৬-৭
২৩৩	,,	ইউ পি	ইন্দোর	১৯৪৭-৮
১১২	,,	মধ্য প্রদেশ	,,	১৯৪৮-৯
১০৬	ভারত	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	কলকাতা	,,
১২৯	ভারতীয় দল	কমনওয়েলথ দল	কানপুর	১৯৪৯-৫০
১৯১	হোলকার	পশ্চিমবঙ্গ	ইন্দোর	,,
১৪০	,,	বরোদা	বরোদা	,,
১২৫	হোলকার	ইউ পি	ডেরাডুন	১৯৫০-১
১০০	,,	হায়দ্রাবাদ	ইন্দোর	,,
১০০ (নঃ আঃ)	,,	পশ্চিমবঙ্গ	কলকাতা	,,
১৮৭	,,	গুজরাট	ইন্দোর	,,
১১৪	,,	পূর্ব পাঞ্জাব	ইন্দোর	১৯৫৩-৪
১০১	ইউ পি	রাজস্থান	বারাণসী	১৯৫৬-৭

একই খেলায় ছুটি সেঞ্চুরি

রান	পক্ষে	বিপক্ষে	স্থান	সাল
১০৯ ও ১৩০	হোলকার	বোম্বাই	বোম্বাই	১৯৪৪-৫

একই ম্যাচে সেঞ্চুরি ও ৫০ রান

রান	পক্ষে	বিপক্ষে	স্থান	সাল
১৪০ ও ৭৪	ভারতীয় দল	লেভসন গাওয়াড়ের দল	স্কারবরো	১৯৩৬
১০১ ও ৫৫	সর্বভারতীয় দল	লর্ড টেনিসনের দল	কলকাতা	১৯৩৭-৮
৬৬ ও ১১৩ নঃ আঃ	হোলকার	ইউ পি	লক্ষ্ণৌ	১৯৪২-৩
৫৪ ও ১০৬	ভারত	ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ	কলকাতা	১৯৪৮-৯
৬৩ ও ১০০ নঃ আঃ	হোলকার	পশ্চিমবঙ্গ	কলকাতা	১৯৫০-১

একই ম্যাচে ছুবার ৫০ রান

রান	পক্ষে	বিপক্ষে	স্থান	সাল
৯০ ও ৫৪ নঃ আঃ	অবশিষ্ট ভারতীয় দল	মহারাষ্ট্র	বোম্বাই	১৯৪০-১
৫১ ও ৮৮	হোলকার	,,	ইন্দোর	১৯৫২-৩
৫৮ ও ৭০ নঃ আঃ	সর্বভারতীয় দল	কমনওয়েলথ দল	লক্ষ্ণৌ	১৯৫৩-৪
৫৫ ও ৫১	হোলকার	মাদ্রাজ	ইন্দোর	১৯৫৪-৫

পর পর শত রান

১৯৫০-৫১ মরশুমে মুশতাখ আলি রঞ্জি ট্রফিতে হোলকার দলের পরপর তিনটি ম্যাচে সেঞ্চুরি করেন: কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে ১০০, ইন্দোরে হায়দ্রাবাদের বিপক্ষে ১০০; ইন্দোরে গুজরাটের বিপক্ষে ১৮৭।

১৯৪৭-৪৮-এ হোলকার দলের সঙ্গে সফররত মুশতাখ আলি পরপর তিনটি ইনিংসে সেঞ্চুরি করেন: মাদ্রাজে মাদ্রাজের বিরুদ্ধে ১৪০; কলম্বোয় সিংহল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন দলের বিরুদ্ধে ১০৭; কলম্বোয় সম্মিলিত স্কুল দলের বিরুদ্ধে ১০২।

সর্বোচ্চ জুড়িরান

		উইকেট	পক্ষে	বিপক্ষে	স্থান	বছর
২৪৮	সারভাতের সঙ্গে	তৃতীয়	হোলকার	পশ্চিমবঙ্গ	ইন্দোর	১৯৪৯-৫০
২১৭	হিণ্ডেলকারের সঙ্গে	দ্বিতীয়	ভারত	সারে	ওভাল	১৯৩৬
২১৫	মার্চেন্টের সঙ্গে	,,	,,	মাইনর কাউন্টিজ	লর্ডস	,,
২১৫	সি কে নাইডুর সঙ্গে	চতুর্থ	হোলকার	ইউ পি	ইন্দোর	১৯৪৭-৮
২০৯	ডেনিস কম্পটনের সঙ্গে	তৃতীয়	হোলকার	বোম্বাই	বোম্বাই	১৯৪৪-৫
২০৩	মার্চেন্টের সঙ্গে	প্রথম	ভারত	ইংল্যাণ্ড	ম্যাঞ্চেষ্টার	১৯৩৬
১৯৩	কে এম রঙ্গনেকারের সঙ্গে	চতুর্থ	হোলকার	গুজরাট	ইন্দোর	১৯৫০-১
১৯০	এম এম জগদেল-এর সঙ্গে	প্রথম	হোলকার	বিহার	জামশেদপুর	১৯৪৬-৭

টেস্ট ম্যাচের রান

সাল	বিপক্ষ	স্থান	রান
১৯৩৩-৪	ইংল্যাণ্ড	কলকাতা	৯ ও ১৮
,,	,,	মাদ্রাজ	৭ নঃ আঃ ও ৮
১৯৩৬	,,	লর্ডস	০ ও ৮
,,	,,	ম্যাঞ্চেষ্টার	১৩ ও ১১২
,,	,,	ওভাল	৫২ ও ১৭
১৯৪৬	,,	ম্যাঞ্চেষ্টার	৪৬ ও ১
,,	,,	ওভাল	৫৯
১৯৪৮-৯	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	কলকাতা	৫৪ ও ১০৬
,,	,,	মাদ্রাজ	৩২ ও ১৪
,,	,,	বোম্বাই	২৮ ও ৬
১৯৫১-২	ইংল্যাণ্ড	মাদ্রাজ	২২

	ইনিংস	মোট রান	সর্বোচ্চ রান	নঃ আঃ	গড় রান
ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে	১৪	৩৭২	১১২	১	২৮'৬১
ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে	৬	২৪০	১০৬	০	৪০'০০
মোট	২০	৬১২	১১২	১	৩২'২১

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে টেষ্ট ম্যাচে প্রথম আত্মপ্রকাশেই মুশতাখ আলি সেঞ্চুরি করেন।

কিভাবে আউট হয়েছেন

৩৫০টি সম্পূর্ণ ইনিংসে মুশতাখ আলি ক্যাচে আউট হয়েছেন ১৫২ বার; বোল্ড হয়েছেন ৮৭ বার; এল বি ৬৬ বার, স্টাম্প্‌ড ২৩ বার, রান আউট ২৩ বার এবং হিট ইউকেট দুবার।

বোলিং

সারাজীবনের ক্রিকেট খেলায় মুশতাখ আলি ১৪৮টি উইকেট নিয়েছেন, রান দিয়েছে ৪৩১১, গড়ে ২৯'১২ তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ বোলিং নিম্নরূপ।

একটি ম্যাচ।

	পক্ষে	বিপক্ষে	স্থান	সাল
৫৪ রানে ১১ উইকেটে	ভিজিয়ানাগ্রাম দল	গভর্ণরের দল	কলকাতা	১৯৩০-১

একটি ইনিংসে

	পক্ষে	বিপক্ষে	স্থান	সাল
১৮০ রানে ৭ উইকেট	মধ্য ভারত	ইউ পি	এলাহাবাদ	১৯৩৯-৪০
৩৬ রানে ৬ ”	ভিজিয়ানাগ্রাম দল	গভর্ণরের দল	কলকাতা	১৯৩০-১
৮৪ রানে ৬ ”	অবশিষ্ট ভারতীয় দল	ইংল্যাণ্ড সফরকারী ভারতীয় দল	দিল্লী	১৯৩২-৩
৯৭ রানে ৬ ”	ভারতীয় দল	সিংহল	দিল্লী	১৯৩২-৩
১৮ রানে ৫ ”	ভিজিয়ানাগ্রাম দল	গভর্ণরের দল	কলকাতা	১১৩০-১
৩৭ রানে ৫ ”	মঈনুদ্দৌল্লা একাদশ	এম সি সি	সেকেন্দ্রাবাদ	১১৩৩-৪

ক্যাচ

সমগ্র জীবনের ক্রিকেট খেলায় মুশতাখ আলি ১৪৭টি ক্যাচ নিয়েছেন।

সমাপ্ত